অবাধ্যতার ইতিহাস

ডা. শামসুল আরেফীন

কালের ঘূর্ণাবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সমকালীন প্রকাশন'-এর পথচলা।

অবাধ্যতার ইতিহাস

ডা. শামসুল আরেফীন

বই : অবাধ্যতার ইতিহাস

মূল : ডা. শামসুল আরেফীন

সম্পাদনা : মুফতি তারেকুজ্জামান, মাওলানা ইফতেখার সিফাত

সহ-সম্পাদনা : মুফতি আবুল হাসানাত কাসিম

বানান ও ভাষারীতি : মাহবুবুর রহমান, ওমর আলফারুক, আব্দুল্লাহ আমান

প্রচ্ছদ : সমকালীন গ্রাফিক্স টিম

অবাধ্যতার ইতিহাস

সমকালীন প্রকাশন

প্রকাশকের কথা

সোকল্ড আধুনিকতার অন্তঃসারশূন্যতা এবং জীবনজুড়ে ইসলামের তুলনারহিত অপরিহার্যতা অসামান্য মুনশিয়ানায় ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক এই বইয়ে।

ইউরোপে ধর্মের অত্যাচার, রাষ্ট্রের চেয়ে ধর্মের ক্ষমতাধর হয়ে ওঠা, চার্চের অত্যাচার, ধর্মীয় বাড়াবাড়ি, শতাব্দীব্যাপী ধর্মযুদ্ধ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে চার্চের বাধাসহ পশ্চিমে ধর্মের ইতিহাসের চুম্বকাংশ তুলে ধরেছেন। ১৫ শতকের পর ইউরোপে শুরু হয় ধর্মহীনতার ইতিহাস। ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার মতোই—ধর্মের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে তারা একটা ধর্মমুক্ত পৃথিবীর মিশনে নেমে পড়ে।

এরপর লেখক ইসলামের কথা বলেছেন। ইউরোপে ধর্ম তাদের জাগতিক উন্নতির চূড়ান্ত অন্তরায় ছিল। বিপরীতপক্ষে ইসলাম যে মুসলিমদের যুগপৎ জাগতিক এবং মহাজাগতিক উন্নয়নের মহাসড়কে পরিচালিত করে, তা তুলে ধরেন। অর্থাৎ ইউরোপের ধর্মাভিজ্ঞতা আর ইসলামের অভিজ্ঞতা যে ১৮০ ডিগ্রি বিপরীত, তিনি তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন।

ইউরোপ বিশ্বজুড়ে সমাধানের মোড়কে সমস্যা আর ঔষধের মোড়কে বিষ সাপ্লাই করে। সেখানে তাই পরিবার ভাঙনের নাম 'নারীবাদ', মানবাধিকারের নাম 'সমকামিতা', ধর্মবিদ্বেষের নাম 'বাকস্বাধীনতা' আর অকল্পনীয় অশ্লীলতার নাম

হয়ে যায় 'আধুনিকতা'। এসব মুখরোচক স্লোগানের প্যারাডক্স আর পরিভাষার বিকৃত প্রয়োগের কুহক থেকে লেখক আমাদের সাবধান করেছেন।

জীবন ও জগতের সহজাত নীতিমালা অগ্রাহ্য করে বাস্তবতা বিবর্জিত প্রকৃতিবিরোধী পদক্ষেপ, বুদ্ধিবৃত্তিক নৈতিকতা, লাগামহীন ভোগ আর অবাধ স্বাধীনতার ফলাফল কী পরিমাণ ভয়াবহ হতে পারে, লেখক তার সবিস্তার উদাহরণ তুলে ধরেছেন। হাতে কলমে দেখিয়েছেন উন্নয়নের সিঁড়ি বেয়ে ১ম বিশ্ব কীভাবে তরতর করে অধপতনের শেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে।

ইউরোপের উত্থান-পতনের পাট চুকিয়ে লেখক মুসলিমবিশ্বের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এক কথায় এই বইকে বর্তমান বিশ্বের আয়না বলা চলে। এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ভেসে ওঠে আমাদের চেহারা। এ যেন চলমান বিশ্বের মলাটবন্ধ শব্দচিত্র।

লেখক দেখিয়েছেন ১ম বিশ্বের অন্ধ অনুসরণে 'হীরা ফেলে কাঁচ তুলে' কীভাবে আমরা আমির থেকে ফকির হচ্ছি। তাদের অনুসরণে ভুল ট্রেনে চড়ে বসার মতোই আমরা ক্রমাগত কীভাবে মঞ্জিল থেকে আরো দূরে সরে যাচ্ছি। লেখক শুধু ভুল ধরেই ক্ষান্তি দেননি; মোটেও হতাশ নন তিনি। বলেছেন উত্তরণের পন্থাও। সেই সাথে প্রেসক্রাইব করেছেন বিজয়ের ইশতেহার।

ডা. শামসুল আরেফীন আধুনিক বিষয়গুলো হালনাগাদ তথ্য ঘেটে আর ইসলামি বিষয়গুলো হৃদয়গত বেদনা দিয়ে লিখেছেন। তাত্ত্বিক প্রাচুর্য আর হার্দিক প্রাণনার এমন মেলবন্ধন বিরল। এমন দিলচেরা বক্তব্য সরাসরি কলিজায় আঘাত হানে। আলাপের তুমুল বৈঠকি ঢং আর বুদ্ধশ্বাস বর্ণনার ফাঁকে পাঠক কখন যে একটা প্রায় অ্যাকাডেমিক বই শেষ করে ফেলবেন, তা হয়তো টেরও পাবেন না।

এমন সময়োপযোগী একটি বই পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত, আলহামদুলিল্লাহ। যাদের শ্রমে সমৃদ্ধ এই বই, আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে উত্তম প্রতিদান দিন, আমিন।

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন

সম্পাদকের কথা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সবকিছুই অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ রয়েছে ইসলামে। এটা তাই সবচে পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ। এই প্যাকেজের বিষয়গুলো তাসবিহের দানার মতো পরস্পর সংযুক্ত। যেকোনো একটা দানা খসে পড়লে, বাকিগুলো ঝরে পড়বে নিমিষেই।

ইসলামকে মনেপ্রাণে মেনে নিলে এই প্যাকেজের অন্য বিষয়গুলোতে আর ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। ইসলামের প্রতিটি বিধানকে আমাদের চূড়ান্ত অভীষ্ট লক্ষ্য—আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সাজানো হয়েছে। তাই এর ক্ষুদ্রতম বিধান লঙ্ঘনও আমাদের কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

আখিরাত-সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসগুলো আমাদের এই পার্থিব জীবনে নৈতিক ও বাস্তবিক প্রভাব ফেলে। ইসলামি শারিয়ার ব্যক্তিগত আইনি কাঠামো পরিবার-ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। পরিবার-ব্যবস্থা জুড়ে আছে সামাজিক কাঠামোর সাথে। সামাজিক বিধানগুলো রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সাথে এবং রাষ্ট্রীয় বিধানপ্রণালী আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফলে এই চেইনের কোনো একটা জায়গায় সংকট দেখা গেলে নিম্ন বা উর্ধ্বের প্রতিটা জায়গাতেই সেই সংকট সংক্রমিত হবে। আমাদের ব্যক্তিজীবনে যদি ইসলাম না থাকে, তাহলে পরিবারে ইসলামের চর্চা হ্রাস পেতে থাকবে। পরিবারে ইসলাম না থাকলে সমাজে ইসলামের রক্ষা-প্রাচীরে ঘুণ ধরবে। সমাজে ইসলাম না থাকলে রাষ্ট্র থেকে ধীরে ধীরে ইসলাম বিলুপ্ত হতে থাকবে। একইভাবে রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না থাকলে কিংবা রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের চর্চা না থাকলে,

সমাজে ইসলামের প্রভাব ক্রমেই হারাতে থাকবে; সমাজে ইসলামের বলয় মজবুত না থাকলে, পরিবার থেকে ইসলাম আস্তে আস্তে বিলীন হতে থাকবে আর যদি পরিবার ইসলাম থেকে বেপরোয়া হয়ে পড়ে, তাহলে ব্যক্তিজীবন থেকেও ইসলাম হারিয়ে যাবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদিসে এই বিষয়টাকে খুব সুন্দরভাবে উম্মাহর সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

'ইসলামের বিধানগুলো একে একে নষ্ট হতে থাকবে। যখন একটা বিধান নষ্ট হবে, তখন মানুষ তার পরবর্তী বিধানটাকে নষ্ট করতে উঠেপড়ে লাগবে। সর্বপ্রথম যেই বিধানটা নষ্ট হবে, সেটা হলো—ইসলামি শাসনব্যবস্থা। আর সর্বশেষ যে বিধানটা নষ্ট হবে, সেটা হলো—সালাত।[১]

হাদিসের এই মর্মকে সামনে রেখেই বিখ্যাত আলিম, মুফাক্কিরে ইসলাম আবুল হাসান আলি নদভি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, শারয়ি শাসন ছাড়া পূর্ণ শারিয়ার ওপর আমল করা আদতে সম্ভব নয়। ইসলামি জীবনব্যবস্থার একটি স্বতন্ত্র অংশ এমন রয়েছে, যার ওপর আমল করতে হলে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। ইসলামি শাসনব্যবস্থা না থাকলে একটা বড়ো অংশের ওপর আমলই করা যায় না। এ ছাড়া খোদ ইসলামের সুরক্ষা, সেটাও তো শক্তি ছাড়া অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ : ইসলামের অর্থব্যবস্থা, আইন ও বিচারব্যবস্থা এর কোনোটাই ইসলামি শাসন ছাড়া সম্ভব নয়। এ কারণেই কুরআন শক্তি সঞ্চয় ও বিজয় অর্জনের প্রতি অনেক গুরুত্বারোপ করেছে।[২]

ইসলামের শাশ্বত এই সামগ্রিকতার প্রতি লক্ষ না করলে আমরা কখনোই ইসলামের সৌন্দর্য ও কার্যকারিতাকে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারবো না। বর্তমান সময়ে মুসলমানদের একটি মৌলিক সমস্যা হলো, ইসলামের ওপর খণ্ডিত দৃষ্টি ফেলা। ইসলাম যে একটা সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা, অধিকাংশ মুসলিমই তা বেমালুম ভুলে বসে আছে। ইসলামকে কেবল কয়েকটা বিধানসর্বস্ব গতানুগতিক ধর্ম হিসেবে পালন করা হচ্ছে। ফলে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বারবার সংশয়ের মুখে পড়তে হয়।

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ*, খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ২৫১

[২] *তারিখে দাওয়াত ও আযিমাত*, খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ৫৭

এই ভুল-ইসলামকেই মূল জ্ঞান করে ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে অকার্যকর ও অচল প্রমাণ করতে প্রশ্ন তোলে—'কই, কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো মিলছে না?' অবশ্য এই ইঙ্গিতমূলক প্রশ্ন আর ইসলামের খণ্ডিত চর্চা তো আর আজ থেকে শুরু হয়নি। আধুনিক ইতিহাসের শুরুতেই আমরা আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা হারিয়েছি। এরপর সমাজ, পরিবার, ব্যক্তিসহ সব জায়গা থেকেই ইসলামকে বিদায় জানিয়েছি। আমাদের বর্তমান সমাজ রাসুলের এই উল্লিখিত হাদিসের একদম জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। আমাদের ওপর ইউরোপীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা, উপনিবেশ চলাকালীন তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং আমাদের চরম উদাসীনতায় সেই ধারার অব্যাহতি—আধুনিক ইতিহাসের পুরো এই জার্নিটা মুসলিম উম্মাহকে বর্তমান অধঃপতনে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়েছে। লজ্জাজনক এই পরাজিত ও অধঃপতিত অবস্থা থেকে উত্তরণে মুসলিম জাতিকে অবশ্যই হারিয়ে ফেলা ইসলামের সেই সামগ্রিকতাকে চিন্তা ও কর্মে পুরোপুরি ধারণ করতে হবে। আদর্শিকভাবে আমাদেরকে ইসলামে আশ্রয় নিতে হবে পরিপূর্ণরূপে। মহান আল্লাহ তাআলা বলছেন,

'হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু।'[১]

চিন্তা-চেতনায় ইসলামকে খণ্ডিতভাবে কল্পনা করার ভয়াবহ যেই ট্রেন্ড আমরা এই প্রজন্মের ভেতরে দেখছি, সেটা আর যাই হোক ইসলাম নয়। পূর্ণাঙ্গ, সর্বজনীন ও সামগ্রিক ইসলামের আংশিক পালন পৃথিবীতে আমাদেরকে লাঞ্ছনার অথৈ সাগরে চুবিয়ে মারছে। আর আখেরাতের শাস্তি তো অবধারিতই আছে। মহান আল্লাহ তাআলা বলছেন,

'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখো আর কিছু অংশ অস্বীকার করো? সুতরাং,, তোমাদের মধ্যে যারা তা করে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।'[২]

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২০৮

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ৮৫

ধর্মহীন এই সেকুলার সমাজে মুসলিমদের জন্য মুহতারাম শামসুল আরেফিন শক্তি সাহেবের এই বইটা বিপ্লবী এক উপহার। মুহতারাম ভাইয়ের প্রতিটা বই-ই আমার পড়া হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ; তার মধ্যে বক্ষ্যমাণ বইটিকে এই পর্যন্ত ডাক্তার সাহেবের করা সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলে আমি মনে করি। অন্যান্য বইগুলোতে ধরাবাঁধা কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু এই বই একসাথে পুরো একটা প্যাকেজ। ইসলামি শারিয়ার এই প্যাকেজটাকে বর্তমান সময়ের অধঃপতিত মুসলিম উম্মাহর সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে লেখক তুলে এনেছেন পুরোপুরি। ঈমান, রিসালাত, আখিরাত, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সেকুরালিজম, লিবারেলিজম, হিউম্যানিজম, ফেমিনিজম, কলোনিয়ালিজম-সহ প্রতিটি বিষয়কে বর্তমানের সাথে মিশিয়ে পাঠককে যেন গিলিয়েই দিয়েছেন।

বইটি শিক্ষিত সমাজের প্রতিটি শ্রেণির প্রত্যেক ব্যক্তিকে দ্বীনে ফেরানোর জন্য মৌলিক ভূমিকা পালনের ক্ষমতা রাখে বলে বিশ্বাস করি, কিন্তু হিদায়াতের মালিক মহান আল্লাহ তাআলা। কায়মনোবাক্যে তাঁর দরবারে দুআ করি, তিনি যেন মুহতারাম শামসুল আরেফিন শক্তি সাহেবসহ বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের খেদমত কবুল করে নেন এবং মুসলিম উম্মাহকে বইটির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উপকৃত করেন। আমিন।

মাওলানা ইফতেখার সিফাত
আলিম। লেখক। অনুবাদক

সূচিপত্র

বরিষে করোনা-ধারা

পরিভাষা

পুঁজিবাদ (Capitalism)

ধনতন্ত্র, পুঁজিবাদ। সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। **ষোড়শ শতকে ইউরোপের কয়েকটি দেশে এই নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভব।** নতুন উৎপাদনী যন্ত্রের মালিক এখানে সমাজের প্রভু, আগে যেখানে ছিল জমিদার বা সামন্ত। যন্ত্রের মালিক নির্দিষ্ট মজুরিতে যন্ত্রহীন মানুষকে দিয়ে তার যন্ত্র চালায়, বেশি থেকে বেশি পণ্য উৎপাদন করে, সেটা দেশ-বিদেশে বিক্রি করে আরো যন্ত্র কেনে, আরো শ্রমিক লাগিয়ে আরো পণ্য বানায়। এভাবে চলতে থাকে। **এ এক নতুন সমাজ, নতুন ব্যবস্থা। মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতা।**[১]

কথার কথা, বাংলাদেশের অমুক গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ। তাদের কাছে বিরাট পুঁজি আছে, বা ব্যাংক থেকে সুদে পুঁজি ঋণ নেয়; শ্রমিকের কাছে নেই। তারা সেই পুঁজি খাটায়—জায়গা কেনে বা ভাড়া নেয়, কারখানা দেয়, কাঁচামাল কেনে, মেশিন কেনে। সেখানে শ্রমিক বেতনের বিনিময়ে শ্রম দিয়ে পণ্য তৈরি করে। সেটাকে মালিক বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রি করে লাভ করে। এই পর্যন্ত ঠিক আছে। যেটা ঠিক নেই, সেটা হলো—এই লাভ বাড়ানোর জন্য যা যা তারা করে। যেমন :

- তারা পণ্য মজুত করে আস্তে আস্তে বাজারে ছাড়ে, একবারে বেশি পণ্য এলে

[১] দর্শনকোষ, সরদার ফজলুল করিম

দাম পড়ে যাবে।

- শ্রমিককে যত কম বেতন দেওয়া যায় মুনাফা তত বেশি থাকে। এটা করতে চাকরিপ্রার্থীদের একটা প্রতিযোগিতা তৈরি করে (মেয়েদেরকে জবমার্কেটে এনে)। বেকারত্ব টিকিয়ে রাখে, যাতে মানুষ কম বেতনেও চাকরি করতে বাধ্য থাকে।
- মিডিয়া, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদির দ্বারা সমাজকে ভোগে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে মানুষ তাদের পণ্য বেশি বেশি কেনে। এজন্য সমাজের মূল্যবোধ, নীতিনৈতিকতা বদলে দেয়। যেসব কাঠামো মানুষের ভোগকে কমিয়ে ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে (ধর্ম, পরিবার, সমাজ), সেগুলোকে 'অপ্রয়োজনীয়' প্রমাণের চেষ্টা করে।
- রাষ্ট্রকে দিয়ে নিজেদের পক্ষে আইন বানায়, পলিসি বানায়। ফলে শ্রমিক মাজলুম হয়।
- বেশি লাভের জন্য মানুষের জন্য ক্ষতিকর পণ্য-সেবাও তৈরি করে—পর্নোগ্রাফি, পতিতাবৃত্তি, ড্রাগ, সিনেমাশিল্প। নিম্নমানের কাঁচামাল ব্যবহার, ক্ষতিকর কেমিক্যাল ব্যবহার করে সংরক্ষণ, সস্তায় শ্রমিক পেতে মানবপাচার-আধুনিক দাসপ্রথা—অর্থাৎ লাভ বেশি রাখার জন্য যা যা করার সব করে।
- অধিক মুনাফার লক্ষ্যে ঘি ঢালে 'সুদ'। যেহেতু সুদ শোধ করতে হবে, তাই আরো বেশি লাভ করতে হবে। আর বিন্দুমাত্র টেনশন বা ব্যবসায় হাত লাগানো ছাড়াই সুদখোর (ব্যাংক, এনজিও) বসে বসে লাভের অংশ নিয়ে যাবে।

সুতরাং,, পুঁজিবাদ অর্থনৈতিক দর্শন হলেও এর বিস্তৃতি মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। ব্যক্তির নৈতিকতা থেকে নিয়ে রাষ্ট্র হয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে পুঁজিবাদ। এটা এক বিশ্বদর্শন (worldview)।

সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism)

অর্থাৎ এক রাষ্ট্র কর্তৃক আরেক রাষ্ট্রের ওপর শক্তি-ক্ষমতা প্রয়োগ করা; তা হতে পারে নিজের দেশের লোক সেটেল করে (colonialism), সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করে বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। কলোনিয়ালিজম বা উপনিবেশবাদের (transfer of population to settle) সাথে আবার স্থায়ী বসতি গড়ে তোলার ব্যাপার রয়েছে, যেমন আমেরিকায় ব্রিটেন করেছে। এই অর্থে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও দুটোর উদ্দেশ্যের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই—কোনো এলাকা জয় করে অর্থনৈতিক

ও কৌশলগতভাবে উপকৃত হওয়া। যেমন : ব্রিটেন ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করেছে ১৯০ বছর। [Stanford Encyclopedia of Philosophy] এখনো পশ্চিম **ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা যে ৩য় বিশ্বের দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে নানাভাবে, এটাও সাম্রাজ্যবাদ যাকে—বলা হয় নব্য-সাম্রাজ্যবাদ।**

শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution)

আগে সমাজ ছিল মূলত কৃষিজীবী ও কুটিরশিল্প-ভিত্তিক। ১৭৫০-১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইউরোপে যন্ত্রশিল্প বিকশিত হয়, জেমস ওয়াটের বাষ্প-ইঞ্জিন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। **আগের কৃষিজীবী ও হস্তশিল্পের স্থান দখল করে নেয় ইঞ্জিনচালিত বৃহৎশিল্প**। একেই বলে শিল্পবিপ্লব বা Industrial Revolution. ইংল্যান্ডে শুরু হয়ে পরে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাঙের ছাতার মতো কারখানা গড়ে ওঠে ইউরোপে। আর উপনিবেশি শক্তিগুলো সারা দুনিয়া থেকে কাঁচামাল নিয়ে জমা করে সেখানে (নীল, তুলা ইত্যাদি)। কম খরচে পণ্য বানিয়ে আবার সারা দুনিয়ায় বিক্রি করতে থাকে। ফলে বাদবাকি শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়, যেমন আমাদের মসলিন মার খেয়ে যায় ব্রিটেনের সস্তা কাপড়ের কাছে।

বিশ্বায়ন (Globalization)

পুরো বিশ্বকে একটা অবাধ প্লাটফর্মে পরিণত করা, যাকে বলা হবে Global Village. যেখানে—

- অর্থনৈতিক বিষয়ে উদারনীতি গ্রহণ (যেমন মুক্তবাজার) করা হবে, যাতে ১ম বিশ্ব সহজে ৩য় বিশ্বের মার্কেটে নিজের পণ্য বিক্রি করতে পারে, কমমূল্যে শ্রম ও কাঁচামাল নিতে পারে। শুল্ক-ট্যাক্স ইত্যাদির বাঁধা থাকবে না।
- রাষ্ট্র-অর্থ-সংস্কৃতিতে পশ্চিমা ধাঁচ গ্রহণ করা হবে (Westernization/ Americanization), কারণ এই সিস্টেমই পুঁজিবাদের জন্য অনুকূল।
- আন্তর্জাতিক উদার আইন মেনে বিশ্ব-রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি (global liberal order), যেখানে আমেরিকার নেতৃত্বে সব চলবে।
- তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন (Internet Revolution), যা ওপরের ৩টা পয়েন্টকে আরো গতিশীল করবে। ৩য় বিশ্বকে ১ম বিশ্বের ওপর পুরো নির্ভরশীল ও নখদর্পণে নিয়ে আসবে।

- শুধু মানবতার ভিত্তিতে এক বিশ্ব-সম্প্রদায় (one single unified community) তৈরি করা হবে, যা সংঘাতের সকল উৎসকে (ধর্ম, জাতীয়তা) উৎখাত করবে। এসব গালভরা বুলি ওপরের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বাজারজাত করা হয়।

মুক্তবাজার অর্থনীতি (Free market Economy)

অর্থাৎ বাজারের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ হয় থাকবে না, বা সীমিত থাকবে। ট্যাক্স, মান-নিয়ন্ত্রণ, কোটা, ট্যারিফ বা অন্যান্য সরকারি হস্তক্ষেপ থাকবে না। [Encyclopedia Britannica] **ফলে ১ম বিশ্বের বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি তাদের পণ্য দেদারসে ৩য় বিশ্বে প্রবেশ করাবে, আর মুনাফা নিয়ে চলে যাবে। অন্যদিকে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ৩য় বিশ্বের নিজের শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে।** একচেটিয়া মনোপলি প্রতিষ্ঠা হবে। গরিব দেশ আরো গরিব হবে, তারা আরো ধনী হবে।

ভোগবাদ (Consumerism)

১৯৭০ সাল থেকে 'ভোগবাদ' শব্দটি (consumerism) 'বেশি বেশি পণ্য ও সেবা গ্রহণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। একে 'অর্থনৈতিক বস্তুবাদ'-ও বলা হয়, **যার মানে বেশির চেয়ে বেশি পার্থিব বস্তু আহরণ ও ভোগের মানসিকতা ;** তবে মার্কেটিংয়ের পরিভাষায় এর অন্য অর্থও রয়েছে।[১]

বস্তুবাদ (Materialism)

Materialism. বিশ্বের প্রতিটি বিষয়কে দার্শনিকেরা ২ ভাবে ব্যাখ্যা করেন– বস্তুবাদ ও ভাববাদ (idealism)। বস্তুবাদ হলো এই ধারণা যে, বস্তু এবং ভাব (মন)-এর মধ্যে বস্তুই প্রধান; মন-ভাব-চেতনা হলো অপ্রধান। **বিশ্ব হলো বস্তু। চেতনা বা মন বস্তুরই বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট, আলাদা কিছু নয়।**

এরই অনুসিদ্ধান্ত হলো : বিশ্ব অসীম, আগে থেকেই ছিল, কেউ একে সৃষ্টি করেনি। ঈশ্বর বা কোনো বহিঃশক্তি এর স্রষ্টা নয়।[২]

---

[১] *Modern Consumerism*, Roger Swagler, (1997), Encyclopedia of the Consumer Movement. page : 172–173

[২] *দর্শনকোষ*, সরদার ফজলুল করিম

শুরুর আগে

একদিন হঠাৎ ব্যাপারটা খুব ভাবাল আমায়। যেমন ধরেন, জ্ঞান হবার পর থেকে দেখে আসছি ৫ বছরের জন্য একজন দেশের 'রাজা' হয়, পরের ৫ বছরে আবার আরেকজন হয় ভোটে জিতে। ধরে নিয়েছিলাম, এটাই স্বাভাবিক ও শ্রেষ্ঠতম প্রক্রিয়া, যেন এটাই হবার, এটাই হয়, এটা ছাড়া আর কিছু হবার নেই। এমনি করে ঈদের দিন সেলামি পেতাম কচকচে নতুন নোট, তা দিয়ে আইসক্রিমট্রিম কেনা চলত। যেন এটাই অনাদি কাল থেকে চলে আসা সিস্টেম, অলঙ্ঘ্য, অপরিবর্তনীয়। এই বিশেষ সুন্দর কাগজটা দিলেই দোকান থেকে অনেক কিছু পাওয়া যায়। শুক্রবার বিকাল ৩টা থেকে বিটিভিতে শুরু হতো পূর্ণদৈর্ঘ্য 'বাংলা ছায়াছবি'। অধিকাংশ সিনেমাতেই থাকত একটা আদালতের দৃশ্য। কাঠগড়া, কাঠের হাতুড়ি, অর্ডার অর্ডার... দুজন উকিল ঝগড়াঝাঁটি করে 'অবজেকশন মিলর্ড'। বিচার-সালিশের এই চিত্রটাই যেন চিরন্তন, এটা ছাড়া আর কিছু যেন হতেই পারে না।

এই যে আমাদের চারপাশে যে সিস্টেমটা আমরা দেখি, সবকিছুই একটা বিশেষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটা তো চিরটাকাল এমন ছিল না। **কোত্থেকে এলো এই বিশেষ অলঙ্ঘ্য পদ্ধতিগুলো, যাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা যায় না। যাদেরকে ছাড়া অন্যকিছু কল্পনা করা যায় না। আবার যেমন ধরেন, আমরা যে কাঠামোর ভেতরে চিন্তা করি, ঠিক-বেঠিক হিসেব করি, যা কিছুকে আমরা কাণ্ডজ্ঞান মনে করি; এগুলো এলো কোত্থেকে?** যেমন : ছোটবেলা থেকে শিখে এসেছি—লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়ায় চড়ে সে। বড় হতে হতে জানলাম, সবাই স্কুলে পড়ে না, অনেকে মাদরাসায় পড়ে, তারাও অনেক পড়াশোনা করে ; কিন্তু তাদের নিজের গাড়িঘোড়া

থাকে না। ভেবে দেখলাম, একটা ছেলে যা পারে, একটা মেয়ে তা পারে না। আবার মেয়েরা যা পারে, ছেলে হয়ে আমি তা পারি না ; কিন্তু আমাকে কেউ জোর করে বিশ্বাস করাতে চাইছে : একটা ছেলে যা যা পারে, মেয়েও তা পারে। মীনা কার্টুন ইত্যাদি দিয়ে **এই কথাটাকে কেউ কাণ্ডজ্ঞান হিসেবে আমার ভেতর প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে।**

কেজি ক্লাসে ইসলাম শিক্ষা বইয়ে পড়লাম, সালাত পড়তে হয় দিনে ৫ বার। কিন্তু আশেপাশে বেশিরভাগ মানুষই পড়ছে না। আরো বড় হয়ে বুঝলাম 'সালাত না পড়লে কী হবে, আমার ঈমান কিন্তু ঠিকই আছে।' ২৬ বছর বয়সের আগে ধর্মকর্ম নিয়ে ভাবার ফুরসত মেলেনি। অনেকের তো শেষ বেলায়ও মেলে না, শোকর আলহামদুলিল্লাহ। কুরআনের অনুবাদ পড়তে গিয়ে দেখলাম, অনেক কিছুই আমার চেনা দুনিয়ার সাথে মিলছে না। **দুনিয়ার যে সিস্টেমটার সাথে আমি বড় হয়েছি; যা যা ধ্রুবসত্য হিসেবে জেনে, আধুনিক-ভালো-শ্রেষ্ঠ জেনে, কাণ্ডজ্ঞান হিসেবে বিনা প্রশ্নে মেনে এসেছি, তার অনেক কিছুর সাথেই কুরআন মিলছে না।** কুরআন যা বলছে, তা কেউ মানছে না। পাটিগণিতে সুদকষার অঙ্ক করানোর সময়ই বাবা বলে দিয়েছিলেন 'সুদ কী', 'সুদ ইসলামে হারাম' ইত্যাদি। তাহলে আমি করছি কেন এই অঙ্ক? তাহলে কেন তোমরা ব্যাংকে টাকা রাখছো সবাই? কোনো ক্লাসের বাংলা বইয়ে বেগম রোকেয়ার একটা প্রবন্ধ ছিল : 'পুরুষ যখন পৃথিবী-সূর্যের দূরত্ব মাপে, আমরা নারীরা তখন বালিশের ওয়ারের দৈর্ঘ্য মাপি। শকটের (গাড়ির) এক চাকা ছোট, আরেক চাকা বড় হলে সে শকট চলবে কী করে?'

» ঠিকই তো, অর্ধেক জনসংখ্যা ঘরে 'পড়ে থাকলে' জাতি কীভাবে উন্নত হবে?

» ঠিকই তো, ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গঠিত হয় না, বাংলাদেশের স্বাধীনতাই তার প্রমাণ।

» ঠিকই তো, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।

» ঠিকই তো, মুদ্রা তো কাগজেরই হয়। আন্তর্জাতিক লেনদেন তো ডলারেই হয়, ডলারেই হতে হয়।

» ঠিকই তো, কুরআনের যে আইন (হাত কাটা, পাথর ছুড়ে হত্যা, বেত্রাঘাত), এগুলো আজকের যুগে 'চলে না'। 'অচল, বর্বর, অমানবিক'।

» ঠিকই তো, জীবন তো একটাই। কাল হো না হো।

এরকম বহু 'ঠিকই তো'-রা এসে ভিড় করে কুরআন আর আপনার মাঝে, আল্লাহ আর আপনার মাঝে। কারা কীভাবে কখন এই 'ঠিকই তো'-গুলোকে সেট করে দিলো আমাদের মনে। ২০০১ সালেও সমকামিতাকে আমরা শতভাগ ছেলেই ঘৃণা করতাম আমাদের আবাসিক স্কুলটাতে, কেউ ধরা খেলে পুরো ব্যাচ মিলে ট্রায়ালে তোলা হতো তাকে। আজ ২০ বছরের মাথায় শুনছি অনেকেই একে স্বাভাবিক মনে করছে, পক্ষে ওকালতি করছে, বরং একে খারাপ ভাবাটাই নাকি মানসিক সমস্যা। তার মানে আমাদের 'ঠিকই তো'-র স্কেল বদলায়। গতকাল যা ঠিক, আজ তা ঠিক না। আবার গতকাল যা ঠিক ছিল না, আজ সেটাই ঠিক।

সুতরাং, মানুষের চিন্তার ইতিহাস আমাদের জানতে হবে। **কীভাবে মানুষের চিন্তাগুলো বদলে গেল, এটা না জানলে 'আজকের আমাদেরকে' আমরা চিনতে পারব না। আজকে আমাদের চিন্তাগত যে অবস্থান, সেটা প্রাকৃতিক নাকি কৃত্রিম? আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে নির্মিত? নাকি অন্য কারো অভিজ্ঞতাকে আমি আমার জন্য ধ্রুব হিসেবে মেনে নিয়েছি, যদিও আমার অভিজ্ঞতাটা ছিল ভিন্ন? আমার চিন্তার ছকটা কি আমাদের বেছে নেওয়া, নাকি কারো চাপিয়ে দেওয়া?**

সামনে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাঠক পেতে থাকবেন। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নিজেকে আবিষ্কার করতে থাকবেন। **আমি কে? আমি এমন কেন? আমি এমন করেই ভাবি কেন? কেন অন্যরকম করে ভাবি না? আমি কি স্বাধীনভাবে ভাবি, না কেউ আমার ভাবনার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে?** ইউরোপ সেই ১৬শ শতক থেকে পুরো দুনিয়া শাসন করে আসছে, আজও করছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই নেটিভদের আইন-বিচার-অর্থনীতি-শিক্ষাকে তারা নিজেদের সুবিধার্থে সাজিয়ে নিয়েছে, যেকোনো শাসক তাই করবে। নিজস্ব একটা বিশেষ পরিস্থিতির অভিজ্ঞতায় ইউরোপ একটা বিশেষ চিন্তাধারা গ্রহণ করেছে, যাকে তারা নাম দিয়েছে 'সভ্যতা' বা 'আধুনিকতা'। এটাকে একটা স্ব-আরোপিত দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছে যে, এই সভ্যতা তাকে পৌঁছে দিতে হবে সারা দুনিয়ায়—সভ্যতার দায় (White Man's Burden)। তাই ইউরোপের নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত আইডিয়াগুলো উপনিবেশ আমলে আমাদেরকে তারা মেনে নিতে পদ্ধতিগতভাবে বাধ্য করেছে, যদিও তাদের অভিজ্ঞতা আর আমাদের অভিজ্ঞতা এক নয়। সুতরাং,, **আমরা চিন্তা-কাঠামোর ক্ষেত্রে ইউরোপের অনুসারী বা উত্তরাধিকারী। ইউরোপের মতো করেই আমরা চিন্তা করি, তাদের মতো করে চিন্তা করাকে আধুনিকতা বা প্রগতি মনে করি, তাদের সমস্যার সমাধানকে নিজের সমস্যারও সমাধান মনে করি।**

ইউরোপীয় স্কেলে সবকিছু মাপতে শিখেছি আমরা, আমাদের বাবারা, তাদের বাবারা, কিন্তু কুরআন-হাদিস-ফিকহের ঠিক-বেঠিক, নৈতিকতা, আইন, সিদ্ধান্ত ইউরোপীয় স্কেলে ঠিক যায় না। তাইলে সমাধানটা আসলে কী?

» কেউ ইসলামকে ত্যাগ করে (নাস্তিক ইসলামবিদ্বেষী)
» কেউ ইউরোপীয় খাপে যেটুকু আঁটে সেটুকু রাখার পক্ষে, বাকিটুকু ছেঁটে ফেলার পক্ষে (মডার্নিস্ট রিডাকশনিস্ট মুসলিম)
» আবার কেউ ইউরোপের মনরক্ষা করে ইসলামকে পুনর্ব্যাখ্যা করার পক্ষে (মডারেট মুসলিম)

প্রথমটি তো ইসলাম থেকেই খারিজ, পরের দুটোও প্রকৃত ইসলাম নয়; বরং ইসলামের অপভ্রংশ। বহু মুসলিম সন্তান ইসলামের চিরন্তন অবস্থান ত্যাগ করে, এই ৩টিতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। **তিনটা অবস্থানেরই গোড়া এক জায়গায় : ইউরোপীয় মাপকাঠিকে ধ্রুব মেনে নেওয়া। এজন্য ইউরোপকে চিনলে নিজেকে চেনা যাবে। প্রতিটি মুসলিমের প্রয়োজন ইউরোপকে চেনা, ইউরোপের চিন্তার ইতিহাস জেনে নিজেকে প্রশ্ন করা। ইউরোপ, তুমি কার? আর আমি কার?**

ধর্ম কী?

হাজার বছর ধরে খ্রিষ্টধর্মের সাথে ইউরোপের সংসার। ধর্ম বলতে ইউরোপ তাই বোঝে খ্রিষ্টবাদকে আর মধ্যপ্রাচ্য বোঝে ইসলাম। ধর্ম নিয়ে ইউরোপের অভিজ্ঞতা আর মধ্যপ্রাচ্যের অভিজ্ঞতা পুরো ১৮০ ডিগ্রি উলটো। আমরা খুব সংক্ষেপে একটু বোঝার চেষ্টা করব কেন তাদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন।

খ্রিষ্টধর্মের ইতিহাস

কথা ছিল খ্রিষ্টধর্ম কেবল বনি ইসরাইলের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে ; কিন্তু **'যীশুর জীবদ্দশায় যীশুবিরোধী'** একজন ইহুদি পণ্ডিত, যার নাম ছিল Saul, সে নিজের রোমান নাম রাখল Paul. সে ছিল রোমান রাজদরবারে 'নাগরিক' (citizen) পদমর্যাদার, এইজন্য রোমান নাম। ঈসা-নবির শোকাচ্ছন্ন সঙ্গীসাথিদের কাছে সে হুট করে উদয় হয়ে জানাল, তার সাথে ঈসা আলাইহিস সালামের মরণোত্তর দেখা হয়েছে। ঈসা তাকে বলেছেন, অ-ইহুদিদের মাঝেও সত্যধর্মের দাওয়াহর কাজ করতে। অথচ ঈসা-নবি কিন্তু বারবার সতর্ক করে বলে গেছেন—

"

These twelve Jesus sent out with the following instructions : Do not go onto the road of the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. *[Matthew 10 : 5-7]*

এই বারো জনকে যীশু এই নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন : অ-ইহুদিদের (জেন্টাইল) রাস্তায় যেয়ো না কিংবা সামারিটান (ইহুদিদের এক গ্রুপ)-দের কোনো শহরে প্রবেশ কোরো না ; বরং ইসরাইলের হারানো ভেড়াদের (নবি ইসহাকের পথভ্রষ্ট সন্তানদের) কাছে যাও। (মানে কেবল ইহুদি ডায়াস্পোরাগুলোতে দাওয়াহ করতে বলেছেন)[১]

"

Then Jesus said to the woman, "I was sent only to help God's lost sheep—the people of Israel." [Matthew 15 : 24]

(এক অ-ইহুদি নারী এসেছিল সাহায্যের জন্য) তখন যীশু নারীটিকে বললেন : আমি কেবল ঈশ্বরের হারানো ভেড়াদের সাহায্য করার জন্য প্রেরিত হয়েছি—ইসরাইলের বংশধরদের প্রতি (বনি ইসরাইল)।

সেসময় বনি ইসরাইলের ১২টি গোত্র সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এজন্যই ইসরাইলের (নবি ইয়াকুবের আরেক নাম) পরিবারের হারানো সন্তান বলে সম্বোধন করা হয়েছে বারবার। পারস্য সম্রাট নেবুচাদ-নেজার (বুখতনাসর) খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৭ সালে জেরুসালেম লুট করে বাইতুল মাকদিস জ্বালিয়ে দেয়, সকল তাওরাত পুড়িয়ে দেয়, ইহুদি গোত্রগুলোকে দাস বানিয়ে ব্যাবিলনে নিয়ে যায়। পরে 'ইহুদিদের ঈশ্বরে' বিশ্বাসী পারস্যরাজ মহান সাইরাস (অনেক ঐতিহাসিক এই ব্যক্তিকেই কুরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন মনে করেন) তাদেরকে মুক্তি দেন, বাইতুল মাকদিস পুনর্নির্মাণ করেন। তবে ব্যাবিলন থেকে সব ইহুদি গোত্র ফিলিস্তিনে ফিরে আসেনি। অনেকে পারস্যেই থেকে যায়, কেউ এদিকপানে সরে এসে আফগান, এমনকি দক্ষিণ ভারতেও চলে আসে বলে জানা যায়। এ ছাড়া ইউরোপের বড় বড় শহরে ইহুদিরা ছড়িয়ে পড়ে (Jewish Diaspora)। মোদ্দাকথা, **ঈসা আলাইহিস সালাম বিশ্বনবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন বনি ইসরাইলের নবি**। এজন্য হাওয়ারিগণকেও[২]

---

[১] জেন্টাইল : অ-ইহুদিদেরকে জেন্টাইল বলা হয়।
সামারিটান (শমরীয়) : এরা হল বনি ইসরাইলেরই এক গ্রুপ ছিল, যাদেরকে গ্রেপ্তার করে ব্যাবিলনে দাস বানিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এদের দাবি, এরাই মূসা আলাইহিস সালামের মূল শরিয়তের উপরে রয়েছে। আর ব্যাবিলন ফেরত ইহুদিদের কাছে মূল তাওরাত নেই, Ezra একটা বিকৃত তাওরাত গছিয়ে দিয়েছে এদের কাছে।

[২] ঈসা আলাইহিস সালামের সহচর ও সঙ্গীদের হাওয়ারি বলা হয়।

তাদের দাওয়াতি মিশন স্পষ্ট করে দিয়েছেন : শুধু ইহুদি বসতিগুলোয় যাবে তোমরা, অ-ইহুদিদের বসতি তো দূরে থাক, ওদের রাস্তায়ও যাবে না। যেহেতু আমার দাওয়াত অ-ইহুদিদের জন্য নয়।

কিন্তু এই স্বঘোষিত শিষ্য ও 'সাবেক শত্রু' পল[১] ঈসা-নবির দাওয়াহর মধ্যে কিছু সংস্কার আনল, যার মধ্যে প্রধান হলো ঈসা আলাইহিস সালামকে ইহুদিদের নবি থেকে বিশ্বনবি ঘোষণা। পিটার[২] হলেন 'ইহুদির প্রতি প্রেরিত' (apostle to the jews) আর পল নিজেকে ঘোষণা করল 'অ-ইহুদিদের প্রতি প্রেরিত' (apostle to the gentiles), যেটা করার কথা ছিল না। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, পল কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় শিষ্য ছিল না, তীব্র শত্রু ছিল ; কিন্তু এখন তাকে সরাসরি শিষ্যদের সমান মনে করা হয়। **অ-ইহুদিদের দাওয়াহ করার ক্ষেত্রে পল তাওরাতের আইনকে শিথিলভাবে উপস্থাপন করত, ক্ষেত্রবিশেষে 'অপ্রয়োজনীয়' হিসেবে। এই যেমন ধরেন—খতনা করার দরকার নেই, মদ্যপান চলবে, শনিবার পালনের দরকার নেই, শুকর খাওয়ার নিষেধ নেই ইত্যাদি।**

বস্তুবাদী মূর্তিপূজক রোমানরা পলের খ্রিষ্টীয় আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া পেয়ে আকৃষ্ট হয়। তখন একটা প্রশ্ন ওঠে : অ-ইহুদিদের খ্রিষ্টান হতে হলে আগে ইহুদি হতে হবে কি না, খৎনা, শনিবার পালন, খাবারে বাছবিচার এগুলো করতে হবে কি না। ৪৯ সালে জেরুসালেমে apostolic council-এ সিদ্ধান্ত হয়, মুশরিকরা ইহুদি না হয়েই খ্রিষ্টান হতে পারবে। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে পিটার আর পলের মাঝে বিবাদও হয়, কারণ পিটার তাওরাতের শারিয়া মানা বাধ্যতামূলক মনে করতেন,

---

[১] পল বা পৌল ছিল একজন খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক। তার পূর্বের নাম ছিল শৌল। জন্ম আনুমানিক ৫ খ্রিষ্টাব্দ, মৃত্যু ৬৪ বা ৬৭ খ্রিষ্টাব্দ। কিলিকিয়ার তার্য শহরে তার জন্ম, এই শহরেই সে বড় হয়। শিক্ষক গমলিয়েলের কাছে সে ইহুদিধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে। পল প্রথম জীবনে ছিল খ্রিষ্টধর্মবিদ্বেষী ও খ্রিষ্টানদের প্রতি অত্যাচারী একজন ইহুদি। পরবর্তী সময়ে সে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং তাতে নানারকম বিকৃতি ও পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষের মাঝে তা প্রচার করতে শুরু করে।—শারয়ি সম্পাদক

[২] পিটারের আসল নাম ছিল সিমন (গ্রিক Σίμων) বা সিমেওন (গ্রিক : Συμεών)। পরবর্তীকালে তাকে কেফা বা পেট্রস (গ্রিক : Πέτρος) নাম দেওয়া হয়। জন্ম আনুমানিক ৩০ খ্রিষ্টাব্দ, মৃত্যু আনুমানিক ৬৪ থেকে ৬৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। তিনি ছিলেন ঈসা আলাইহিস সালামের ১২ জন প্রেরিতের একজন এবং প্রারম্ভিক মণ্ডলীর নেতাদের অন্যতম। তাকে সাধারণত রোমের প্রথম বিশপ এবং আন্তিয়খিয়ার প্রথম কুলপিতা মানা হয়। প্রাচীন খ্রিষ্টীয় সমস্ত সম্প্রদায় পিটারকে একজন প্রধান সন্ত এবং রোমীয় খ্রিষ্টমণ্ডলি ও আন্তিয়খিয়ার খ্রিষ্টমণ্ডলির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে শ্রদ্ধা করে থাকে। —শারয়ি সম্পাদক

ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা অনুযায়ী। শেষমেশ এভাবে সমাধা হয়, কেউ কারো কাজে নাক গলাবে না। এভাবে খ্রিষ্টানরা দুইভাগে ভাগ হয়ে গেল—

» **আলফা খ্রিস্টান : 'ইহুদীয়-খ্রিস্টান' [পিটারের অনুসারী অর্থাৎ ঈসা আ. এর আসল অনুসারী মুসলিম]**
» **বিটা খ্রিস্টান : 'অ-ইহুদি খ্রিস্টান' [পলের অনুসারী বা বর্তমান খ্রিস্টান]**

১৩৫ সালের পর থেকে বিটা-খ্রিস্টানরা হয়ে গেল মূলধারা। আর ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী সেসময়কার প্রকৃত মুসলিমরা হয়ে গেল বাতিল ফিরকা। পিটারের অনুসারী খ্রিস্টানরা এখন টিকে আছে ইহুদি ধর্মের একটা বাতিল ফিরকা হিসেবে, যাদের নাম 'নাযারিন'। আমাদের মুসলিমদের মতোই তাদের আকিদা এমন—

» আল্লাহ একক।

» ঈসা আলাইহিস সালাম সত্য নবি ও মাসিহ।

» তিনি কুমারী মারিয়াম আলাইহাস সালামের গর্ভজাত, অলৌকিকভাবে তার জন্ম।

» তাওরাতের বিধান অবশ্যপালনীয়। তবে কিছু নিজেরা যোগ করে নেয়— নিরামিষ ভোজন, স্বেচ্ছা-দারিদ্র্য, ধৌতকরণ প্রথা (ওযু টাইপ), প্রাণী কুরবানি না দেওয়া।

» সেন্ট পলকে মুরতাদ মনে করা।

খ্রিস্টান বলতে এখন থেকে আমরা বিটা-খ্রিস্টান বা সেন্টপলের অনুসারীদের বুঝব। তাওরাতের বিধান থেকে দূরে সরে গেলেও খ্রিস্টীয় ন্যায়-নৈতিকতা, মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও আধ্যাত্মিকতা ভোগবাদী রোমানদেরকে উন্নত চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতার স্বাদ পাইয়ে দেয়। মূলত তাওরাতের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ সম্পর্কিত বিধান বাদ দিলেও ব্যক্তিগত চরিত্র-আধ্যাত্মিকতা এসবে পলীয় খ্রিস্টবাদ খুব জোর দিয়েছিল। রাষ্ট্রের আনুগত্যের নীরস আচার-পার্বণ থেকে ধর্মের আনুগত্যের বর্ষণ তাদের আকৃষ্ট করতে থাকে। আবার **রোমান মুশরিক সংস্কৃতির নানান দিকও খ্রিস্টবাদে ধুমসে প্রবেশ করে: ২৫ ডিসেম্বর পালন (ছিল সূর্যদেব অ্যাপোলোর জন্মদিন, হয়ে গেল খ্রিস্টের জন্মদিন), ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর প্রভুত্ব আরোপ, আল্লাহর পুত্র মনে করা (রোমান পুরাণের কনসেপ্ট), মূর্তি তৈরি, শনিবারের বদলে রবিবার (SUN-day) বিশ্রাম দিবস— ইত্যাদি তাদের প্যাগান চিন্তাচেতনার সাথে সামঞ্জস্য**

রাখার জন্য অনুমোদিত হয়। অনেকটা শিয়াবাদের ভেতর পারসি ধর্মের উপাদান ঢুকে পড়ার মতো।

ইসলামের ভিতরও যেকোনো বাতিল ফেরকা দেখবেন অলৌকিক কিচ্ছা-কাহিনী, স্বপ্ন, পির-ফকিরের কেরামতির দলিলে প্রতিষ্ঠা পায়। তেমনি সেন্ট পলের প্রচারিত খ্রিষ্টবাদ প্রতিষ্ঠিতই ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক জন্ম, অলৌকিক কার্যক্রম এবং আধ্যাত্মিক জগতের ওপর। স্বাভাবিকভাবেই অলৌকিক এসব বিষয় প্রকৃতির নিয়মনীতি ও যুক্তির বিপরীত হয়ে থাকে। ফলে প্রকৃতিবিজ্ঞান ও যুক্তিপ্রয়োগের সাথে খ্রিষ্টবাদের মৌলিক বিরোধ। আমরা দেখব সেন্ট পল প্রচার করছেন—

> *জ্ঞানীরা কোথায়? লেখকরা কোথায়? এ যুগের দার্শনিকরা কোথায় গেল? ঈশ্বর কি দুনিয়াবি জ্ঞানকে আহাম্মকি বানাননি? [১ কোরিন্থিয়ান ১ : ২০]*

ধর্মতাত্ত্বিক Tertullian[১] বললেন : *খ্রিস্টবাদ প্রাকৃতিক যুক্তির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণই নয় কেবল, বরং সরাসরি বিরুদ্ধে। ধর্মজ্ঞান যুক্তির বিরুদ্ধে এবং যুক্তির ঊর্ধ্বে।* তিনি সরাসরি ঘোষণা করেন : *credo quia absurdum est* (অযৌক্তিক বলেই আমি এটা বিশ্বাস করি)।[২] আজকের অনেক বোদ্ধা মুসলিমকেও এ কথা বলতে শুনবেন: ধর্ম হল বিশ্বাসের বিষয়, ধর্মে বিজ্ঞানের কোনো স্থান নেই। এর কারণ হল, **ধর্ম বলতে 'পলীয় খৃস্টধর্ম'-কেই ইউরোপ চিনেছে এবং সারা দুনিয়াকে চিনিয়েছে। ধর্ম যে যৌক্তিক হতে পারে, ধর্মের 'পার্থিব' অংশটুকু যে মানবজ্ঞানে ধরা দিতে পারে, এটা ইউরোপের কল্পনাতেই নেই।**

বৈরাগ্যবাদ

গ্রিক সভ্যতায় একটা সময় স্টোয়িকবাদ (stoicism) নামক বৈরাগ্যবাদ চর্চা হতো, যা রোমানদের হয়ে খ্রিস্টধর্মে স্থান পায়। বলা হলো : অপবিত্র পৃথিবীতে মানুষ পদস্খলিত হয়েছে আদম আলাইহিস সালামের আদিপাপের কারণে, যা লেপ্টে আছে প্রতিটি মানুষের গায়ে। সেই পাপ থেকে মুক্তি পেতে ও খ্রিস্টের প্রিয়পাত্র হতে হলে এই নশ্বর ঘৃণ্য দুনিয়ার চাহিদা, ভোগকে অবদমন করতে হবে। দুনিয়ার সম্পর্ক-সম্পদ ত্যাগ করে মঠবাসী জীবন বেছে নিতে হবে, সারাজীবন যাজক-নানরা বিয়ে করতে

---

[১] মৃত্যু : ২৪০ খ্রিস্টাব্দ

[২] James Swindal, Faith and Reason, The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP)

পারবে না। পানি ব্যবহার ত্যাগ, লাগাতার উপবাস, নিজেকে নানাভাবে অকারণ কষ্ট দেওয়া, মানবিক চাহিদাকে বঞ্চিত করা, আত্মীয়দের বঞ্চিত করে চার্চের নামে সম্পদ লিখে দেওয়া ইত্যাদির মধ্যে স্বর্গ তালাশ করতে হবে। কেন আজ ইউরোপ ধর্মকে শত্রু হিসেবে দেখে, সেটা বুঝতে হলে আমাদের এই ইতিহাসগুলো জানতে হবে। William Edward Leckey তার *History Of European Morals* গ্রন্থে সেসময়কার বৈরাগ্যচর্চার চলমান যে পদ্ধতিগুলো আমাদের জানাচ্ছেন—

» ৩০ বছর যাবৎ দিনে ১টি রুটি খেয়ে কাটানো
» গর্তে বসবাস ও প্রতিদিনের খাবার ৫টি ডুমুর
» বছরে একবার চুল কাটা, ময়লা কাপড় পরা
» ইচ্ছে করে মাছিকে দেহে কামড়ানোর সুযোগ দেওয়া
» শরীরে ৮০ পাউন্ড, ১৫০ পাউন্ড সবসময় লোহা বহন করা
» ৩ বছর শুকনো ইঁদারার ভেতর বসবাস
» ৪০ দিন ৪০ রাত কাঁটাঝোপে অবস্থান
» ৪০ বছর বিছানায় গা না লাগিয়ে ঘুমানো
» এক সপ্তাহ যাবৎ কিচ্ছু না খাওয়া, না ঘুমোনো
» পানি স্পর্শ না করা। পানি ছোঁয়া, পা ধোয়া, হাত ধোয়াকে পাপ মনে করা।
» শরীরে এমনভাবে রশি বেঁধে রাখা যাতে শরীর কেটে পোকা ধরে যায়।
» ১ বছর যাবৎ দাঁড়িয়ে থাকা
» পরিবারের সাথে আর কোনোদিন দেখা না করা
» চোখ ঝাপসা না হওয়া অব্দি উপোস করা

এই আত্মা-বস্তুর পৃথকীকরণ আর অবতারবাদের গ্রিক দর্শন আর রোমান সমাজের প্রথা-পার্বণ মিলে খ্রিষ্টধর্মকে যে জগাখিচুড়ি বানাল, তার সাথে ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। এই আজগুবি দুনিয়াত্যাগ মানবিকভাবে অসম্ভব প্রতিভাত হলো। ফলে সমাজে একটা অংশ অতিভোগবাদী হতে থাকল, তাও আবার চার্চের কেন্দ্রের কর্তাব্যক্তিরাও এর মধ্যে। একদিকে গির্জা-মঠে মায়া-প্রেম-চাহিদার পৈশাচিক অবদমন। আরেকদিকে শহরে পাপাচারের জোয়ার। এই অসম্ভব জীবন স্বয়ং পাদরিদের পক্ষেই বজায় রাখা সম্ভব হতো না। সেন্ট বার্নার্ড বলেছিলেন :

গির্জাকে যদি সম্মানজনক বিয়ে থেকে বঞ্চিত করা হয়, তবে তাকে অবৈধ পত্নী গ্রহণ, নিকটাত্মীয়দের সাথে যৌনসম্পর্ক এবং অন্যান্য সব অপবিত্রতা ও পাপাচারের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।[১]

তার এ কথা যাজকেরা কানেই তোলেনি। ঠিকই মঠগুলো হয়ে ওঠে গোপন কিন্তু অবাধ যৌনতার লীলাভূমি। কুমারী নারীদের সাথে সহাবস্থান ও সম্পদের অবাধ প্রবাহ স্বয়ং মঠাধ্যক্ষদেরও ইন্দ্রিয়পূজার দিকে ঠেলে দেয়। কোনো সেইন্ট ধরা খেলে পোপের পক্ষ থেকে এর শাস্তি ছিল বড়জোর অন্য মঠে বদলি বা বাধ্যতামূলক অবসর। ফলে **সাধারণ জনগণ ও রাজক্ষমতার কাছে যাজকদের মর্যাদা কমতে থাকে। ঘৃণা এমন তীব্র হয় যে, 'মঠবাসী' পরিণত হয় গালিতে** [২]।

অর্থনৈতিক অত্যাচার

রোমান ক্যাথলিক চার্চ গড়ে তোলে যাজকতন্ত্র, যার শীর্ষে পোপ। পোপ নিয়োগ দিতেন দেশে দেশে প্রধান আর্চবিশপ। আর্চবিশপের অধীনে অন্যান্য চার্চ বা মঠে বিশপ নিয়োগ হতো। এই চার্চতন্ত্র ছিল রাজা-জমিদারদের পাশাপাশি আরেক প্যারালাল ব্যবস্থা। এরা কিছু কর আদায় করত, শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করত। টাইথ, অ্যানেট ইত্যাদি বিভিন্ন নামে নানা প্রকার ধর্মীয় কর আদার করা হতো রাজা ও বিশপদের থেকে। ক্রমেই বেড়ে চলছিল এই দাবি। পোপের কোষাগারকে বলা হতো 'unbottomed sack of Rome', রোমের অতলান্ত থলে।

যাজকশ্রেণির জীবনযাত্রা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিজাতদের চেয়েও ভোগবাদী ছিল। জার্মানির এক-তৃতীয়াংশ ও ফ্রান্সের এক-পঞ্চমাংশ সম্পদের মালিক ছিল চার্চ, কিন্তু পার্লামেন্টের প্রকিউরার জেনারেল ১৫০২ সালে হিসেব করে দেখান, ফ্রান্সের তিন-চতুর্থাংশের মালিক চার্চ। ইতালির এক-তৃতীয়াংশ ভূমির মালিক চার্চ।[৩] কী একটা বিতিকিচ্ছি অবস্থা। **একদিকে দুনিয়াত্যাগের ডাক, অন্যদিকে নিজেরাই দুনিয়ার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত**। শুধু কি তাই? পোপ নিজেই বিশাল এক এলাকা সরাসরি শাসন করত, যাকে বলা হতো Papal State.

---

[১] *H.E. Lea, An historical sketch of sacerdotal celibacy*, page : 331

[২] ইরেসমাস (১৫০২ খ্রিষ্টাব্দ)-এর সূত্রে Cambridge Modern History.

[৩] Will Durant, *The Story Of Civilization*, page : 17

রাজ্যশক্তির সাথে দ্বন্দ্ব

এরা কেবল ধর্মীয় বিষয়েই নয়, রাষ্ট্রীয়-অর্থনৈতিক ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করত। দেশের রাজাকে পোপের অনুমোদন নিতে হতো। শুরু থেকেই চার্চ চাইছিল বিভিন্ন খ্রিস্টান দেশের রাজা-জমিদারদের ওপর প্রভাব খাটাতে। আবার ওদিকে উলটো রাজারাও নানান ধর্মীয় বিষয়-আশয়ে প্রভাব খাটাতে চাইছিল।

- রোমান সম্রাট ৪র্থ হেনরির নিযুক্ত বিশপকে বহিষ্কার করেন পোপ ৭ম গ্রেগরি। সম্রাট পোপকে সরিয়ে দিতে চান, উলটো পোপই সম্রাটকে ১০৭৬ সালে ধর্ম থেকে বহিষ্কার ঘোষণা করে। সম্রাট তাওবা করে ফেরত আসেন। ১০৮০ সালে পোপ আবার তাকে বহিষ্কার করেন। ১০৮৪ সালে সম্রাটই পোপকে সরিয়ে দেন। কী একটা নাটক, চিন্তা করেন।
- বিশপ ও মঠাধ্যক্ষদের নিয়োগ নিয়ে জার্মান সম্রাট ও পোপের মধ্যে ৫০ বছর ধরে চলা বিবাদ শেষ হয় ১১২২ সালে Concordat of Worms-এর দ্বারা।
- আর্চবিশপ নিয়োগ দেওয়া নিয়ে ইংল্যান্ডে রাজা জন ও পোপের মাঝে দ্বন্দ্ব। ৭ বছর ইংল্যান্ডকে ধর্মীয়ভাবে বয়কটে (interdict) রাখা হয়। ১২১৫ সালে ম্যাগনাকার্টা দলিলের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে চার্চ-রাষ্ট্র সম্পর্ক সীমিত করা হয়।
- পোপ বোনিফেস দাবি করে বসেন : নাজাতের জন্য প্রত্যেককে রোমান চার্চের অধীনতা স্বীকার করতে হবে। আধ্যাত্মিক প্রধানের পাশাপাশি পোপ পার্থিব বিষয়াদিরও প্রধান। এ নিয়ে ফ্রান্সের রাজা ৪র্থ ফিলিপের সাথে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শেষে ফিলিপ ১৩০৩ সালে পোপকে বহিষ্কার ও গ্রেপ্তার করে।

সাধারণ পাবলিকের কথাটা চিন্তা করুন। ধরুন আমাদের দেশেই সরকারের সাথে আলিম-ওলামার সংঘাতের সময় আমরা কী পরিমাণ ইনসিকিউরিটিতে ভুগি। ইউরোপীয়রা শতাব্দীর পর শতাব্দী এভাবে ভুগেছে।

জুলুমের নৈতিক অনুমোদন

এতো গেল একটা দিক। রাজার রাজত্ব ও জমিদারের জমিদারির পেছনে চার্চের নৈতিক অনুমোদন থাকত এবং লাগত। সাধারণ মানুষকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্ভোগ পোহাতে হতো। কোনো দণ্ড নয়, কেবল টর্চার করার জন্য কীসব যন্ত্র তৈরি

করা হয়েছিল, দেখুন। অবশ্য অধিকাংশই সহ্য না করতে পেরে মরেই যেত বলে মনে হয়। দুর্বল হৃদয়ের লোকদের দেখার দরকার নেই।

» Iron Maiden একটা শলাকাযুক্ত আলমারির মতো। ভেতরে লোক ঢুকিয়ে পাল্লা লাগিয়ে দিলেই এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যেত।

» Scold's Bridle মাথায় পরিয়ে মুখরা নারীকে বাজারে ঘোরানো হতো।

» Breast Ripper দিয়ে নারীদের স্তন ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হতো।

» Heretic's Fork লাগিয়ে থুতনি গলা দুদিকেই ঢুকে যাবে ঘুমে মাথা ঝুঁকে এলেই।

» Wooden horse-এর ওপর বসিয়ে ঘোড়াকে লাফালে লিঙ্গা-যোনি-অণ্ডকোষ ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত।

» Spanish Boot-এর প্যাঁচ কষে পা থেঁতলে নীল করে দেওয়া হতো।[১]

ক্যাথলিক চার্চের ধর্মীয় আদালতের নাম ছিল Inquisition. অ-ক্যাথলিক খ্রিস্টান থেকে নিয়ে মুসলিম-ইহুদি, জোয়ান অব আর্ক থেকে নিয়ে নাইট-টেম্পলারদের বিচারের নামে নির্যাতন, হত্যার মচ্ছব চলে কয়েক শতাব্দীজুড়ে। ডাইনি-নিধনের (witch-hunt) নামে ১৪৫০-১৭৫০ পর্যন্ত তিনশত বছরে ৫-৭ লাখ মানুষ হত্যা করা হয়েছিল, যাদের ৮০% ছিল নারী। ২০০ বছরে শুধু স্প্যানিশ ইনকুইজিশনে হত্যা করা হয় ৩২ হাজার মানুষ, শাস্তি-নির্যাতন করা হয় ৩ লক্ষ জনকে।[২] অন্যান্য দেশ তো বাদই রইল।

ক্রুসেড

এরপর ধরুন, ক্যাথলিক চার্চের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইন্ধনে ২০০ বছরের মাঝে ১০টা ক্রুসেড ইউরোপ লড়েছে মুসলিম সভ্যতার বিরুদ্ধে। যা খোদ ইউরোপের জন্যই অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে। ক্রুসেডের নামে একটা ব্যাপক সামাজিক অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল। কখনো মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে একের

---

[১] www.medievalwarfare.info

[২] Don Juan Antonio Llorente, a historian and bishop, who became commissary of the Holy Office (Inquisition) in 1789 William D. Rubinstein, Genocide [Routledge, 2004], 34

পর এক পরাজয়, কখনো আরেক ফিরকার খ্রিষ্টানদের সাথে যুদ্ধ ও লুটতরাজ, কখনো শিশুদের নিয়ে বাহিনী গঠন (শিশুদের ক্রুসেড ১২১২)। সালগুলো দেখুন। একই প্রজন্ম দুটো-তিনটে করে ক্রুসেড পেয়েছে কোনো কোনো বার—

ক্রম	সাল	ফলাফল
১ম ক্রুসেড	১০৯৫-১০৯৯	মুসলিমরা পরাজিত
২য় ক্রুসেড	১১৪৭-১১৪৯	নুরুদ্দিন জঙ্গি রাহিমাহুল্লাহর হাতে খ্রিষ্টান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়।
৩য় ক্রুসেড	১১৮৯-১১৯২	খ্রিষ্টানদের জেরুসালেম পুনরুদ্ধার অভিযান, ব্যর্থ
৪র্থ ক্রুসেড	১২০৩-১২০৪	মুসলিমদের সাথে নয়, বাইজান্টাইন রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল দখল ও লুটতরাজ করল ক্যাথলিকরা।
৫ম ক্রুসেড	১২১৬-১২২১	খ্রিষ্টানদের মিশর আক্রমণ এবং মুসলিম বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ
৬ষ্ঠ ক্রুসেড	১২২৮-১২২৯	এক চুক্তিতে ১০ বছরের জন্য জেরুসালেম খ্রিষ্টানদের শাসনে, চুক্তির মেয়াদ শেষে মুসলিমরা পুনর্দখল করে নেয়
৭ম ক্রুসেড	১২৩৯-১২৪১	খ্রিষ্টান কর্তৃক জেরুসালেম আংশিক দখল, ১২৪৪ সালে আবার তা মুসলিম বাহিনীর দখলে
৮ম ক্রুসেড	১২৪৯-১২৫০	মিসরের বিরুদ্ধে, খ্রিষ্টানরা পরাজিত
৯ম ক্রুসেড	১২৮৯	ক্রুসেডার রাষ্ট্র ত্রিপোলি দখল করে মুসলিমরা
১০ম ও শেষ ক্রুসেড	১২৯০-১২৯১	নৌবহর পাঠানো হয় শেষ ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলো রক্ষার জন্য। শেষ খ্রিষ্টান রাষ্ট্র Acre দখল করে মুসলিমরা।

একেকটা যুদ্ধ মানে ব্যাপক প্রস্তুতি, কৃষক-শিল্পীদের সেনাদলে রিক্রুটমেন্ট, ট্রেনিং, যুদ্ধব্যয়ের জন্য অতিরিক্ত কর আরোপ, সেই ব্রিটেন-ফ্রান্স-জার্মানি থেকে মধ্যপ্রাচ্য অব্দি আসা। দশ-বিশ বছর পরপরই যুদ্ধের ডাক, পরাজয়ের পর পরাজয়। সহ্যের তো আসলেই একটা সীমা আছে, ভাই।

দর্শন-বিজ্ঞানের বিরোধিতা

ঠিক যেমন খ্রিস্টবাদ মানব-চাহিদার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, একইভাবে দাঁড়িয়ে গেল প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিরুদ্ধেও। বাইবেলের ওল্ড-নিউ কোনোটাই মূল চেহারায় নেই। এটা এদের ভাষাশৈলী থেকেই বোঝা যায়। কুরআন যেমন আদেশ-নির্দেশসূচক ভাষারীতিতে। আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, 'হে মানবজাতি, এটা করো, ওটা করো না, হে নবি আপনি বলুন।' বর্তমান বাইবেলে (পুরাতন ও নতুন) বাচনভঙ্গি বর্ণনামূলক, যেন কেউ বিবরণ দিচ্ছে, গল্প শোনাচ্ছে। 'অতঃপর সদাপ্রভু বললেন...' কিংবা 'খোদাবন্দ ঈসা মসিহ পাহাড়ে উঠলেন।' ওহির সমকক্ষ তো নয়ই। হাদিসের ইকুইভ্যালেন্টও না।

যেমন ধরুন, কুরআন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে বের হতে দেরি, সাহাবিদের লিখে নিতে দেরি নেই। পড়ালেখা-জানা সাহাবিদের এক দলই ছিল 'কাতিবুল ওয়াহি' (ওহি লেখক)। তাদের কেউ না কেউ সর্বদা নবিজির সাথে থাকতেন। ওহি নাযিল হওয়ামাত্র তারা মুখস্থও করে নিতেন এবং লিখেও ফেলতেন। যে বছর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেন, সেই বছরই এক যুদ্ধে (ইয়ামামা) ৭০ জন সাহাবি শহিদ হলেন, যারা প্রত্যেকে পুরো কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। আরো জীবিত তো ছিলেন বহু। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি প্রজন্মে লক্ষ লক্ষ মানুষ ৩০ পারা কুরআন পুরোটা মুখস্থ করে রেখেছে। **শুধু লেখা হলে কিছু কিছু হারিয়ে যেত, শুধু মুখস্থ হলেও হারিয়ে যেত, বিকৃত হয়ে যেত। দুটোই একসাথে হয়েছে, ফলে এখন যে কুরআন আমরা পড়ি, তা হুবহু সেই কুরআন, যা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে বেরিয়েছে আর সাহাবিরা লিখেছেন।** এই যুদ্ধের পর আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আর দেরি করেননি, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে পুরো কুরআন একটা বই আকারে লিখিয়ে নেন, হাফিযদের মুখস্থের সাথে মিলিয়ে, অর্থাৎ নবিজির মৃত্যুর ঠিক পরের বছরই। পরবর্তী সময়ে উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু সেটাকে ৭টা কপি করে নানান প্রদেশে পাঠান, সেই কপিগুলোর ২/৩টা আজও আছে। মানে **সবচেয়ে প্রাচীন কপি নবিজির ওফাতের ১৫ বছরের মাঝে লেখা। আর এই ১৫ বছরের মাঝে মূল একটা কমপ্লিট কপি তো ছিলই, সাথে ছিল হাজারো হাফিয সাহাবি-তাবিয়ি।**

বিপরীতে কট্টর ইহুদিদের দাবি মতে তাওরাত নাযিল হয়েছে ১৩১২ খ্রিস্টপূর্ব, পরের ৪০ বছরব্যাপী লিপিবদ্ধ হয়। কম কট্টরদের মতে, কয়েক শতাব্দী ধরে লেখা

হয়, লেখকও বেশ কয়েকজন; কিন্তু বর্তমানে প্রাপ্ত তাওরাতটি ৪৫০-৩৫০ খ্রিষ্টপূর্ব সময়ে রচিত। ৫৮৭ খ্রিষ্টপূর্ব সালে পারস্য সম্রাট নেবুচাদ-নেজার জেরুসালেম লুট করে ধুলোয় মিশিয়ে দেন, বাইতুল মাকদিস পুড়িয়ে দেন, ইহুদিদের দাস বানিয়ে ব্যাবিলনে নিয়ে যান। তাওরাত হারিয়ে যায়। ৪৮৭ খ্রিষ্টপূর্ব সালে Ezra (উযায়ের আলাইহিস সালাম) তাদেরকে জেরুসালেমে আবার নিয়ে আসেন এবং বর্তমান তাওরাত দিয়ে বলেন, এটাই মুসা-নবির তাওরাত [১]। মোদ্দাকথা, ওল্ড টেস্টামেন্ট ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন গ্রন্থ। এর লিখন-সংরক্ষণ-ধ্বংস-পুনরাবিষ্কার মিলিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, এই তাওরাত সেই মুসা আলাইহিস সালামের মুখনিঃসৃত ওহি কি না।

আবার ধরুন নিউ টেস্টামেন্ট। একটা বিরাট অংশ তো শিষ্যদের লেখা চিঠিপত্র। স্বাভাবিকভাবেই সেগুলো ওহি নয়, যা নবিদের ওপর নাযিল হয়। পুরো নিউ টেস্টামেন্টের সবচেয়ে প্রাচীন কপি (চিঠিগুলোসহ) ৩৬৭ সালের। ৪টা গসপেল মূলত যীশুর জীবনী, যেমন আমাদের নবিজির সিরাহ, কিন্তু পার্থক্য হলো, **আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাহও সরাসরি তার সাহাবিদের বর্ণিত। কিন্তু ৪টা গসপেল-লেখকের কেউই ঈসা-নবির সাহাবি (হাওয়ারি) নয়।** New Oxford Annotated Bible জানাচ্ছে—

---

[১] এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, উযাইর আলাইহিস সালাম তো নবি ছিলেন। তাহলে তিনি যখন তাওরাতের কপি দিয়ে বললেন, এটাই মুসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিলকৃত তাওরাত, তাহলে তো তার কথা বিশ্বাস করতেই হবে। কারণ তিনি ছিলেন নবি, আর নবিগণ কখনো মিথ্যা বলেন না। তাদের কথা ও কাজে থাকে সরাসরি আল্লাহর সাহায্য-সমর্থন। তাই নবি উযাইর আলাইহিস সালাম বর্তমান তাওরাতকে অবিকৃত তাওরাত বলে অভিহিত করায় প্রমাণ হলো যে, এটাই সে তাওরাত, যা মুসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিল হয়েছিল

এটার উত্তরে আমরা বলতে পারি, উযাইর আলাইহিস সালাম নবি কি না, সে ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। নিঃসন্দেহে তিনি ইহুদিদের মধ্যে অত্যন্ত নেককার ও বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তার নবি হওয়ার বিষয়টি অকাট্য নয়। সহিহ সনদে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার জানা নেই যে, উযাইর নবি কি না।' [*সুনানু আবি দাউদ* : ৪৬৭৪] অতএব, তার নবি হওয়ার বিষয়টি যেহেতু সুনিশ্চিত নয়, তাই মুসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত প্রমাণিত বিশুদ্ধ সনদ ছাড়া শুধু তার কথার ওপর নির্ভর করে তাওরাতের বিশুদ্ধতা যাচাই করা সম্ভব নয়। অতএব, বর্তমানের তাওরাত গ্রন্থটি মুসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিলকৃত সেই অবিকৃত তাওরাত কি না, সে ব্যাপারে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। মোটকথা, অকাট্যভাবে কেউ বর্তমানের তাওরাতকে মুসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিলকৃত প্রকৃত তাওরাত বলে প্রমাণ করতে পারবে না।—শারয়ি সম্পাদক

সার্বিকভাবে পন্ডিতরা একমত যে, গসপেল ৪টি যীশুর মৃত্যুর ৪০-৬০ বছর পরে লেখা। যীশুকে স্বচক্ষে দেখা বা সামসময়িক কারো লেখা নয়।

কট্টর খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকদের মতেও এগুলো সবই ৭০ সালের আগে লেখা। অন্যদের মতে, ৭০-১০০ সালের মাঝে লেখা। কুরআনের সাথে তুলনা তো সম্ভবই নয়, দেখা যাক হাদিসের সাথে তুলনা চলে কি না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জীবদ্দশায় হাদিস লিপিবদ্ধ করার হুকুম দিয়েছিলেন। প্রথমে কুরআনের সাথে মিশে যাবার আশঙ্কায় মানা করেছিলেন। কিছুদিন পরে যখন কুরআনের ভাষাশৈলী ও নবিজির বাচনশৈলীর পার্থক্য সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন অনুমতি দিয়েছিলেন। অনেক সাহাবির স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি (ডায়েরি) ছিল, যা পরে বর্তমান হাদিসগ্রন্থগুলোয় আত্মীকৃত হয়েছে। যেমন :

» আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমার আস সহিফাতুস সাদিকাহ (নির্ভুল পাণ্ডুলিপি)

» আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিফা (পাণ্ডুলিপি)

» আমর ইবনু হাযম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় নবিজির লিখিত নির্দেশনামা

» সামুরা ইবনু জুন্দুব রাযিয়াল্লাহু আনহুর পাণ্ডুলিপি

» সাদ ইবনু উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিফা

» জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুমার (হজের হাদিস-সংক্রান্ত) সহিফা

» মুগিরা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাজমুআ (সংকলন)

» আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মুসনাদ (*সুনানুদ দারিমিতে* উল্লেখ আছে)

» আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এক শিষ্যকে দেওয়ার জন্য ১৫০ হাদিসের সংকলন করেন

» আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুমার সহিফা (*মুসতাদরাক লিল হাকিম*-এ উল্লেখ আছে)

» আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিফা (একউট পরিমাণ বই)

» আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিফা

» নুবাইত ইবনু শারিত রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিফা (যাহিরিয়া লাইব্রেরিতে এর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে এবং এর একাংশ *মুসনাদু আহমাদে* উল্লেখ আছে।)
» জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে ১৫৪০টা হাদিস লিখে নেন ওয়াহব ইবনু মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ
» আম্মাজান আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার হাদিসগুলো লিখে নেন উরওয়া রাহিমাহুল্লাহ

এসব পাণ্ডুলিপির উল্লেখ পরবর্তী নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়। এসব সংকলনের হাদিসগুলো পরে বর্ণনা পরম্পরাসহ বর্তমানে প্রাপ্ত গ্রন্থগুলোয় আত্মীকৃত হয়েছে যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর '*আস- সহিফাতুস সাদিকাহ*' পুরোটাই আছে *মুসনাদু আহমাদে*। অন্যান্য সহিফার হাদিসগুলোও *মুসনাদু আহমাদ, মুসতাদরাকুল হাকিম, সুনানুদ দারিমি, সুনানুল বাইহাকি*-সহ বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে ধারাবাহিক সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ **আমাদের হাদিসগুলোর একটা বর্ণনা পরম্পরা আছে, নিরবচ্ছিন্ন, কোনো ফাঁক নেই, গ্যাপ নেই, হারিয়ে যায়নি কিছু। যারা হাদিস লিখেছেন, তারা সবাই সাহাবি, স্বচক্ষে দেখেছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। আমাদের নবিজির হাদিস-সিরাহতেও বর্ণনাকারীর পরম্পরা-চেইন (সনদ) রয়েছে, যা সরাসরি নবিজির মুখ পর্যন্ত পৌঁছে,** কিন্তু গসপেলের সংরক্ষণ-লিখন এমন নয়, লুক যদি এভাবে লিখতেন : আমি শুনেছি আমার উস্তায সেন্টপলের কাছে, সে শুনেছে হাওয়ারি থমাসের মুখে, যীশু বলেছেন...। তাহলে আমাদের সিরাহ-হাদিসের সাথে একটা তুলনা দেওয়া যেত। **ইসলামি সনদের শর্তে ফেললে, বাইবেল হয়তো মওযু/ মুনকার (জাল-প্রত্যাখ্যাত) বা টেনেটুনে সনদবিহীন মাজহুল (অজ্ঞাত) একগাদা রাবি (বর্ণনাকারী) বর্ণিত ইতিহাস গ্রন্থের মর্যাদা পাবে, কিন্তু সেই আদি ওহির ঢঙে সুরিয়ানি ভাষার ইনজিল এখন দুনিয়ার বুকে নেই। নেই ওহির ঢঙের তাওরাতও**[১]।

যেহেতু মানুষের রচনা, বিকৃত বাইবেলে এমন অনেক মনগড়া বিবরণ রয়েছে, যা বাইবেল লেখকেরা সেসময়ের আন্দাজে লিখেছেন। পরবর্তী সময়ে প্রকৃতি

[১] আরামায়িক (সুরিয়ানি) ভাষার বাইবেল যেটা পাওয়া যায়, সেটা গ্রিক নিউ টেস্টামেন্টেরই (ঈসা আলাইহিস সালামের জীবনী টাইপ) সুরিয়ানি অনুবাদ। মূল সুরিয়ানি ইনজিল নেই। আর ইবরানি (হিব্রু) ভাষার তাওরাত রয়েছে যা ইতিহাস গ্রন্থের মতো বিবরণমূলক, ওহির মতো নির্দেশমূলক না

পর্যবেক্ষণের সাথে এগুলো সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। তখন প্রকৃতিবিজ্ঞান ছিল দর্শনেরই অংশ (Philosophia Naturalis) আর দর্শনচর্চা নিষিদ্ধ ছিল সেই ৭ম শতক থেকেই। John Malalas[১]-এর লেখা (*Chronographia*) থেকে জানা যায়: এথেন্সে পাঠানো হয় সম্রাট ডিসিয়াসের ফরমান, কেউ ফিলোসফি শেখাবে না...।[২] সেন্ট অগাস্টিনের জবানে, দার্শনিকদের মতগুলো 'সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ও দমিত হয়েছে'। ৬০০ সালের আগেই ৯০% ক্ল্যাসিকাল টেক্সট আর ৯৫% ল্যাটিন রচনা হারিয়ে গেল কালের গর্ভে।

'ইনকুইজিশন' আদালতের মাধ্যমে দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের 'ধর্মহীন' সাব্যস্ত করে দণ্ডিত করা হতো ডাইন হিসেবে, গুপ্তচর্চা করার অপরাধে। দেখা যাক, এই তালিকায় কারা কারা ছিল।

নাম	পরিচয়	শাস্তি	চার্চের অভিযোগ
রজার বেকন	দার্শনিক-বিজ্ঞানী	অন্তরীণ অবস্থায় মৃত্যু	নতুন মতবাদের কারণে (imprisoned for 'suspected novelties'.)
Pietro d' Abano	ইতালীয় দার্শনিক, মেডিসিনের অধ্যাপক	কারাগারে মৃত্যু। মৃত্যুর পর দণ্ড হিসেবে হাড় পোড়ানো হয়।	গুপ্তবিদ্যাচর্চা
Cecco d' Ascoli	ইতালীয় চিকিৎসক ও গণিতজ্ঞ। জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক (University of Bologna)	পুড়িয়ে হত্যা	প্রেতচর্চা

---

[১] মৃত্যু : ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ

[২] Paavo Castren (ed.), Post Herulian Athens AD 267-529.

Michael Servetus	স্পেনীয় চিকিৎসক, ধর্মজ্ঞ, ভূতাত্ত্বিক	মৃত্যুদণ্ড	ত্রিত্ববাদ অস্বীকার (একত্ববাদী ছিলেন)
Girolamo Cardano	গণিতজ্ঞ, পলিম্যাথ	কারাদণ্ড	ছাত্রদের যৌন নির্যাতনের অভিযোগ (পোপ পরে ক্ষমা করেন)
Giordano Bruno	গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ও কবি	পুড়িয়ে হত্যা	যীশুর দেবত্ব অস্বীকার, বিশ্বকে অসীম দাবি, ত্রিত্ববাদ অস্বীকার, চার্চকে গালমন্দ, যাদুবিদ্যাচর্চা ইত্যাদি
Lucilio Vanini	দার্শনিক ও চিকিৎসক	জিহ্বা কর্তন ও মৃত্যুদণ্ড	ব্লাসফেমি
Galileo	বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ	কারাদণ্ড	ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে নতুন সম্পর্ক নির্মাণ যে, ধর্ম পর্যবেক্ষণের অধীন হতে হবে, এই বক্তব্য
Copernicus	পোলিশ যাজক ও জ্যোতির্বিদ	চাপপ্রয়োগ	সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ

ইতিহাসবেত্তা Will Durant-এর মতে, কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ (পৃথিবীই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে) ছিল খ্রিষ্টবাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। চার্চের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে কোপার্নিকাস নিজের ভুলের সম্ভাবনা মেনে নিয়ে মতের পরিমার্জন করে সে যাত্রা রক্ষা পান।

শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ

ক্রুসেডের পর এলো শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ। **২০০ বছর মুসলিমদের সাথে,** এবার ১০০ **বছর নিজেদের সাথে নিজেরা।** ১৩৩৭-১৪৫৩ সালব্যাপী ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মাঝে চলতে থাকে দফায় দফায় যুদ্ধ। ফ্রান্সের সিংহাসনে কে বসবে, তা নিয়ে। জমিদারতন্ত্র আর পোপতন্ত্রের জাঁতাকলে ইউরোপের আসলেই শোচনীয় দশা।

বুবোনিক প্লেগ

এরই মাঝে এলো কালোমরণ। ১৩৪৭-১৩৫২ সালের বুবোনিক প্লেগ মহামারিতে শুধু ইউরোপে মারা যায় আড়াই থেকে ৪ কোটি মানুষ। জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। ইউরোপ-আফ্রিকা-এশিয়া মিলে মারা যায় বহু মানুষ, কেউ বলে ৭ কোটি, কেউ বলে ২০ কোটি। **পোপতন্ত্রের ঐশী ক্ষমতা নিয়ে জনমনে সন্দেহ জন্মে, এদের দিয়ে না রোগ থামছে, আর না মৃত্যু। যাজকেরাই দলে দলে মারা যাচ্ছে** (যেহেতু তারা চিকিৎসার জন্য, মৃত সৎকারে এগিয়ে যাচ্ছিল)। ১৩৪৯ সালের দিকে ইংল্যান্ডের ৪৫% আর বার্সেলোনার ৬০% পাদরি মারা পড়ে।[১] বয়ান দেওয়া হচ্ছিল যে, আমাদের পাপের শাস্তি এই প্লেগ। আবার যাদের নিষ্পাপ ভাবি, সেই পাদরিই অর্ধেক মারা গেল। তাহলে এরা যা বলেছে, তা তো মিলছে না।

আবার চাবুকধারী আন্দোলন (Flagellate Movement) শুরু হলো। ধরেন কয়েকশো লোক শহরে শহরে ঘুরবে শোকসংগীত গাইতে গাইতে। প্রধান চার্চের সামনে কান্নাকাটি, গুনাহ মাফের দুআ করবে সবার পক্ষ থেকে, চিৎকার-বিলাপ-পোশাক ছিঁড়ে-নিজেকে চাবুক দিয়ে পেটাবে। কেটে রক্তাক্ত করে ফেলবে নিজেদের। শেষে সবাই ক্রুশের আকার ধরে পড়ে থাকবে। জনগণ ঘিরে দেখতে থাকবে। এদের নেতা শেষে উপস্থিত সবাইকে তাওবার আহ্বান জানাবে। এদেরকেও পোপ 'গোমরাহ' ফাতোয়া দিয়ে দিলো, বেচারারা সবার পক্ষে থেকে তাওবা করছিল। এসবের দরুন দিনকে দিন খ্রিস্টান জনগণের ওপর চার্চ প্রভাব হারাচ্ছিল।

Western Schism

১৩৭৮ থেকে ১৪১৭ সাল অব্দি চলে আরেক নাটক। ৩ জন ব্যক্তি নিজেকে 'আসল পোপ' দাবি করতে থাকে। ১৪২৯ সাল পর্যন্ত বিভক্ত হয়ে থাকে ক্যাথলিক চার্চ। এইগুলা কি সহ্য হয় বলেন?

সব মিলিয়ে ধর্মের ব্যাপারে ইউরোপের অভিজ্ঞতাটা আসলেই ভয়াবহ। ইউরোপ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল। সর্বত্র খ্রিস্টবাদের অন্যায় হস্তক্ষেপ জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। ইউরোপ সাধে কি সেক্যুলারিজমের দিকে ঝুঁকেছে? মানব-রচিত

---

[১] John Aberth, ed. The Black Death : The Great Mortality of 1348-1350 : A Brief History with Documents (New York : Bedford/St. Martin's, 2005), 107

খ্রিষ্টবাদের সাথে ইউরোপের হাজার বছরের সংসার। শেষ পেরেকটা ঠুকে দিলো মুসলিমদের হাতে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন।

কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন

১৪৫৩ সালে উসমানি খলিফা মুহাম্মাদ আল-ফাতিহের হাতে পতন ঘটে খ্রিষ্টবাদের অন্যতম ঘাঁটি কনস্ট্যান্টিনোপলের। এসব এলাকা থেকে অনেক গ্রিক পণ্ডিত ইতালি চলে আসে, যাদের হাত ধরে ইউরোপে ফিরে আসে হারিয়ে যাওয়া গ্রিক-রোমান রচনা। ইতালিতে গ্রিক ভাষা, মূল গ্রিক বাইবেল চর্চা, রোমান দার্শনিকদের (Cicero, Lucretius, Livy, Seneca) দর্শনচর্চা বেড়ে চলে। ফ্লোরেন্সে আবার গড়ে ওঠে সেই ৫৩২ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া নিও-প্লেটোনিক স্কুল।

অবশেষে জেগে ওঠা : রেনেসাঁ

ইউরোপের চিন্তার পরিবর্তনে মূল অবদান আরবদের।[১] প্যাগান গ্রিক দর্শনকে যাজকেরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। **কিন্তু মুসলিমরা যখন সেই গ্রিক দর্শনকে একেশ্বরবাদের সাথে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করলেন, সেটাই হয়ে উঠল ক্যাথেড্রাল স্কুলগুলোর পাঠ্য।** ১৩২৫ সালের মাঝে University of Paris-এর কারিকুলামে আবার এরিস্টটল ফিরে আসে এই শর্তে যে, এরিস্টটলের যেটুকু ইবনু রুশদ গ্রহণ করেছেন, সেটুকুই পাঠ্য হবে।[২] যুক্তিপ্রিয় ও সুফিবাদী উভয় প্রকারের পাদরিদের জন্য দর্শনশাস্ত্র গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

রোমান ক্যাথলিকদের মাঝে সেসময় ছিল দুই ফিরকা : ডোমিনিকান আর ফ্রান্সিসকান। ডোমিনিকানদের কথা ছিল, যা-ই হোক আর তাই হোক, যুক্তি চলবে না। খ্রিষ্টবাদ হলো সর্বান্তকরণে বিশ্বাস। বার্সেলোনা শহরে তাদের ১২৯৯ সালের প্রোভিন্সিয়াল চ্যাপ্টারে (দাওয়াতি সম্মেলন) বিজ্ঞান পড়ার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি জারি করা হয়। বলা হয় —

বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের অবস্থান হলো, আমাদের ভ্রাতৃসংঘের কেউ মেডিসিন বা দুনিয়াবি যুক্তিবিদ্যা চর্চা করবে না। যা কিছু আমাদেরকে দুর্বল

---

[১] বিস্তারিত জানতে লেখকের *কাঠগড়া* বইটি দেখতে পারেন

[২] Rashdall, Universities, i.368 সূত্রে The Legacy of Islam, Page. 276

করে, বিতর্কিত করে এমন সবকিছু পরিহারে আমাদের দ্বিধা নেই। এইসব বিষয়ের বইপত্র ছাড়াই আমরা এগিয়ে যাব।[১]

আর প্রচলিত ধর্মতত্ত্বের বাইরে গিয়ে ফ্রান্সিসকানদের কথা ছিল, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের দ্বারা স্রষ্টার মহিমা উপলব্ধি করা। ক্যাথেড্রাল স্কুলের এই যাজক-পন্ডিতদের হাতেই দর্শন ও প্রকৃতিবিজ্ঞান চর্চা আবার শুরু হয় ইউরোপে। ফ্রান্সিসকান পাদরিদের এই চেতনাকে বলা হচ্ছে 'প্রোটো-রেনেসাঁ' বা প্রাক-রেনেসাঁ। অক্সফোর্ড ছিল এই পাদরিদের চার্চস্কুল। ১২৩০ সালে বিশপ রবার্ট গ্রসটেস্ট প্রকৃতিদর্শনের ওপর ক্লাস শুরু করেন এখানে, যোগ দেন সিলসিলার সভ্য (ফ্রায়ার) রজার বেকন। **তাহলে ১৩৫০-এর ঠিক আগে ইউরোপের হাতে রয়েছে—রোমান আইনের বিস্তৃত বইপুস্তক, আরবীয় মেডিসিন, এরিস্টটলীয় যুক্তি ও প্রকৃতিবিজ্ঞান (আরবি ব্যাখ্যা), গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা (আরবি-টু-ল্যাটিন অনুবাদ), লিখন-বর্ণমালা ও লেখ্যভাষা-অলংকার এবং ল্যাটিন কবিতার ভান্ডার।**[২] **এসব চর্চা করে রেনেসাঁর আগেই খ্রিস্ট-ইউরোপে দাঁড়িয়ে গেছে বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় —**

- ইতালিতে সালের্নো মেডিকেল স্কুল (১০৭৭), বোলোগনা (১০৮৮), পদুয়া (১২২২), রোম বিশ্ববিদ্যালয় (১৩০৩), ফ্লোরেন্স (১৩২১)
- ইংল্যান্ডে অক্সফোর্ড (১১৬৭), কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় (১২০৯)
- ফ্রান্সে প্যারিস (১১৫০-১১৭০), মন্টপিলিয়ার (১২২০), তুলোঁ (১২২৯)
- স্পেনে স্যালামাঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয় (১২১৮)
- মধ্য ইউরোপে প্রাগ (১৩৪৮) ও ভিয়েনা (১৩৬৫)

ইউরোপে রেনেসাঁ (১৩০০-১৬০০ খ্রিস্টাব্দ) বা নবজাগরণের আঁতুড়ঘর তো এগুলোই। শুরুটা যাজকদের হাত ধরে হলেও **এই ইউনিভার্সিটিগুলোতে তৈরি হয়েছে অযাজক পন্ডিতরা। গ্রিক-মুসলিম জ্ঞান-দর্শনের প্রভাবে শিক্ষিত-চিন্তক অযাজক সম্প্রদায় গড়ে ওঠাই ইউরোপের রেনেসাঁর কারণ।**

---

[১] (Douais, "Acta Capitulorum Provincialium O. P.," Toulouse, 1894, Page. 648, No. 14) সূত্রে John M. Lenhart (1924). Science In The Franciscan Order : A Historical Sketch. Franciscan Studies, (1), 5–44.

[২] Paul Oskar Kristeller, Renaissance Thought, 1961

এই পণ্ডিতদের মাঝেই পাবেন ভবিষ্যৎ রেনেসাঁর জনক Petrarch[১] আর Giovanni Boccaccio.[২] তাদের হাত ধরে ইতালিতে শুরু হলো এক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন—'হিউম্যানিজম', যাকে বলা যায় রেনেসাঁর প্রাণভোমরা। Gianozzo Manetti, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola, Lorenzo Valla এবং Coluccio Salutati-দের মাধ্যমে গ্রিক ও রোমান মূল্যবোধগুলো পুনর্পাঠ ও চর্চা চলতে থাকে। প্রধান চেতনাগুলো ছিল—

» **এই বিশ্বের কেন্দ্রবস্তু মানুষ নিজে [সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই, আগে মানুষ হন]। মানুষের জ্ঞান, মানুষের অর্জন, মানুষের জীবনই সত্য। (কোনো স্রষ্টা-স্রষ্টাপুত্র-পরকাল নয়)**

» **মানবতার মর্যাদা : বিশ্বাসের অনুতাপে পুড়ে নাজাতের মাঝে মর্যাদা নেই (খ্রিস্টবাদের চেতনা); বরং সংগ্রাম ও প্রকৃতিকে জয় করাতেই মানুষের মর্যাদা।**

» **মনের ওপর জেঁকে বসা বিদেশি মতবাদের (খ্রিস্টবাদ ইউরোপে বিদেশিই) শেকল ভেঙে মুক্তচিন্তা ও সমালোচনা।**

ইউরোপে চিন্তার এই নবজাগরণকেই বলা হয় রেনেসাঁ (নবজন্ম)। দীর্ঘ এক হাজার বছরের অবরুদ্ধ মনন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে নতুন করে ভাবতে শিখল। ঠিক কবে থেকে রেনেসাঁ শুরু হলো, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলছেন ১৩০০-১৬০০ পর্যন্ত, কেউ বলেন ১৩৫৮-১৬৫৮ পর্যন্ত; আবার কেউ বলছেন ১৪৫৩-১৫২৭ সময়টুকুই আসলে মূল জাগরণ হয়েছে। মধ্যযুগের বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে খ্রিস্ট-ইউরোপ এখন প্রবেশ করছে আধুনিক যুগে। **রেনেসাঁ শব্দের অর্থই 'নবজন্ম'। বিদেশি খ্রিস্টবাদ পরিহার করে ইউরোপের নিজস্বতায় (ক্ল্যাসিকাল) ফিরে যাওয়াকে বলা হচ্ছে পুনর্জন্ম। ক্ল্যাসিকাল অর্থ গ্রেকো-রোমান সভ্যতা, যা ইউরোপের নিজস্বতা, খ্রিস্টবাদ তো ইউরোপের বাইরের জিনিস।**

সাহিত্য, কবিতা, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য ইত্যাদির মাধ্যমে এই চেতনাগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হতে লাগল। অনেক ইতিহাসবিদ রেনেসাঁকে ir-religion বা un-christianizing বলেছেন। ধর্মের ব্যাপারে গ্রেকো-রোমান সর্বজনীন natural religion (এক জাতীয়

---

[১] মৃত্যু : ১৩৭৪

[২] মৃত্যু :১৩৭৫

সর্বেশ্বরবাদ) প্রোমোটকারী আলোচনাও নিজে থেকেই চলে আসে। ১৪৩৬ সালের দিকে গুটেনবার্গ আবিষ্কার করেন ছাপাখানা। যার ফলে রেনেসাঁর চেতনা ছড়িয়ে যায়। নাটক-সাহিত্য-কবিতা-চিত্রকর্মের মাধ্যমে ব্যাপকতা লাভ করে। বাইবেলও ব্যাপক মুদ্রণের ফলে হাতে হাতে পৌঁছে যায়। একসময় চার্চই বাইবেল ব্যাখ্যার অধিকার রাখত। ক্যাথলিকদের বহু ব্যাখ্যা প্রশ্নবিদ্ধ হতে লাগল শিক্ষিত মানুষের কাছে। যাকে পরবর্তী সময়ে আমরা প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন হিসেবে দেখব।

এভাবেই যাজকদের অনৈতিকতা, শতাব্দীর পর শতাব্দী ডাইনি-নিধন, বুবোনিক প্লেগ, চার্চ-সমর্থিত সামন্ততন্ত্রের অত্যাচার, ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ ইউরোপ চিনেছে ধর্মকে শত্রু হিসেবে। বিকাশ, জ্ঞান, চিন্তা, মুক্তি, জীবনের বাধা হিসেবে। কীভাবে বাঁচবে ইউরোপ? কোন সে রাস্তা যা ইউরোপকে দুদণ্ড শান্তি দেবে? কোন সে আলো যা পথ দেখাবে আঁধারে বন্দি ইউরোপকে?

প্রথম আলো

তাহলে বুঝা গেল, ১৫শ শতকের মাঝেই চার্চবিরোধী একটা আবহ পুরো ইউরোপজুড়ে গড়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষ, রাজা-জমিদার, ব্যবসায়ী, অযাজক পণ্ডিত সর্বস্তরেই জমাট অসন্তোষ। ইতোমধ্যেই গুটেনবার্গের ছাপাখানার সুবাদে বাইবেল পৌঁছে গেছে হাতে হাতে, সবাই উপলব্ধি করতে পারছে, পাদরিরা এতদিন আমাদের যা যা বুঝিয়েছে, কই বাইবেলে তো তা নেই। আগুনে ঘি পড়ল যখন পাদরিরা বেহেশতের টিকিট বেচা শুরু করল। Indulgence প্রথমে মূলত ছিল খ্রিষ্টধর্মের 'তাওবা'র একটা ধারণা। দোষ স্বীকার এবং বেশি বেশি ভালো কাজ করে শাস্তিকে কমিয়ে আনা। পরবর্তী সময়ে ত্রয়োদশ শতকের দিকে ধীরে ধীরে 'ভালো কাজ' ব্যাপারটা হয়ে গেল 'চার্চকে দান-সাদাকা করা'। এটাই ধীরে ধীরে হয়ে গেল 'গুনাহমুক্তি কিনে নেয়া'। অর্থ ডোনেশনের মাধ্যমে কিনে নেয়া হতো indulgence certificate. নিজের পূর্বপুরুষ, আত্মীয়স্বজনের নামে সার্টিফিকেট কিনে তাদের বেহেশত নিশ্চিত করা হতে লাগল। পরে সরকার আর চার্চ মিলে পয়সা ভাগবাঁটোয়ারা করে নিত।

রিফর্মেশন

১৫১৭ সালে জার্মান যাজক ও অধ্যাপক মার্টিন লুথার ক্যাথলিক চার্চের এইসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে লেখেন ৯৫ দফা (Ninety five Theses)। লিখে টাঙিয়ে দেন উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে। পোপ থেকে নিয়ে সকল পাদরিকে আহ্বান জানান এই অভিযোগগুলো খণ্ডন করতে। জন্ম নিল 'রিফর্মেশন' আন্দোলন। মার্টিন

লুথারকে বলা হয় প্রোটেস্ট্যান্ট-বাদের প্রবক্তা,[১] যার মূল থিম ছিল—

১. পোপের প্রাধান্য অস্বীকার

২. যাজকেরা ঈশ্বরের নিযুক্ত, এটা অস্বীকার

৩. রুটি ও মদ যীশুর মাংস-রক্ত হয়ে যাওয়ার আকিদা (trans-substantiation) অস্বীকার ইত্যাদি

মাত্র ২০ বছরে ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে ক্যাথলিক থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট হয়ে যায়। জার্মানির কিছু কিছু রাজ্যও লুথারিয়ান হয়ে যায়। সুইজারল্যান্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট-বাদের আরেক ভার্সন জুইংলির ধর্মমত জনপ্রিয় হয়। ফ্রান্স-স্কটল্যান্ড-জেনেভা-হল্যান্ডে জন ক্যালভিন প্রচারিত প্রেসবাইটারিয়ান ধর্মমত প্রতিষ্ঠা পায়। ইংল্যান্ড ১৫৩৪ সালে প্রতিষ্ঠা করে কিছুটা মধ্যপন্থি অ্যাংলিকান চার্চ। ৮ম হেনরি চাচ্ছিলেন পোপের প্রভাবমুক্ত ক্যাথলিক ধর্ম। পরের ধাপে তার ছেলে ৬ষ্ঠ এডওয়ার্ড ইংল্যান্ডকে পুরোদস্তুর প্রোটেস্ট্যান্টে রূপান্তর করে।

১. ইংরেজদের জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থনাপুস্তক

২. ৪২টি ধর্মনীতি সংবলিত আইন

৩. ম্যাস (mass) নামক ক্যাথলিক প্রার্থনা নিষিদ্ধ

৪. যাজকের বিয়ের অনুমতি

৫. গির্জা থেকে ছবি-মূর্তি অপসারণ

এডওয়ার্ডের পর কুইন মেরি আবার ক্যাথলিক ধর্ম পুনঃপ্রবর্তন করেন। গ্যাঞ্জামটা দেখেন। এরপর রানি ১ম এলিজাবেথ এসে একটা মীমাংসা করলেন। ৪২ নীতি থেকে ক্যাথলিক-বিরোধী নীতিগুলো বাদ দিয়ে ৩৯ দফা আইন বানিয়ে একটা সুরাহা হলো।

১৬১৮-১৬৪৮ এই ৩০ **বছরব্যাপী যুদ্ধ চলে মূলত ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্টদের মাঝে। রোমান সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্যাথলিক লিগ, আর ওদিকে প্রোটেস্ট্যান্ট ইউনিয়ন।** যদিও শেষের দিকে ব্যাপারটা গিয়ে দাঁড়ায় রাজনৈতিক (ফ্রান্স ও হ্যাবসবার্গ

---

[১] Bandler, Gerhard. "Martin Luther : Theology and Revolution." Trans., Foster Jr., Claude R. New York : Oxford University Press, 1991.

রাজবংশের দ্বন্দ্ব) মারা যায় ৮০ লাখ মানুষ। ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির মাধ্যমে এই রক্তক্ষয়ী, অর্থনীতি-জনজীবন বিধ্বংসী যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। আজকের আমরা যে ফরমেটের রাষ্ট্র দেখি, **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক** দেখি, তার শেকড় এই ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তিতে। যত ধরনের রাষ্ট্রচিন্তা জন্ম নিয়েছে, ওয়েস্টফেলিয়া মাপকাঠিতে না মিললে তাকে **failed, collapsed, fragile and weak state** বলে আগ্রাসন চালানো হয়েছে, বিশেষত নন-ওয়েস্টার্ন রাষ্ট্রকাঠামোগুলোকে **(যেমন ইসলামি খিলাফত, ইমারত)**। সামনে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

এনলাইটেনমেন্ট

তো এতকাল চার্চের এইসব খবরদারি আর আবদার মানুষ মিটিয়েছে পরলোকের সাফল্যের জন্য। লেপ্টে থাকা আদিপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মানবজনমকে ঘৃণা করে, অবদমন করে মুক্তি তালাশ করেছে। এখন রেনেসাঁ থেকে তারা জেনেছে 'সবার ওপরে মানুষ সত্য', সাফল্য মানে ইহকালের সাফল্য। চেপে বসা বিদেশি মতাদর্শের (খ্রিষ্টবাদ) এইসব আদিপাপ-স্রষ্টা-নাজাত, এগুলোকে প্রশ্ন ও সমালোচনা করার স্বদেশি গ্রিক-রোমান তরিকা তারা শিখে গেছে। এখন ধর্মের এইসব উৎপাত আর সহ্য করা যায় না। ধর্মের কারণে ক্রুসেডে ইউরোপ বিপর্যস্ত, ৩০ বছর যুদ্ধে অর্থনৈতিকভাবে ইউরোপ শেষ, কৃষকদের ধরে ধরে জমিদারেরা বাহিনী বানিয়ে নিয়ে রাজার রাজ্যজয়ের খায়েশ মিটিয়েছে। মানুষ শান্তি চায়, ইউরোপ শান্তি চায়। সমাধান কী?

সমাধান হলো ধর্মকে রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতি থেকে তাড়িয়ে এক্কেবারে ব্যক্তিগত জীবনে আটকে দেওয়া। একমাত্র এভাবেই মুক্তি পাওয়া যেতে পারে ধর্মের জ্বালাতন থেকে।১৭শ শতক থেকে **ইউরোপে শুরু হলো সেই বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন—এনলাইটেনমেন্ট**। যার শেকড় সেই রেনেসাঁ আর সামনে মডার্নিটির ফল ধরবে। এনলাইটেনমেন্ট (আলোকায়ন) রেনেসাঁ হিউম্যানিজম বা মানবকেন্দ্রিকতারই পরিণত রূপ। এর মূল বৈশিষ্ট্য ৩টি—

১. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (individualism) : আগের সমাজ কাঠামোয় এক স্তর আরেক স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করত (social hierarchy)। যেমন রাজা জমিদারদেরকে, আর জমিদারেরা কৃষক-ব্যবসায়ীদেরকে, মালিকেরা

দাসদেরকে, স্বামীরা স্ত্রীদেরকে। এখন বলা হচ্ছে : না, সবাই সমান, কেউ কাউকে নিয়ন্ত্রণ করবে না। স্বাধীনতা ও সমতা জন্মগত অধিকার।

২. সংশয়বাদ (skepticism) : বিনা প্রশ্নে কিছু মেনে নেওয়া হবে না। খ্রিস্টবাদকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়ে চার্চের হাতে ইউরোপ অনেক ভুগেছে। আর নয়, পুরোনো সকল ধ্যানধারণাকে প্রশ্ন করা হবে, সন্দেহ করা হবে। **আগে ভুল ধরে নিয়ে যুক্তিতর্ক শুরু করা হবে।**

৩. যুক্তি (reason) : যুক্তিতে না ধরলে তা মেনে নেওয়া হবে না। যুক্তিসংগত হতে হবে। **যুক্তিগ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলে হাওয়ার ওপর কারো দাবি, কোনো অলৌকিকতা মেনে নেওয়া হবে না।**
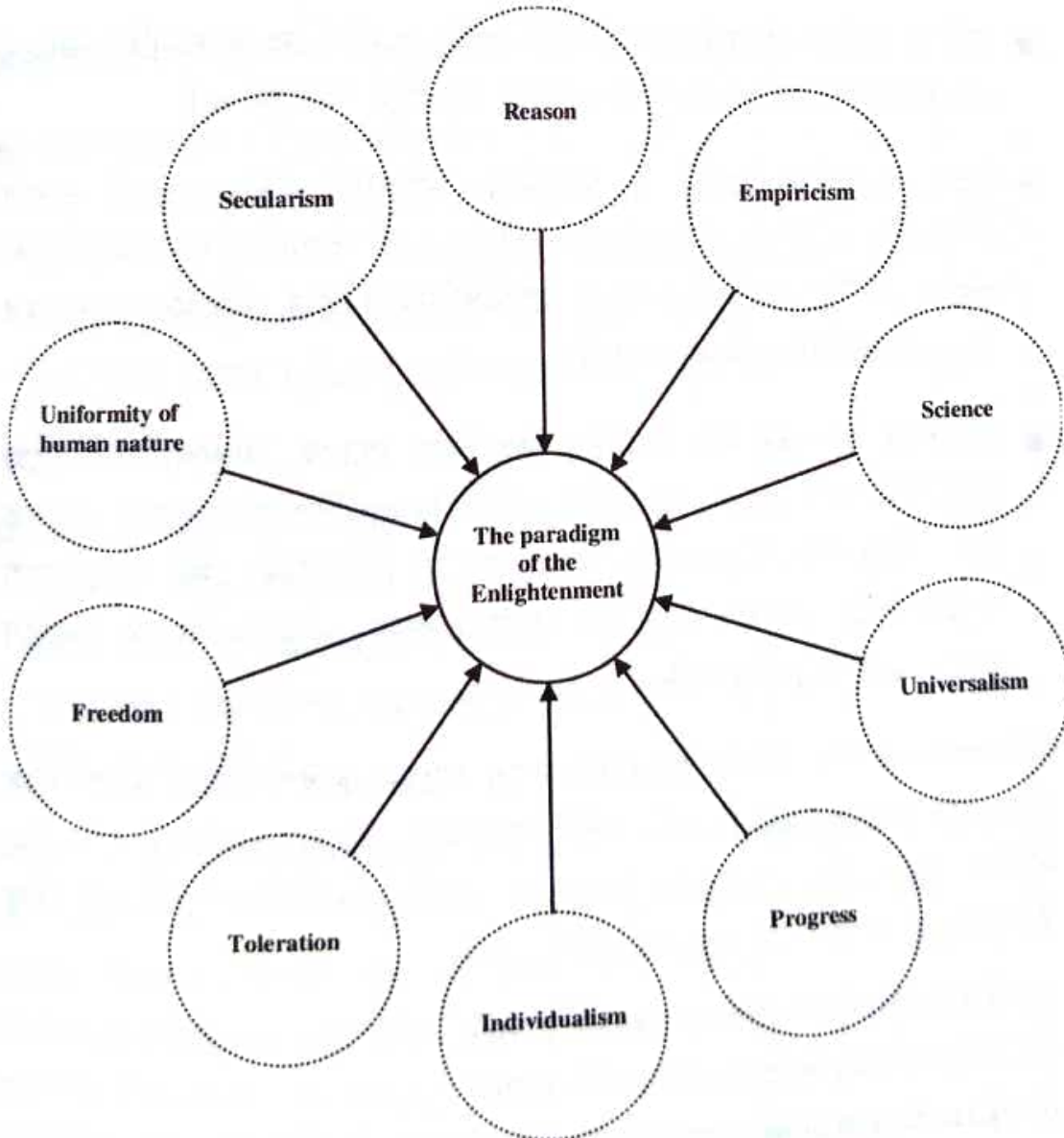
এই তিন খুঁটিকে সামনে নিয়ে পেছনের অভিজ্ঞতা থেকে এসময়ের দার্শনিকগণ যেসব আইডিয়া তৈরি করলেন, মোটাদাগে সেগুলো এমন—

- স্বর্গীয় জ্ঞানের ওপর মানবজ্ঞান-যুক্তির সার্বভৌমত্ব
- কর্তৃপক্ষ ও ক্ষমতার বৈধতার উৎস কী বা কে? (ঈশ্বর যাকে মনোনীত করেছে সে? যেমন রাজা বা পোপ? নাকি মানুষ যাকে মনোনীত করবে সে? অর্থাৎ গণতন্ত্র)
- জ্ঞানের প্রধান উৎস ওহি নয়, বরং ইন্দ্রিয়। [বিজ্ঞান]
- পার্থিব কল্যাণ বা সুখই আরাধ্য, কোনো নাজাত মানবজীবনের সার্থকতা নয়।
- রাষ্ট্র ও চার্চকে আলাদা রাখতে হবে। রাষ্ট্রীয়-অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে চার্চ হস্তক্ষেপ করবে না। [সব জায়গায় ধর্ম টেনে আনবেন না]
- উন্নত নৈতিকতা যেমন : সামাজিক নিয়ন্ত্রণের (hierarchy) বদলে ব্যক্তিস্বাধীনতা, যুদ্ধের বদলে ভ্রাতৃত্ব-সহিষ্ণুতা, মানবকেন্দ্রিক মানবজ্ঞানভিত্তিক প্রগতি, বংশীয় সাম্রাজ্যের বদলে সাংবিধানিক সরকার, সামাজিক পদক্রমের বদলে সমতাভিত্তিক সমাজ ইত্যাদি।
- প্রকৃতিকে আর ভয় নয়। প্রকৃতির কিছু নিয়ম রয়েছে, সেগুলো জানা যাচ্ছে (নিউটনের কাজ থেকে এই ধারণা জন্মালো)। **প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোর বস্তুগত কারণ খুঁজে বের করে আমরা কমন প্যাটার্ন বের করব। সেই মূলসূত্রগুলো ব্যবহার করে আমরাই প্রকৃতিকে ব্যবহার করব।** মানুষের সর্বোচ্চ কল্যাণে ব্যবহৃত হবে প্রাকৃতিক শক্তি।

আলোকায়নের ঠিক আগের জনকদের মাঝে আছেন ফ্রান্সিস বেকন, থমাস হবস এবং রেনে দেকার্ত। আর বিজ্ঞানী-দার্শনিকদের মাঝে আছেন গ্যালিলিও, কেপলার, লিবনিয প্রমুখ। রেনেসাঁর শুরুটা ইতালিতে হলেও এনলাইটেনমেন্টের শুরু কিন্তু ইংল্যান্ডে। ৩ ভাগে ভাগ করা হয় এই যুগকে—

» Early Enlightenment (1685-1730)
» High Enlightenment (1730-1780)
» Late Enlightenment (1790-1815)

নিউটনের *প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা* (১৬৮৬) প্রকাশ এবং জন লকের *মানব বোধ সংক্রান্ত রচনাবলি* (১৬৮৯) থেকে আলোকায়নের শুরু ধরা হয়। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তায় এই দুটো কাজ মূল হাতিয়ার হিসেবে ছিল।

ফরাসি দার্শনিকদের হাত ধরে এলো পরের ধাপ। ভলতেয়ার, রুশো, মন্তেস্কু, বুফন, দিদেরো-দের লেখাজোখায়...। কফিহাউজ, পাঠচক্র, একাডেমি, বিশ্ববিদ্যালয়, পত্রপত্রিকা, বই, লিফলেট দিয়ে এইসব নতুন আইডিয়া ছড়িয়ে পড়ল।

এ পর্যায়ে এনলাইটেনমেন্টের আইডিয়াগুলো আমরা ব্যাবহারিক প্রয়োগ হতে দেখব।

- প্রুশিয়ার রাজা মহান ফেড্রেরিক এই নতুন ধ্যানধারণা ব্যবহার করে প্রুশিয়াকে আধুনিকায়ন করেন।
- রাশিয়ার ২য় ক্যাথরিন, অস্ট্রিয়ার ২য় জোসেফও একই কাজ করেন।
- জন লকের লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা হলো *আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।* যার ওপর ভিত্তি করে হলো আমেরিকা বিপ্লব (১৭৭৬)। মন্তেস্কুর সরকারে ক্ষমতা বণ্টন ধারণা (আইন-বিচার-নির্বাহী বিভাগ) গৃহীত হয় আমেরিকার সংবিধানে। হিউমের দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট জেমস ম্যাডিসন, তাই আমেরিকার সংবিধানও এনলাইটেনমেন্টের বাস্তবায়ন।
- ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে ২য় ধাপের সমাপ্তি হলো। **মোটকথা সর্বক্ষেত্র থেকে চার্চকে ও খ্রিস্টবাদকে হটিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও সমাজ তৈরি হলো, আলোকায়নের নব্য চিন্তাধারা প্রয়োগ হলো বাস্তবে। পুরোনো অর্থব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ-কর্তৃত্ব ঝেড়ে ফেলে আমরা পেলাম আলোকিত ইউরোপ-আমেরিকা।**

কিছুটা 'নাস্তিক-নাস্তিক' শোনালেও এনলাইটেনমেন্ট দার্শনিকদের মাঝে সবাই নাস্তিক ছিল না; বরং অধিকাংশ ছিল আস্তিকই, কিন্তু ক্যাথলিক চার্চের বেঁধে দেওয়া 'ঈশ্বর'-এ বিশ্বাসী ছিল না। তারা বিশ্বাস করতেন, ওহি (বাইবেল) বা যাজকতন্ত্রের প্রয়োজন নেই, যুক্তি এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের দ্বারাই স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত (natural theology)। যুক্তিই ঐশী জ্ঞানের একচ্ছত্র উৎস। তারা প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলোর ধর্মীয় কিতাবপত্র (পড়ুন বাইবেল) যুক্তিতর্কের দ্বারা বাতিল

করেন। দার্শনিকরা মোটাদাগে ২ ধরনের ছিলেন—

» **র‍্যাডিকাল :** ধর্মসমাজ থেকে বহিষ্কৃত ইহুদি দার্শনিক স্পিনোজার দর্শন থেকে এর উৎপত্তি। এরা বিদ্যমান কাঠামো পুরোপুরি উচ্ছেদ করে গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় কর্তৃত্বপনার পূর্ণ বিলোপের পক্ষে। এমনকি নৈতিকতার থেকেও ধর্মকে পৃথক রাখার পক্ষে এই দল।

» **মডারেট :** যারা তৎকালীন ক্ষমতা-ধর্মের কাঠামোর সংস্কার চেয়েছিলেন, উৎখাত না। যেমন : দেকার্ত, জন লক, ক্রিশ্চিয়ান উলফ। তুলনামূলক মডারেট বলে পরিচিত ইমানুয়েল কান্টের আহ্বান : 'Dare to know! Have courage to use your own reason!' (সাহস করে জানো! নিজের বিচারবুদ্ধি ব্যবহারের সাহস আনো)। মানে বাইবেল ও পাদরিদের অন্ধভাবে না মেনে নিজের বিবেক প্রয়োগ করো। এই সক্ষমতাই 'এনলাইটেনমেন্ট'। এই ক্ষমতা যার আছে, সে-ই আলোকিত মানুষ।

হিউম্যানিজম ধর্ম, বস্তুবাদী দর্শন, পুঁজিবাদী অর্থনীতি, ভোগবাদী জীবনধারা, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ-রাষ্ট্রের সমন্বয়ে এলো নতুন সভ্যতা—পাশ্চাত্য সভ্যতা।

মুসলিম বিশ্বের অভিজ্ঞতা

এভাবেই এনলাইটেনমেন্ট দর্শন প্রতিষ্ঠিত সকল ধর্মের বিপরীতে অবস্থান নিল। সকল বলয় থেকে ধর্মকে বের করে দিয়ে কেবল ব্যক্তিগত আচার হিসেবে রেখে দিলো। কেননা খ্রিস্টবাদ নিয়ে ইউরোপের যে হাজার বছরের অভিজ্ঞতা, তাতে এ ছাড়া বিকল্প নেই। শান্তিতে বাঁচার জন্য ইউরোপের সামনে একটাই রাস্তা ছিল : যাজকতন্ত্রের উৎখাত।

আচ্ছা, খ্রিস্টবাদ নিয়ে ইউরোপের যে হাজার বছরের অভিজ্ঞতা, ইসলাম নিয়ে মুসলিম সভ্যতার অভিজ্ঞতাও কি তাই? চলুন ঘুরে আসা যাক।

দুই পাশে দুই সুপার পাওয়ারের মাঝে এক জনগোষ্ঠী। না আছে উর্বরভূমি, না আছে সভ্যতার ছোঁয়া, না আছে ঐতিহ্য। দুই সুপার পাওয়ারকে এই ভূখণ্ড আকর্ষণ করেনি। মহাবীর আলেক্সান্ডার গেছে পাশ দিয়ে, তাকে টানেনি। ইতিহাস ও সভ্যতার কাছে অপাঙক্তেয়-অস্পৃশ্য-অগণ্য এক রুক্ষ-শুষ্ক ভূখণ্ড ও তার একরোখা জনগোষ্ঠী। পরস্পর লড়াইরত, বর্বর প্রথা-পার্বণে অসংস্কৃত। **মানে দূর দূর তক কোনো সম্ভাবনা নেই এই জাতি ঐক্যবদ্ধ হবার; আগামী শত বছরেও কোনো সম্ভাবনা নেই এই জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান নির্মাণ করার; আস্ত সভ্যতা নির্মাণ তো স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না।**

জ্ঞানের জাগরণ ও সভ্যতা নির্মাণ

আচমকা একদিন সেই জাতির মাঝে জ্ঞানের উন্মেষ। আদেশ হলো—

» ইক্বরা... পড়ুন, আপনার রবের নামে... যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের দ্বারা।[১]
» আফালা তা'ক্বিলুন... তোমরা কি বিচারবুদ্ধি খাটাবে না?[২]
» আফালা তুবছিরুন... তোমরা কি দেখো না?[৩]
» তারা বধির-মূক-অন্ধ, তারা ফিরবে না।[৪]
» বস্তুত অন্ধ তো চোখ নয়, অন্ধ হয় বুকের ভেতরের হৃদয়।[৫]

বলা হলো : এরা তো এদের বাপ-দাদার অনুসরণ করছে...এরা যা করছে সে ব্যাপারে এদের কোনো জ্ঞান নেই। **বাপ-দাদার দেখাদেখি কুসংস্কার, সারহীন প্রথা থেকে বের করে এদের ঝেঁটিয়ে নেওয়া হলো যুক্তি, চিন্তাভাবনা, বিচারবুদ্ধির দিকে। খেয়ালখুশি থেকে বেরিয়ে বিচারবুদ্ধি খাটাও।**

» বীজ থেকে চারা তোমরা উঠাও, না আমি?[৬]
» গর্ভের সন্তান তোমরা সৃষ্টি করো, না আমি?[৭]
» যাদের উপাসনা তোমরা করো, তারা তো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না।[৮]

---

[১] পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক (জমাট-বাঁধা রক্তপিণ্ড) থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। [সুরা আলাক, আয়াত :১-৫]

[২] তোমরা কি বুঝবে না? [সুরা আলি ইমরান, আয়াত :৬৫]

[৩] তবু কি তোমরা চক্ষুষ্মান হবে না? [সুরা যারিয়াত, আয়াত :২১]

[৪] তারা (মুনাফিকরা) বধির, মূক, অন্ধ; কাজেই তারা (হিদায়াতের দিকে) ফিরে আসবে না। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮]

[৫] তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুত চোখ তো অন্ধ নয়; বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। [সুরা হজ,আয়াত : ৪৬]

[৬] তোমরা যে বীজ বপন করো সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা তা অঙ্কুরিত করো, না আমি অঙ্কুরিত করি? [সুরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৬৩-৬৪]

[৭] তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? তা কি তোমরা সৃষ্টি করো, না আমিই তার স্রষ্টা? [সুরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৫৮-৫৯]

[৮] হে মানবজাতি, একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করো—তোমরা আল্লাহর

» আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের চক্ষু-কর্ণ-হৃদয়।[১]

বলা হলো : চক্ষু-কর্ণ-হৃদয়ের সদ্ব্যবহার করো, খাটাও... ঘোরো...দেখো... ভাবো... মিলাও... আমাকে চিনে নাও।

> *বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, কীভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুর্নবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।*[২]

> *নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে।*[৩]

> *অচিরেই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দেখাব, বিশ্বজগতের প্রান্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অবশ্যই এটা (কুরআন) সত্য।*[৪]

বিনা প্রশ্নে বাপদাদার অনুসরণ ও হাওয়ার ওপর বিশ্বাস-কুসংস্কারের ইতি টেনে যৌক্তিক চিন্তার সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলে পৃথিবীর ইতিহাসে দ্রুততম সভ্যতার জন্ম দিলো ইসলাম। **মূলনীতিবিহীন লাগামছাড়া চিন্তা কখনোই সমাধানে নিতে পারে না; বরং জন্ম দেয় সমস্যা, অসংলগ্ন পরস্পরবিরোধী বহু মতবাদ। একটা পরিপূর্ণ মূলনীতি প্রয়োজন। সেই মূলনীতিই ওহি।** কীভাবে

পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্রিত হলেও। আর তাদের কাছ থেকে মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, এটাও তারা তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষণকারী (পূজারি) ও অন্বেষণকৃত (পূজিত মূর্তি-প্রতিমা) কতই না দুর্বল! [সুরা হজ, আয়াত : ৭৩]

[১] আর আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এ অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। আর তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয়; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। [সুরা নাহল, আয়াত : ৭৮]

[২] সুরা আনকাবুত, আয়াত : ২০

[৩] সুরা আলি ইমরান, আয়াত : ১৯০

[৪] সুরা ফুসসিলাত (হা-মীম সাজদাহ), আয়াত : ৫৩

বুঝবে এই ওহিটাই যে আল্লাহর পক্ষ থেকে? অন্যগুলো যে আল্লাহর থেকে নয়? যুক্তি খাটাও... ভাবো।

» **আল্লাহর পক্ষ থেকে না হলে এতে থাকত পরস্পর বিরোধিতা ও অসংলগ্নতা।**[১] দেখো কুরআনে কোনো অসংলগ্নতা ও সাংঘর্ষিকতা নেই।

» **যদি উম্মি (আনপড়)[২] মুহাম্মাদ এটা বানিয়ে থাকে তবে শিক্ষিত তোমরা তো আরো ভালো বানাতে পারবে।** নিয়ে এসো এমন একটা কিতাব, ডাকো তোমাদের দেবদেবীদের সাহায্যের জন্য।[৩] আচ্ছা, বাদ দাও, ১০টা সুরা[৪]... রাখো, একটা সুরাই বানাও এমন।[৫] ঠিক আছে, একটা আয়াতই বানিয়ে আনো দেখি।[৬]

» তোমাদের জন্য পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন নবি, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করেন[৭] বিশুদ্ধ আরবি ভাষায়[৮]।

---

[১] তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না? যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে আসত, তাহলে নিশ্চয় তারা তাতে পরস্পর-বিরোধী অনেক কথা পেত। [সুরা নিসা, আয়াত :৮২]

[২] নিরক্ষর

[৩] বলুন, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন রচনা করার জন্য সমগ্র মানুষ ও জিন সমবেত হয়, তবু তারা এর অনুরূপ কুরআন রচনা করতে পারবে না; যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়। [সুরা ইসরা, আয়াত : ৮৮]

[৪] নাকি তারা বলে, তিনি (নবি) এটি রচনা করেছেন? বলুন, 'তাহলে তোমরা এর অনুরূপ দশটি সুরা (বানিয়ে) নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার (তোমাদের সাহায্যের জন্য) ডেকে নিয়ে আস, যদি তোমরা (তোমাদের সন্দেহের ক্ষেত্রে) সত্যবাদী হয়ে থাক। [সুরা হুদ, আয়াত : ১৩]

[৫] নাকি তারা বলে, তিনি (নবি) এটি রচনা করেছেন? বলুন, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সুরা (বানিয়ে) নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো (তোমাদের সাহায্যের জন্য) ডাকো, যদি তোমরা (তোমাদের সন্দেহের ক্ষেত্রে) সত্যবাদী হয়ে থাকো। [সুরা ইউনুস, আয়াত : ৩৭-৩৮]

[৬] নাকি তারা বলে, তিনি (নবি) এটা বানিয়ে বলছেন? বরং আসলে তারা ঈমানই আনবে না। অতএব তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে তার অনুরূপ একটি বাণী (রচনা করে) নিয়ে আসুক। [সুরা তুর, আয়াত : ৩৩-৩৪]

[৭] যেমন (তোমরা আমার একটি অনুগ্রহ লাভ করেছ যে,) আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে রাসুল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন। আর তা শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না। (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫১)

[৮] এই কুরআন তো বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে। আপনার অন্তরে, যাতে আপনি ভীতি-প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন। সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।

(তাকে তোমরা খুব ভালো করেই চেনো। তোমরাই তাকে মেনে এসেছ এতকাল। তোমরাই তার নাম দিয়েছ 'আল-আমিন' (বিশ্বস্ত)। তোমরা তার মুখে কুরআন শুনলে, তাও তো আরবি ভাষায়ই ছিল, তোমাদেরই ভাষায়। শুনেটুনে বুঝলেও যে, এটা তার পক্ষে বানানো অসম্ভব, যেকোনো মানুষের পক্ষেই অসম্ভব। এত এত ডেটাকে তোমরা তুচ্ছ দুনিয়ার লোভে এখন অস্বীকার করছ?)

ঈমানের অধিকাংশ টপিক গায়েব (অদৃশ্য) সংক্রান্ত হলেও, অধিকাংশটাই বিশ্বাসভিত্তিক হলেও, ঈমানের শুরুটা কিন্তু যুক্তিতে। মানবযুক্তির যেখানে শেষ, বস্তুগত সকল ব্যাখ্যা-অভিজ্ঞতা যেখানে পরাস্ত, সেখানে ঈমানের শুরু। সাহাবিদের যুক্তি, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান পরাস্ত হয়েছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা এবং কুরআনের অলৌকিকত্বের কাছে। সাহাবিদের কেউই না জেনে, না বুঝে, অন্ধবিশ্বাসে ঈমান আনেননি। 'আল্লাহর কুদরত' ছাড়া অন্যকিছু দিয়ে হিসেব মেলাতে না পেরে ঈমান এনেছেন। কুরআনে আল্লাহ এটাই চেয়েছেন। চোখ-কান-অন্তর খাটিয়ে হিসাব মেলাতে ব্যর্থ হয়ে, পরাস্ত হয়ে আমরা যেন ঈমান আনি।

৬৩৩ সালে শরিয়ত পূর্ণ হলো (নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত)। আর আরবে-আরবে সর্বশেষ যুদ্ধ হলো ৬৩৪-৩৫ সালে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের ১ম বছরে, ইয়ামামার যুদ্ধ। শত বছরের হানাহানিরত আরব গোত্র ঐক্যবদ্ধ হতে সময় লেগেছে মাত্র ১১-১২ বছর, হিজরত থেকে নিয়ে। আর পরের ১০ বছরের মাঝে পরাশক্তি পারস্য সাম্রাজ্য পুরোটা এবং আরেক পরাশক্তি বাইজান্টাইন (পূর্ব রোমান) অর্ধেকটা জয় করা শেষ (৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ)। পরের ১০০ বছরে স্পেন থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত। অর্থাৎ একটা সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়তে ইসলাম সময় নিয়েছে ১০০ বছরেরও কম। এর মাঝে বিস্তৃত লিখিত আইনশাস্ত্র, জ্ঞানপীঠ, সুশৃঙ্খল সামরিক বাহিনী, আইনের শাসন, অন্য সভ্যতা থেকে নিয়ে সমৃদ্ধ হওয়া, ইনসাফের সমাজব্যবস্থা, ব্যক্তিমালিকানার সাথে সাথে দ্বিমুখী সম্পদপ্রবাহের

[সুরা শুআরা, আয়াত : ১৯২-১৯৬]

আলিফ লা-ম-র; এগুলো সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত। আমি একে আরবি ভাষায় কুরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১-২]

হা-মীম। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি এটি নাযিল করেছি আরবি ভাষায় কুরআনরূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পারো [সুরা যুখরুফ, আয়াত : ১-৩]

Black Sea
Caspian Sea
CENTRAL ASIA
Oxus (Amu Darya)
Constantinople
BYZANTINE
ANATOLIA
Mesopotamia
Tigris
Euphrates
SASANIAN
EMPIRE
Mediterranean
Sea
EMPIRE
SYRIA
Palmyra
Syrian
Desert
Ctesiphon
Zagros mountains
IRAN
IRAQ
Jerusalem
Hira
Alexandria
Petra
Tabuk
NORTH AFRICA
EGYPT
Persepolis
Fars
Persian Gulf
Khaybar
Medina
ARABIA
Oman
Nile
Mecca
Red Sea
Yemen
ETHIOPIA
ইসলামপূর্ব পরাশক্তি
খলিফা উমার রা. এর
যুগে (মৃত্যু ৬৪৪ খ্রিঃ)
নবিজি সা. এর যুগে (৬৩৩ খ্রিঃ)
খিলাফতে রাশেদা এর যুগে (৬৬১ খ্রিঃ)
উমাইয়া খিলাফতের যুগে (৭৫০ খ্রিঃ)

অর্থনীতি, জমিদারব্যবস্থার বিপরীতে কৃষকদের মাঝে ভূমিবণ্টন, যৌক্তিক সীমিত করব্যবস্থা, যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্তনীতি (কিয়াস), সনদভিত্তিক তথ্য যাচাই ব্যবস্থা (উলুমুল হাদিস), নারী পণ্ডিত তৈরি ইত্যাদি সমাপ্ত।

১০০ বছর পর থেকে শুরু হলো বিজ্ঞানের যুগ, উদ্ভাবনের যুগ।

- ইসলামি শরিয়তের উত্তরাধিকার বণ্টনের সমাধান করতে গিয়ে আল-খাওয়ারিজমির হাতে জন্ম নিল বিজ্ঞানের ভাষা—বীজগণিত।

- যেহেতু সে সময় নতুন নতুন এলাকা ইসলামি সভ্যতার অধীনে আসছিল; পৃথিবীর যেকোনো স্থান থেকে কিবলা ঠিক করা, যেকোনো স্থানে সালাতের সময় নির্ধারণ এবং ইসলামি ক্যালেন্ডার উদ্ভাবনের জন্য ব্যাপকহারে জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, গোলীয় জ্যামিতি ও গোলীয় ত্রিকোণমিতি চর্চা হতে থাকল। (Gingerich, 1936)

- কেবল আসরের সালাতের সময় বের করতে গিয়ে মুসলিমরা নতুন নতুন প্যারামিটার আবিষ্কার করে—সৌর অয়নবৃত্তের বাঁক বা inclination of the ecliptic, অপভূর গতি, অয়নচলনের হার, সূর্যের কেন্দ্রীয় দূরত্ব, নতুন সৌর সমীকরণ ইত্যাদি ইত্যাদি।[১]

- 'আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার চিকিৎসা সৃষ্টি করেননি'—এই হাদিস[২] থেকে মুসলিম চিকিৎসকরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন গবেষণায়, বিভিন্ন সভ্যতার চিকিৎসাবিদ্যা অনুবাদ ও বিশ্লেষণে।

- ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি রাহিমাহুল্লাহ তার মাতালিব কিতাবে ইসলামের কসমোলজি (মহাকাশবিজ্ঞান) আলোচনা করেন। **এরিস্টটলের পৃথিবীকেন্দ্রিক মডেলের সমালোচনা করেন।**

---

[১] George Saliba in Sabreen Syed, How the Muslim Prayer Led to Modern Astronomy online video, kn-ow.com.

[২] আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ এমন কোনো রোগ পাঠাননি, যার আরোগ্যের ব্যবস্থা দেননি।' [*সহিহ বুখারি* : ৫৬৭৮]

জ্ঞানীমহলে এ কথা অবিসংবাদিত যে, মুসলিম সভ্যতায় বিজ্ঞানচর্চার কারণ ছিল একমাত্র ইসলাম[১]। **লাগামছাড়া মুক্তচিন্তা কোনো লক্ষ্যে নিতে পারে না, ওহির দেখানো পথে মুক্তচিন্তা গড়ে তুলেছিল দ্রুততম পরিপূর্ণ সভ্যতা।** ইহুদি প্রাচ্যবিদ Hartwig Hirschfeld-এর একটি উক্তিই এ ব্যাপারে যথেষ্ট—

> *আল-কুরআনকে যে জ্ঞানধারার উৎসমুখ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, এটা দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আকাশ-পৃথিবী থেকে শুরু করে মানবজীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয় এখানে স্থান পেয়েছে। ফলে এই পবিত্র গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা হিসেবে রচিত হয়েছে বিষয়ভিত্তিক অগণিত প্রবন্ধ-রচনা। এভাবে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ব্যাপক আলোচনা এবং পরোক্ষভাবে মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞানের নানা শাখার বিস্ময়কর অগ্রগতির নেপথ্যে ভূমিকা আল-কুরআনেরই। ... একইভাবে কুরআন চিকিৎসাবিদ্যার জন্যও একটা উদ্দীপনা জুগিয়েছিল, সামগ্রিকভাবে উৎসাহ দিয়েছিল প্রকৃতির নিবিড় পর্যবেক্ষণকে।*[২]

ইসলাম আসার আগে ৭ম শতকের দুনিয়ায় জ্ঞান বলতে ছিল ইহুদি আইন, খ্রিষ্টীয় মরমিবাদ আর গ্রিক যুক্তিচর্চা। ইসলাম এনে দিলো নতুন জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) : 'ইন্দ্রিয় দ্বারা নিবিড় পর্যবেক্ষণ'। আল-খাওয়ারিজমির *আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা* রচনার পর থেকে (৮২০ সাল) গাণিতিকভাবে নির্ণীত জ্ঞানকে বলা হতো 'ইলমুত তাজরিবিয়াহ' (علم التجريبه) বা পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান। **বিশ্বাসভিত্তিক জ্ঞান (ধর্ম) ও যুক্তিভিত্তিক জ্ঞান (দর্শন) থেকে পৃথক করতে এই 'সম্পূর্ণ বস্তুগত তথ্যভিত্তিক' জ্ঞানের নাম দেওয়া হয় তাজরিবিয়াহ।** এই তথ্য-উপাত্ত-গবেষণা-পরিসংখ্যান দিয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিকে (science) বা এই ঝোঁককে একটা সময় বলা হতো *arabicorum studiorum sensa* (study view of arabs), আরবদের জ্ঞান-দর্শন[৩]।

---

[১] D.E. Smith and L.C. Karpinski, The Hindu-Arabic Numerals (Ginn and Company Publishers, 1911)

[২] Hartwig Hirschfeld (1902), New researches into the composition and exegesis of the Qoran, Royal Asiatic Society, page : 9

[৩] Metlitzki, D. 1977. The matter of araby in medieval england. Yale university press সূত্রে Islam in Europe, Jack Goody. Page : 61

এই 'তাজরিবা' বা নিবিড় পূর্বাপর পর্যবেক্ষণের ফলে এবং পর্যবেক্ষণ-যুক্তিকে জ্ঞানতত্ত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দরুন ইসলামি বিশ্বে—

১.গ্রিকদর্শন আরবিতে অনূদিত হয়

২.ভারতীয় বিজ্ঞান অনূদিত হয়

৩. তাজরিবার ভিত্তিতে সেগুলো সংশোধন এবং একই সাথে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির জোয়ার বয়ে যায়।

পাঠক কি বুঝতে পারছেন? **যে মুক্তি ইউরোপকে পেতে হয়েছে ধর্মকে বিদায় করে দিয়ে, সেই মুক্তি আমাদের দিয়েছে ইসলাম এসে। যে আলোকায়নের দাবি তারা ১৭শ শতকে এসে করেছে, তার চেয়ে পরিপূর্ণ আলো আমরা পেয়েছিলাম হেরা গুহায়। আমাদের আলোকপ্রাপ্তি (আক্ষরিক অর্থে) হয়ে গেছে সেই ৭ম শতাব্দীতেই। জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে আমরা পথ (হিদায়াত) পেয়েছি ওহির আলোয়। আমাদের সর্বোচ্চ উন্নতির জন্য আমাদের ফিরতে হবে সেই হিদায়াতের আলোয়।**

ইনসাফ ও সমতাভিত্তিক সমাজ

সাহাবি, তাবিয়ি, তাবে-তাবিয়ি—এই ৩ প্রজন্ম হলো শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। রেফারেন্স জেনারেশন। এই প্রজন্মের অর্জনগুলো দেখুন আর ইউরোপের দুই অধ্যায়ের সাথে মেলান—

আইনের সাম্য ও সুশাসন

৭ম শতকে ইসলাম এমন এক আইনব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যা নিশ্চিত করেছে প্রত্যেকের জন্য ন্যায়বিচার। সে সংখ্যালঘুই হোক বা দাস। আইনের চোখে এমন সমতা তৈরি করেছে, যা প্র্যাকটিক্যালি আজও সম্ভব হয়নি।

» যেখানে সম্রাটের (পড়ুন খলিফা) নিযুক্ত বিচারক রায় দিয়েছে সম্রাটেরই বিরুদ্ধে[১]

[১] কাজি শুরাইহ নামে তিনি প্রসিদ্ধ। খলিফা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে প্রথম ফয়সালা দেন কেনা ঘোড়া ফেরত দেবার ব্যাপারে এক বেদুঈনের দায়ের করা মামলায়। বিমুগ্ধ খলিফা বড় বড় সাহাবি বর্তমান

» খলিফার বিরুদ্ধে রায় হয়েছে ইহুদির পক্ষে। যদিও খলিফা নিজেই সর্বোচ্চ বিচারক। এবং খলিফা সে বিচার মেনেও নিয়েছেন, ক্ষমতাপ্রয়োগে বিচারবিভাগকে প্রভাবিত করেননি।

» আইনভঙ্গের জন্য সম্রাট নিজের হাতে জনসমক্ষে নিজ সন্তানকে দিয়েছেন ৮০ বার চাবুকের আঘাত।[১] বলা হয়েছে : আজ যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তাহলে চুরির শাস্তি হিসেবে তার হাতও কেটে ফেলা হতো।[২] খলিফাপুত্রকেও ব্লাডমানি পরিশোধ করতে হয়েছে।[৩]

থাকতেও তাকে নিয়োগ দিলেন কুফা শহরের 'চিফ জাস্টিস' পদে। প্রায় ৬০ বছর এই পদে দায়িত্ব পালন করেন উমার, উসমান, আলি, মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুম এই ৪ জন খলিফার যুগে। খলিফা আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে রায় দেন এক ইহুদির দায়ের করা মামলায়। বর্মের মালিকানা নিয়ে খলিফা আর ইহুদির মাঝে বিরোধের ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ। নিজের ছেলের জামিনের আসামি পালিয়ে গেলে ছেলেকেই জেলে ঢুকিয়ে দেন তিনি। (দীর্ঘশ্বাস) (*তাবিয়িদের ঈমানদীপ্ত জীবন;* ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা, রাহনুমা প্রকাশনী, পৃষ্ঠা : ১০৮) এবং (*আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া* ই.ফা., খণ্ড : ৯; পৃষ্ঠা : ৪৫)

[১] হিজরি ১৪ সনে খলিফা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজ পুত্র উবাইদুল্লাহকে মদ্যপানের অপরাধে বেত্রাঘাত করেন (*আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া,* ই.ফা., খণ্ড : ৭; পৃষ্ঠা : ৯৪)
আরেক সন্তান আব্দুর রহমান ওরফে আবু শাহমাকে মদ্যপানের অপরাধে বেত্রাঘাত করেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১ মাস পর মৃত্যুবরণ করেন। (*মুসান্নাফু ইবনি আব্দির রাযযাক : ১৭০৪৭*)

[২] আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রের এক নারী চুরি করলে তার (ওপর চুরির হদ হিসেবে হাতকাটার শাস্তি প্রয়োগের) ব্যাপারে কুরাইশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুলল। এ অবস্থায় তারা বলাবলি করতে লাগল, এ (শাস্তি মওকুফ করার) ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কে আলাপ করতে পারে? তারা বলল, একমাত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তম উসামা বিন যায়িদ রাযিয়াল্লাহু আনহুই এ ব্যাপারে আলোচনা করার সাহস করতে পারেন। এরপর উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে (নারীর শাস্তি মওকুফের বিষয়ে) কথা বললেন। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (রাগান্বিত হয়ে) বললেন, তুমি কি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হদের (শাস্তি মওকুফ করার) ব্যাপারে সুপারিশ করছ? এরপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে ভাষণে বললেন, তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহকে এ কাজই ধ্বংস করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো অভিজাত লোক চুরি করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অন্যদিকে যখন কোনো অসহায় গরিব সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার ওপর হদ (আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি) জারি করত। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তাহলে (চুরির শাস্তিস্বরূপ) আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম। (*সহিহ বুখারি : ৩৪৭৫; সহিহ মুসলিম : ১৬৮৮*)

[৩] উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যার অভিযোগে তার ছেলে উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু রাগের মাথায় হত্যা করে ফেলেন নওমুসলিম পারসি হরমুযান ও খ্রিষ্টান জাফিনাকে। নতুন খলিফা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের ব্লাডমানি (দিয়াত) হিসেবে উবাইদুল্লাহর পক্ষ থেকে ১০০ উট প্রদান করেন।

» আইন খলিফার জন্যও যা, গ্রাম্য লোকের জন্যও তা।

» যুবতী নারী ১৩০০ কিলোমিটার একা সফর করলেও, (অবশ্য এভাবে স্বামী কিংবা মাহরাম পুরুষ ছাড়া নারীদের একাকী সফর করা শারিয়াসম্মত নয়।) কেউ তার দিকে চোখ তুলে তাকাত না,[১] যেখানে আগে খুন-রাহাজানি-ডাকাতি ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা।

জবাবদিহিতামূলক নিয়মতান্ত্রিক সরকার

» আইন মেনে চলার প্রতিশ্রুতির ওপর খলিফার আনুগত্য। শারিয়া লঙ্ঘন হলে উমার রা.-কে এক আম-পাবলিকের জবাব : 'এমনভাবে আপনাকে সোজা করে দেবো, যেভাবে বাঁকা তির সোজা করা হয়।'

» বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র যেন না হয়, এজন্য সর্বদিক দিয়ে যোগ্য নিজ সন্তানকে খলিফা না বানানোর আদেশ দিয়ে গেছেন উমার রা.।

» খলিফার পোশাক নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন : 'সরকারি বরাদ্দে আমাদের তো পুরো পোশাক হয়নি, আপনার কীভাবে হলো'?

» স্বেচ্ছাচারিতার বদলে পরামর্শসভার (শুরা) অধীন খলিফা।

অর্থনৈতিক সুষমা

» জমিদারি প্রথার বদলে কৃষকের মাঝে ভূমি বণ্টন করেন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু।

» বাজারে মূল্য নির্ধারণ না করে প্রাকৃতিক শক্তির (চাহিদা-যোগান সম্পর্কের) ওপর ছেড়ে দেওয়া।

» ব্যক্তি মালিকানার নিশ্চয়তা। আবার যাকাতের দ্বারা সম্পদের দ্বিমুখী প্রবাহ।

---

[১] আদি ইবনু হাতিম থেকে তিরমিযির বর্ণনা, নবিজি বললেন, যার অধিকারে আমার জীবন তার কসম, আল্লাহ অবশ্যই এ দ্বীনকে এমন পূর্ণতা দেবেন একাকিনী নারী হাওদার ওপর চড়ে সুদূর হিরা শহর থেকে এসে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে। কোনো লোকের আশ্রয় দানের প্রয়োজন তার হবে না। ... আদি ইবনু হাতিম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এই তো আমি দেখছি হাওদানশিন নারী কারো নিরাপত্তা সঙ্গা ছাড়াই হিরা থেকে এসে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করে যাচ্ছে। *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া* ই.ফা., খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১২৯-১৩০

» স্বাভাবিক ব্যবসাকে অনুমোদন। কিন্তু একচেটিয়া ব্যবসাকে (সুদ, মজুতদারি, সিন্ডিকেট, ক্ষতিকর পণ্যের ব্যবসা) নিষিদ্ধকরণ।

» যেখানে দারিদ্র্যসীমার অবস্থা এমন যে, যাকাত নেওয়ার জন্য খুঁজেও লোক পাওয়া যায়নি[১]

নারীকে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক মর্যাদা

» পারিবারিকভাবে মা-কন্যা-বোন-স্ত্রী হিসেবে আত্মমর্যাদা ও সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেল। **কন্যা-মা-স্ত্রী-বোন হিসেবে নারীর আন্তঃব্যক্তি সম্পর্কগুলো উলটে গেল।** মাটির তলা থেকে পুরুষের মাথার ওপরে চলে এলো তার অধিকার-মর্যাদা।

- বলা হলো, মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত।[২]
- বলা হলো, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো পবিত্রা স্ত্রী।[৩] কৃষকের কাছে যেমন জমিটুকু[৪] দেহের জন্য যেমন পোশাকখানি।[৫] তেমনি স্ত্রীরা তোমাদের ইজ্জত-মর্যাদা-আশ্রয়-প্রশান্তি-ভরসার জায়গা। উত্তম মুমিন সে, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।[৬]
- বলা হলো, কন্যা হচ্ছে আদরের মূল্যবান সম্পদ।[৭] যে ব্যক্তি ছেলেকে

---

[১] *ফিকহুয যাকাত*, শাইখ ড. ইউসুফ আল-কারযাভি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৬, ১৪৬

A number of scholars claimed that during the period of Umar bin Al-Khattab (13-22H) and Umar bin Abdul Aziz (99-101H) poverty is completely eliminated (Ahmed, 2004; Hidayati &Tohirin, 2010; Md. Isa, 2011; Qaradawi, 1999)

[২] *সুনানুন নাসায়ি* : ৩১০৪, *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৭৮১; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ২৫০২, ৭২৪৮; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৫৫৩৮; *শুআবুল ঈমান* : ৭৪৪৮, ৭৪৪৯। হাদিসটির সনদ হাসান

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ১৪৬৭; *সুনানুন নাসায়ি* : ৩২৩২; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৮৫৫; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৪০৩১; *মুসনাদু আহমাদ* : ৬৫৬৭

[৪] তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র [সুরা বাকারা, আয়াত : ২২৩]

[৫] 'তারা তোমাদের পোশাক, তোমরাও তাদের পোশাক।' [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭]

[৬] *জামি তিরমিযি* ১১৬২ ও ৩৮৯৫ (ihadis) *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৪১৭৬; *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৪৪২০; *শুআবুল ঈমান* : ২৭, ৭৬১২। হাদিসটির সনদ হাসান।

[৭] لا تكرهوا البنات، فإنهن المؤنسات الغاليات
তোমরা কন্যাসন্তানদের অপছন্দ কোরো না। কারণ তারা অন্তরঙ্গা, মিশুক ও অমূল্য ধন। [*মুসনাদু আহমাদ* :

মেয়ের চেয়ে বেশি প্রাধান্য না দেবে, তার জন্য জান্নাত।[১]

» **উত্তরাধিকার ও নিজ সম্পত্তির ওপর পূর্ণ এখতিয়ার পেল নারী।** কুরআন বলে দিলো, পোষ্য উত্তরাধিকারী নয়; বরং মেয়ে সন্তান মিরাসের সম্পদ পাবে, পোষ্য ছেলে পাবে না। নির্দিষ্ট করে দিলো, যাতে কেউ ভায়োলেট করতে না পারে।[২] বান্দার হক নষ্ট করাকে অমার্জনীয় ঘোষণা করে দেওয়া হলো।

স্ত্রীর সম্পদ স্ত্রীর নিজের।[৩] স্বামী উলটো তাকে মোহরানা দিতে বাধ্য, তাকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য।[৪] স্ত্রীর সম্পদ স্ত্রী পরিবারে খরচ করতে বাধ্য নয়।

» **জ্ঞানদান ও জ্ঞানলাভের অধিকার পেল। জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সুযোগ পেল।**

- আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু দামেশকের মসজিদে লেকচার দিতেন। আর সে লেকচারে এসে বসতেন তৎকালীন খলিফা আব্দুল মালিক নিজে।[৫]

১৭৩০৬] : ১৭৩৭৩; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি, খণ্ড : ১৭; পৃষ্ঠা : ৩১০, হাদিস, ৮৫৬; *মুসনাদুর রুইয়ানি* : ২৩৪; *ফাওয়ায়িদু তাম্মাম* : ১৩০১। হাদিসটির সনদ যইফ, তবে হাদিসটি হাসান লি-গাইরিহি

[১] ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তির ঘরে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে যদি তাকে জীবন্ত কবর না দেয়, তাকে অবজ্ঞা না করে এবং তার পুত্রসন্তানকে তার ওপর প্রাধান্য না দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (*সুনানু আবি দাউদ* : ৫১৪৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৯৫৭; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ২৫৪৩৫; *শুআবুল ঈমান* : ৮৩২৬। হাদিসটির সনদ যইফ।

[২] মাতা-পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে; আর মাতা-পিতা এবং আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক বা বেশি, এক নির্ধারিত অংশ। [সুরা নিসা, আয়াত : ০৭]

[৩] পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।...[সুরা নিসা, আয়াত : ৩২]

[৪] আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মাহর দিয়ে দাও খুশিমনে। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করো। [সুরা নিসা, আয়াত : ০৪]

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন : এ আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, স্ত্রীকে মাহর প্রদান করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে সকলে একমত। এতে কোনো বিরোধ নেই। [*কুরআন হাদিসের আলোকে নারী*, ড. মাহবুবা রহমান, ই.ফা. পৃষ্ঠা : ২১৯]

[৫] *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া* সূত্রে Al-Muhaddithat, Shaykh Akram Nadwi, page : 150 তবে একে আজকের ফ্রিমিক্সিং সেমিনার, কো অ্যাডুকেশন কিংবা সেক্যুলার ইন্সটিটিউটে নারীদের ব্যাপক

- এজলাসে ঢুকে মদিনার চিফ জাস্টিসকে কুরআনের দলিল দিয়ে চ্যালেঞ্জ করে মামলা ঘুরিয়ে দিলেন আমরাহ বিনতু আব্দির রহমান রাহিমাহাল্লাহ। মামলা চলে গেল অমুসলিম আসামির পক্ষে।[১]
- খলিফা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে গণজমায়েতের মধ্যে কুরআনের দলিল দিয়ে চ্যালেঞ্জ করে মত পরিবর্তনে বাধ্য করলেন খাওলা বিনতু সালাবা রাযিয়াল্লাহু আনহা।[২]

» **রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও যোগ্য নারীদের মতামত স্বীকৃত হলো।**

- উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু খলিফা থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিদূষী নারীদের মতামত নিতেন।[৩]
- এ ছাড়া শিফা বিনতু আব্দিল্লাহর যুক্তি-পরামর্শ খুব প্রাধান্য দিতেন, তার চৌকস বিদ্যাবুদ্ধির কারণে।[৪]
- তৃতীয় খলিফা নির্বাচনে বিশেষ কিছু নারীর কাছ থেকে রায় নিয়েছেন সমন্বয়ক আব্দুর রহমান ইবনু আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু।[৫]

অংশগ্রহণের দলিল হিসেবে গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। মনে রাখার বিষয় হলো, সেসময় ইসলামি শারিয়াহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। শারিয়াহর সকল মূলনীতি কঠোরভাবে মেনেই তারা এসকল কার্যক্রমে অংশ নিতেন, যা আজকের সেক্যুলার সেট-আপে অসম্ভবের মতো। সুতরাং, এসব দৃষ্টান্ত দিয়ে আজকের ধর্মহীন সহশিক্ষার পরিবেশকে ইসলামাইজেশন করা অবান্তর।

[১] আমরাহ বিনতু আব্দির রহমান রাহিমাহাল্লাহ ছিলেন তাবিয়িয়া ও মুহাদ্দিসা ফকিহা। মুয়াত্তা ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর বরাতে প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৭৯। এই ঘটনাগুলো দ্বারা নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির যে বিরাট পরিবর্তন সেটা বোঝানো উদ্দেশ্য; তবে ব্যাপকহারে নারীরা নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চা ও বিচারিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন এমন দৃষ্টান্ত সালাফের যুগে নেই। এখানে নারী মুহাদ্দিস একটি হাদিস জানতেন, যা তিনি দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। কাজি দলিলটি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ জ্ঞানশাস্ত্রে নারীর গ্রহণযোগ্যতা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছে। বহু যশস্বী মুহাদ্দিস নারী শিক্ষিকাদের থেকে হাদিস শিখেছেন। এর মানে এই নয় যে, রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে নারীকে অংশ নিতে দিতে হবে, যেমনটি অনেক সংস্কারবাদী মুসলিম দাবি করেন।

[২] *আল-ইস্তিয়াব*, ইবনু আব্দিল বার রাহিমাহুল্লাহ সূত্রে প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৮৯

[৩] ইবনু সিরিন রাহিমাহুল্লাহর বর্ণনা। বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহর *আস-সুনানুল কুবরা*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৩ সূত্রে *কুরআন হাদিসের আলোকে নারী*, ড. মাহবুবা রহমান, ই.ফা. পৃষ্ঠা : ৯৬

[৪] আল্লামা ইবনু আব্দিল বার রাহিমাহুল্লাহর বিবরণ। *আল-ইস্তিয়াব*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ১৮৬৮ সূত্রে প্রাগুক্ত

[৫] আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের সম্পর্কে জনগণের সাথে পরামর্শ করেন। মুসলিমদের বিশিষ্ট নেতাকর্মীদের মতামতের নিরিখে সাধারণ মুসলিমদের সমষ্টিগত ও পৃথক পৃথকভাবে

দাসশ্রেণির নতুন সামাজিক পরিচয়

হাজার বছর ধরে চলে আসা অমানবিক দাসপ্রথাকে ইসলাম মানবিকীকরণ করে প্রায়-স্বাধীন অবস্থায় উন্নীত করেছে। খ্রিস্টান পর্যটক ও ঐতিহাসিকেরা যেকোনো প্রকার দাসপ্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও তাদের মন্তব্যগুলো থেকে স্পষ্ট ধারণা মেলে ইসলামের দাসপ্রথার। পর্যটক Eldon Rutter কথাটি নেগেটিভলি বললেও, তা খুব বোঝার দাবি রাখে—

> *[এতে] কোনো সন্দেহ নেই, **দাসপ্রথার 'মুহাম্মাদীয় সহজ ধরন' তৈরি করে তোলে 'সন্তুষ্ট দাস'**। এবং ঠিক এ কারণেই আমি একে দাসপ্রথার আর সব ধরন থেকে বেশি খারাপ মনে করি, **যা দাসদেরকেও নিজেদের অধীনতার ব্যাপারে সন্তুষ্ট করে তোলে**। আর মালিকদেরকেও এমন করে ফেলে, যেন মানুষ কেনাবেচা কিছুই না।*[১]

ইতিহাসবিদ Gustave le Bon তার *Arab Civilization* বইয়ে বলেন—

> *আমি আন্তরিকভাবে মনে করি যে, অপরাপর যেকোনো জাতির দাসপ্রথার চেয়ে ভালো ছিল মুসলিমদের দাসপ্রথা। পূর্বের দাসরা পশ্চিমের দাসদের চেয়ে অনেক ভালো অবস্থায় ছিল। **পূর্বের দাসেরা ছিল পরিবারের অংশ। যারা মুক্ত হতে চাইত, তারা মুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারত, কিন্তু সেটা তারা চাইতোও না।***[২]

ক্যাপ্টেন রিচার্ড বার্টন ছদ্মবেশে মক্কা-মদিনা ভ্রমণ করে মন্তব্য করেন—

প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে মতামত সংগ্রহ করেন। তারপর তিনি পর্দানশিন মহিলাদের কাছে যান, তাদের জিজ্ঞেস করেন। প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করেন। [*আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ* ই.ফা. খণ্ড : ৭; পৃষ্ঠা : ২৬৮]

[১] Eldon Rutter (1933) *Slavery in Arabia*, Journal of The Royal Central Asian Society, 20 : 3, 315-332

[২] Gustave le Bon, *Arab Civilization*, page : 459-460

“

মুহাম্মাদীয় আইন তার অনুসারীদের আদেশ করে দাসদের সাথে সর্বোচ্চ মৃদু ব্যবহার করতে। আর মুসলিমরা সাধারণত তাদের নবির কথা যথাযথ পালন করে। দাসদেরকে পরিবারের সদস্যই মনে করা হয়। যেসব বাসাবাড়িতে মুক্ত কাজের লোকও থাকে, সেখানে দাসরা পাইপে জল ভরা, কফি পরিবেশন, বাইরে বের হবার সময় মালিকের সাথে থাকা, দুপুরে ঘুমের সময় পা টেপা, মাছি তাড়ানো—এসব ছাড়া অন্যান্য কাজ কমই করে। **কোনো দাস সন্তুষ্ট না থাকলে, আইনত মালিককে বাধ্য করতে পারে তাকে বিক্রি করতে অন্য কোথাও। থাকা-খাওয়া-পরা নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা নেই। তাদের কোনো ট্যাক্স নেই। সেনাবাহিনীতে যেতে হয় না, খাজনাপাতি দিতে হয় না। দাসত্ব সত্ত্বেও তারা মিশরের সবচেয়ে মুক্ত লোকের চেয়েও মুক্ত।** আমি মনে করি, এই কথাগুলো সত্য। কিন্তু তবু দাসপ্রথা ব্যাপারটা প্রশ্নবিদ্ধ থেকেই যায়।[১]

নাজাত ও আধ্যাত্মিকতার নতুন ধারণা

আদর্শগতভাবে অতিভাববাদী খ্রিষ্টধর্ম আর অতিবস্তুবাদী পশ্চিমা সভ্যতার ঠিক মাঝখানে অবস্থান ইসলামের। আল্লাহ খোদ মুসলিমদের সম্বোধন করেছেন 'মধ্যপন্থি' উম্মত হিসেবে। ইসলামে আধ্যাত্মিকতা জগৎ-মায়া-চাহিদাকে ত্যাগ করে নয়, এগুলোকে সাথে নিয়ে এগুলোর ভেতরেই আধ্যাত্মিকতা।

- মায়া ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না। আল্লাহর বিধান মোতাবেক মায়ার যথার্থ লালনেই চূড়ান্ত মুক্তি।

» মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।[২]

» পিতা জান্নাতের দরজা।[৩]

---

[১] Captain Sir Richard F. Burton (1893), Personal Narrative Of A Pilgrimage To Al-Madinah And Meccah

[২] সুনানু নাসায়ি : ৩১০৪; সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৭৮১; মুসতাদরাকুল হাকিম : ২৫০২, ৭২৪৮; মুসনাদু আহমাদ : ১৫৫৩৮; শুআবুল ঈমান : ৭৪৪৮, ৭৪৪৯। হাদিসটির সনদ হাসান।

[৩] জামি তিরমিযি : ১৯০০; সুনানু ইবনি মাজাহ : ২০৮৯, ৩৬৬৩; মুসতাদরাকুল হাকিম : ২৭৯৯, ৭২৫১, ৭২৫২; সহিহু ইবনি হিব্বান : ৪২৫; মুসনাদু আহমাদ : ২১৭১৭, ২১৭২৬, ২৭৫১১, ২৭৫২৮, ২৭৫৫২; মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ২৫৪০০। হাদিসটি সহিহ।

» সেই শ্রেষ্ঠ মুমিন যার ব্যবহার ভালো, তার ব্যবহারই ভালো যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো।[১] কেবল গরিব-দুঃখী, ধর্মপ্রতিষ্ঠানে দিলেই সাদাকা, তা না। স্ত্রীর মুখে তুলে দেওয়া লোকমাও সাদাকা। স্ত্রীর জন্য খরচেরও উত্তম বদলা দেওয়া হবে আখিরাতে[২]

» কন্যা সন্তান লালনে জান্নাতের ওয়াদা।[৩]

» উত্তম সন্তান সাদাকায়ে জারিয়া।[৪]

» প্রতিবেশীর হক এত বেশি বলা হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশঙ্কা করেছেন, প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ না বানিয়ে দেওয়া হয়।[৫]

» আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৬]

---

[১] সর্বাধিক পরিপূর্ণ মুমিন সে, যার ব্যবহার-চরিত্র ভালো, আর (ব্যবহার-চরিত্রে) যে নিজের স্ত্রীর কাছে উত্তম সেই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। *জামি তিরমিযি* : ১১৬২ ও ৩৮৯৫ ; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৪১৭৬; *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৪৪২০; *শুআবুল ঈমান* : ২৭, ৭৬১২। হাদিসটির সনদ হাসান।

[২] 'সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যা-ই ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার প্রতিদান নিশ্চিতরূপে প্রদান করা হবে; এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও।' (*সহিহ বুখারি* : ৫৬)

'আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি একটি দিনার আল্লাহর পথে ব্যয় করলে, একটি দিনার দাসমুক্তির জন্য ব্যয় করলে, একটি দিনার মিসকিনদের দান করলে এবং একটি দিনার তোমার স্ত্রী-পরিবারের জন্য ব্যয় করলে। এগুলোর মধ্যে সাওয়াবের দিক থেকে ওই দিনারটিই সর্বোত্তম, যা তুমি তোমার স্ত্রী-পরিবারের জন্য ব্যয় করেছ।' (*সহিহ মুসলিম* : ৯৯৫)

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ১৬৩১; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৮৮০; *জামি তিরমিযি* : ১৩৭৬; *সুনানু নাসায়ি* : ৩৬৫১; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৪১, ২৪১; *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৮৪৪

[৪] *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৭৩৪৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৪২৫, ১৪২৪৭; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ২৫৪৪০; *শুআবুল ঈমান* : ৮৩১১; *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৬১৯৯। হাদিসটি হাসান

[৫] *সহিহ বুখারি* : ৬০১৪, ৬০১৫; *সহিহ মুসলিম* : ২৬২৫; *সুনানু আবি দাউদ* : ৫১৫২; *জামি তিরমিযি* : ১৯৪২, ১৯৪৩; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৬৭৩, ৩৬৭৪

[৬] *সহিহ বুখারি* : ৫৯৮৪; *সহিহ মুসলিম* : ২৬৫৬; *সুনানু আবি দাউদ* : ১৬৯৬; *জামি তিরমিযি* : ১৯০৯; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬৭৩২, ১৬৭৩৩, ১৬৭৬৩, ১৬৭৭২

- নাজাতের ও আধ্যাত্মিক উন্নতির শ্রেষ্ঠ সব চর্চা এই লোক-সমাজের মাঝে থেকেই করতে হয়—
  - » ইলম চর্চা
  - » জামাআতে সালাত
  - » জুমআ ও ঈদের সালাতে বাধ্যবাধকতা
  - » দান-খয়রাত, মিসকিন খাওয়ানো
  - » জিহাদ
- 'তোমরা নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ফেলো না'[১]—ইসলামের একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি। এমন কিছু করা যাবে না, যা ধ্বংসের মুখে, ক্ষতির মুখে, অহেতুক কষ্টের মুখে ফেলে দেয়। মানুষের স্বাভাবিক চাহিদাকে অবদমন করে।

» পেটে ক্ষুধা থাকাবস্থায় খাবার প্রস্তুত হয়ে গেলে, আগে খাবার খেয়ে নাও; যদিও ওদিকে সালাতের ইকা-মত শুরু হয়ে যায়।[২]

» সাহারি খাওয়াটাও সাওয়াবের কাজ। এতে অনেক বারাকাহ আছে।[৩] সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত যতটা দেরি করে খাওয়া যায়।[৪]

» ইফতার যত দ্রুত সম্ভব, তত সাওয়াব, তত কল্যাণ।[৫]

» সিয়ামের রাতে স্ত্রী সহবাস অনুমোদিত।[৬]

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৯৫

[২] *সহিহ বুখারি* : ৬৭১, ৬৭২, ৬৭৩, ৫৪৬৩, ৫৪৬৫; *সহিহ মুসলিম* : ৫৫৭, ৫৫৯, ৫৬০; *সুনানু আবি দাউদ* : ৮৯; *জামি তিরমিযি* : ৩৫৩; *সুনানু নাসায়ি* : ৮৫৩; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৯৩৩

[৩] *সহিহ বুখারি* : ১৯২৩; *সহিহ মুসলিম* : ১০৯৫; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৩৪৪, ২৩৪৫; *জামি তিরমিযি* : ৭০৮; *সুনানু নাসায়ি* : ২১৪৪, ২১৪৬, ২১৪৭, ২১৪৮, ২১৪৯, ২১৫০, ২১৫১; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৬৯২; *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৮৯৮, ১০১৮৫, ১১২৮১, ১১৯৫০, ১৩২৪৫, ১৩৩৯০, ১৩৫৫১, ১৩৭০৪, ১৩৯৯৩

[৪] *সহিহ বুখারি* : ১৯২১; *সহিহ মুসলিম* : ১০৯৭; *জামি তিরমিযি* : ৭০৩; *সুনানু নাসায়ি* : ২১৫৫, ২১৫৬; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৬৯৪; *সহিহু ইবনি খুজাইমা* : ১৯৪১; *সুনানুদ দারিমি* : ১৭৩৭

[৫] *সহিহ বুখারি* : ১৯৫৭; *সহিহ মুসলিম* : ১০৯৮; *জামি তিরমিযি* : ৬৯৯; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৬৯৮; *মুসনাদু আহমাদ* : ২২৮০৪, ২২৮২৮, ২২৮৪৬, ২২৮৫৯, ২২৮৭০

[৬] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭

- খ্রিস্টবাদে পাদরিদের বিয়ে যেখানে নিষেধ, তার বিপরীতে ইসলামে বিয়েই পূরণ করে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের অর্ধেক। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا تَزَوَّجَ العَبدُ فَقَد استَكمَلَ نِصفَ الدِّين فَلْيَتَّقِ اللهَ في النِّصف البَاقِي

বান্দা যখন বিয়ে করে, তখন তার অর্ধেক দ্বীন (ঈমান) পূর্ণ করে হয়ে যায়। অতএব বাকি অর্ধেকাংশে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে চলে।[১]

তিনজন সাহাবি একবার আম্মাজানদের কাছে এসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৈনন্দিন আমল সম্পর্কে জানতে চান। জানার পর তারা নবিজির আমলকে কম মনে করলেন, তিনি তো নবি, তার জন্য ওটুকুই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের বাঁচতে হলে ওটুকুতে চলবে?

একজন শপথ করে ফেললেন, আমি লাগাতার সিয়াম রাখব, কখনো সিয়াম ভাঙব না। আরেকজন বললেন, আমি রোজ সারারাত ইবাদত করব, একদম ঘুমাব না। আরেক জন প্রতিজ্ঞা করলেন, আমি কোনোদিন নারীর কাছে যাব না, কোনোদিন বিয়ে করব না।

ঘটনাচক্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে কথাগুলো পৌঁছে গেল। তিনি তাদেরকে ডাকালেন।

– তোমরা কি এমন এমন বলেছ?

– জি, ইয়া রাসুলাল্লাহ।

– তাহলে শুনে রাখো। তোমাদের মধ্যে আমিই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি। সেই **আমি (কিছুদিন) সিয়াম রাখি, আবার (কিছুদিন) রাখিও না। রাতের কিছু অংশে (নফল ও তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করি, আবার কিছু অংশে ঘুমাই। নারীদেরকে আমি বিয়েশাদিও করি। কান খুলে শোনো, এগুলো আমার সুন্নাহ। যে আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমাদের কেউ না।**[২]

---

[১] *শুআবুল ঈমান*, বাইহাকি : ৫১০০, *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৭৬৪৭, ৮৭৯৪; *মুজামুশ শুয়ুখ*, ইবনু জুমা'ই আস-সাইদাবি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২২২; *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৯

[২] *সহিহ বুখারি* : ৫০৬৩; *সহিহ মুসলিম* : ১৪০১; *সুনানু নাসায়ি* : ৩২১৭; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৩৫৩৪, ১৪০৪৫; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৩১৭

অর্থাৎ আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি। সেই আমিই শরীরের চাহিদাকে অস্বীকার করি না। ইবাদতও করি, আবার শরীরকেও কষ্ট দিই না।

- 'প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত বিষয় বিদআত, প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই (মানুষকে) জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।[১] নিজ থেকে নতুন কোনো পদ্ধতি তৈরি করে তাতে নাজাত তালাশ করা যাবে না। অতিরিক্ত কিছু করে আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। নিজেকে অহেতুক কষ্ট দিয়ে, শরীরকে অহেতুক বঞ্চিত করে নাজাত তো মিলবেই না, উলটো জাহান্নাম মিলবে।

ইসলামে প্রতিটি পার্থিব কাজই আধ্যাত্মিকতার সোপান। প্রতিটি দুনিয়াবি কাজও ধর্মীয় কাজ, আখিরাতের কাজ। খ্রিষ্টবাদের মতো 'ধর্মীয় কাজ আর পার্থিব কাজের মধ্যে পার্থক্য' ইসলাম স্বীকার করে না। **একান্ত ব্যক্তিগত অভ্যাস, টয়লেট সারা, স্ত্রীসংসর্গ থেকে নিয়ে চুল কাটা, পোশাক-পরিচ্ছদ, সন্তান-লালন, ব্যবসা, আইন-বিচার, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সরকার-গঠন, যুদ্ধ—প্রতিটি কাজ, যা একজন মানুষকে করতে হয়, সবই ধর্মীয় কাজ, দ্বীনের কাজ। এসব কাজ যদি কেউ আল্লাহ ও রাসুলের দেখানো নীতিমালা মেনে করে, আল্লাহকে খুশি করার জন্য করে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণে করে, তাহলে খাওয়াটাও ইবাদত হয়ে যায়, পোশাকটাও হয়ে যায় ইবাদত। এসবের জন্যও সাওয়াব হতে থাকে, আল্লাহর নৈকট্য পেতে থাকে এবং মৃত্যুর পর এগুলোর বিনিময়ে মহাপুরস্কারের আশা করতে পারে।**

খ্রিষ্টীয় পোপতন্ত্র vs ইসলামি খিলাফত

অনেকে খ্রিষ্টীয় পোপতন্ত্র ও ইসলামি শাসনকে Theocracy শিরোনামের অধীনে একই রকম মনে করেন। এই মৌলিক পার্থক্যগুলো না বুঝলে ইতিহাস পড়ার কোনো মানে নেই।

দুনিয়া-রাজ্য ও ধর্মরাজ্য পৃথক জিনিস। একসাথে মেলানো যাবে না—যীশুর ভাষায়: 'Render unto GOD that is GOD's. And render unto Caeser that is Caeser's.[২] পরবর্তী সময়ে স্কলাস্টিক খ্রিষ্টবাদীদের মতেও City of God আর

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৮৬৭; *সুনানু নাসায়ি* : ১৫৭৮; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪৫; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪৩৩৪; ১৪৯৮৪; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ১৭৮৫

[২] Mark 12 :17

City of Man আলাদা। ধর্মরাজ্য শাসনের জন্য পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের মতো প্যারালাল আরেকটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা এই চার্চ বা যাজকতন্ত্র। পোপ এখানে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তিনি দেশে দেশে নিয়োগ দেন আর্চবিশপ। আর্চবিশপেরা নিয়োগ দেন স্থানীয় গির্জাপ্রধান ও মঠাধ্যক্ষদের। এরা ধর্মভীরু সাধারণ মানুষের ওপর সীমাহীন প্রভাব রাখত। সমান্তরাল ব্যবস্থার দরুন এদেরকে সন্তুষ্ট রাখা জরুরি ছিল রাজা-জমিদারদের জন্য। বিপরীতে এরাও রাজাকে 'ঐশ্বরিক প্রতিনিধি' হিসেবে মেনে নিতে জনগণকে উৎসাহিত করত। এভাবে এক মিথোজীবী প্রশাসনিক ব্যবস্থা তৈরি করেছিল পোপতন্ত্র।

বিপরীতে ইসলামি খিলাফত ব্যবস্থা কোনো প্যারালাল ব্যবস্থা নয়। **ইসলামে দুনিয়ারাজ্য ও ধর্মরাজ্য একই জিনিস। দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র বা পরীক্ষাগার। পার্থিব প্রতিটি বিষয়ই ধর্মের আলোচ্য বিষয়। কেবল বিশ্বাস ও প্রথা-অনুষ্ঠান নয়, পরিবার-রাষ্ট্র-সমাজ-বাজার-যুদ্ধ-বিচার সবকিছুই ধর্ম। সুতরাং, এখানে খলিফা একইসাথে ধর্মীয় প্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধান।** খলিফার বৈধ সিদ্ধান্ত অনুসরণ জনগণের ধর্মীয় দায়িত্ব। তবে খলিফার এই সিদ্ধান্ত একচ্ছত্র ও স্বেচ্ছাচারী নয়। খলিফার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয়—

১. কুরআন-সুন্নাহ তথা শারিয়া দ্বারা (শারিয়াবিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত মানতে জনগণ বাধ্য নয়)

২. পরামর্শ পরিষদ দ্বারা (আহলে শুরা)

৩. আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ দ্বারা (খলিফা নির্বাচক যারা)

৪. খলিফার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ ও হিসেব চাওয়ার অধিকার প্রতিটি মুসলিমের

উদাহরণ—

» খলিফা উমারকে গণজমায়েতের মধ্যে দলিল দিয়ে চ্যালেঞ্জ করে মত পরিবর্তনে বাধ্য করলেন খাওলা বিনতু সালাবা রাযিয়াল্লাহু আনহা। [১]

» উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর নতুন পোশাক নিয়ে হিসাব চাইলেন এক বেদুইন।

---

[১] *আল-ইস্তিয়াব*, ইবনু আব্দিল বার রাহিমাহুল্লাহ সূত্রে প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৮৯; *সাখিরাতুল উকবা শারহু সুনানিন নাসায়ি*, খণ্ড : ২৯; পৃষ্ঠা : ৬৭-৬৮

» উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু জানতে চাইলেন, 'যদি আমি কুরআন-হাদিসের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিই, তোমরা কী করবে?' একজন জবাব দিলেন, 'বাঁকা তির যেভাবে সোজা করে, সেভাবে আপনাকে সোজা করে দেবো।'

পরে খিলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের উদ্ভব হলো, তখনো 'শাইখুল ইসলাম'-এর মতামত ও অনুমোদনকে খলিফাগণ জরুরি মনে করতেন। আর বিচারিক কার্যাবলি পুরোটাই দেখভাল করতেন প্রধান কাজি, যিনি হতেন সামসময়িক শ্রেষ্ঠ ফকিহদের একজন, যে বিচারের আওতার বাইরে স্বয়ং খলিফাও ছিলেন না।

মিথোজীবিতা যে একদমই ছিল না, তা বলা সমীচীন নয়; তবে এমন প্রাতিষ্ঠানিক **মিথোজীবিতা (চার্চ-রাষ্ট্র) ছিল না, যেহেতু চার্চের মতো পৃথক কোনো প্রতিষ্ঠানই ছিল না। আলিম-সমাজ কোনো প্যারালাল ব্যবস্থা ছিল না। সুলতানদের শারিয়া-বিরোধী কার্যক্রমের প্রতিবাদ করাকে আলিমগণ ঈমানি দায়িত্ব মনে করতেন ও সুস্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ করতেন। এর প্রমাণ হলো : ইসলামি সভ্যতায় আলিমদের ব্যাপক কারাবরণ। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম ইবনু তাইমিয়া, ইমাম মালিক, ইবনুল কাইয়িম, ইবনু কাসির, ইবনু হাজার আসকালানি, ইবনু হাযম, ইবনুল আসির-সহ অধিকাংশ বড় বড় আলিমকে শাসকের শারিয়াহ-বিরোধী কাজের বিরোধিতা করার জন্য কারাবরণ করতে হয়েছে। এছাড়া নিহত ও দেশান্তরিত আলিমদের সংখ্যাও প্রচুর।**

সুতরাং, পোপতন্ত্র ও ইসলামি শাসনকে এক করে ফেলা নিতান্তই শিশুসুলভ ইতিহাস পাঠ। পোপতন্ত্রের স্বতন্ত্র আরো দুটি দিক হলো : বাইবেল থেকে সাধারণকে দূরে রাখা। মার্টিন লুথার জার্মানে অনুবাদ করার আগে শুধু ল্যাটিনেই বাইবেল পাঠ করা হতো, যাতে আম-পাবলিকের প্রবেশাধিকার ছিল না। আর দ্বিতীয়ত, নিজস্ব কিংবা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ হাসিলের অনুকূল ব্যাখ্যা দেওয়া, ধর্মের নামে। পোপতন্ত্র ও আলিম-সমাজ, দুটো যে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী, তার প্রমাণ হলো ইসলামি শাসনের অধীনে ইসলামি সভ্যতার অবস্থা পোপতন্ত্রের অধীনে ইউরোপের অবস্থার ১৮০ ডিগ্রি বিপরীত।

ইউরোপ এনলাইটেনমেন্টে এসে যে লাগামছাড়া উন্নত আইডিয়াগুলোর কথা বলছে; ইসলাম সেই ৭ম শতকে বসে তার চেয়ে বহুগুণে উন্নত আইডিয়ার কথা বলছে।

এনলাইটেনমেন্ট	ইসলাম
সমতা	সুষমতা
ব্যক্তিস্বাধীনতা	সামষ্টিক স্বার্থ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যালেন্স
যুক্তির প্রভুত্ব	মানবযুক্তির সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে যুক্তিপ্রয়োগ
মানবজ্ঞানভিত্তিক লাগামহীন প্রগতি	নৈতিকতা-নিয়ন্ত্রিত প্রগতি
সাংবিধানিক অধিকাংশের সরকার	আইনের অধীনস্থ যোগ্যতাভিত্তিক সরকার
সমতাভিত্তিক সমাজ	ইনসাফভিত্তিক সমাজ
সংশয় থেকে শুরু	যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্বাস থেকে শুরু
সর্বোচ্চ ও সর্বাধিকের উপভোগ	সংযমী ভোগ
ব্যবসার বিধিনিষেধ বিলোপ	ব্যবসার অনুমোদন ও ধরন নিয়ন্ত্রণ

এনলাইটেনমেন্টের চিন্তাধারার মূল সমস্যাগুলোর সমাধান ইসলামে রয়েছে, যা নিছক তাত্ত্বিক নয়, বরং বাস্তবায়নযোগ্য। কারণ ইসলাম স্রেফ কিছু দার্শনিকের চিন্তার সমষ্টি নয়, ইসলাম সুশৃঙ্খল এই মহাবিশ্বের স্রষ্টার পাঠানো সুশৃঙ্খল জীবন-ব্যবস্থাপনার প্রেসক্রিপশন। ওষুধ খেলে সুস্থ থাকবে মানবজাতি, ওষুধ না খেলে রোগ বাড়বে।

ইউরোপের সাথে মুসলিম বিশ্বের অভিজ্ঞতার এই পার্থক্যটা মুসলিমদের বুঝতে হবে। **ইউরোপ শিকল খুলে ফেলেছে আর আমরা খুলে ফেলেছি সোনার হার। রাষ্ট্র থেকে চার্চকে সরিয়ে ইউরোপ মাথা থেকে বোঝা নামিয়েছে আর সেই অনুকরণ করে আমরা মাথা থেকে নামিয়েছি মুকুট।** ইউরোপের এনলাইটেনমেন্ট ইউরোপের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ফল, আমাদের অভিজ্ঞতা এমন নয়। **তাহলে কেন ইউরোপের ফর্মুলা, তাদের লাগামছাড়া 'উন্নত' মূল্যবোধ, লাগামছাড়া প্রগতির সংজ্ঞা, ভালোমন্দের মাপকাঠি আমাকে মেনে নিতে হবে? কোন যুক্তিতে ইউরোপ তার একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা মেনে নিতে আমাদেরকে বাধ্য করছে? কেন ইউরোপীয় ধাঁচের রাষ্ট্রই আমাদের হতে হবে, কেন ইউরোপীয় ধাঁচের গণতন্ত্রই আমাদের লাগবে, কেন ইউরোপীয় বিজ্ঞান-দর্শন মেনে নিয়ে আমাকে বিজ্ঞান করতে হবে, কেন ইউরোপীয় স্কেলেই আমার উন্নতি মাপতে হবে, কেন ইউরোপের নারীদের মতোই স্বাধীন হতে হবে আমাদের নারীদের? কেন ইউরোপীয় স্টাইলের সমাজ-পরিবার-ব্যক্তিই**

হতে হবে আমাদের? কেন আমরা আমাদের মতো হতে পারব না?

দেখো না ইউরোপ কত উন্নত! ওদের মতন উন্নত-সভ্য হতে হলে আমাদেরকেও ওদের পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে। তাই নাকি? ওরা কি এসব সমতা-স্বাধীনতা-ভ্রাতৃত্ব করেই উন্নত হয়েছে? আসলেই?

চাপিয়ে দেওয়া আলো

আবিষ্কারের দুয়ার খুলে দেয় যুদ্ধ। উন্নত মারণাস্ত্র, উন্নত সুরক্ষা প্রকৌশল, দ্রুততম বাহন-কামান, নৌযুদ্ধ, নৌপ্রকৌশল এসব আবিষ্কার হয় যুদ্ধের মওকায়। শান্তিপ্রিয় এলাকা এসব আবিষ্কার করতে পারে না। ইউরোপের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (১৩৩৭-১৪৫৩) নিজেদের মাঝে হানাহানির সুযোগে ইউরোপ সামরিকভাবে উন্নত হয়ে ওঠে। ১৪৯২ সালে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করে। যদিও আধুনিক ইতিহাসবিদগণ জানাচ্ছেন, কলম্বাসের আগেও আমেরিকা মহাদেশে ভাইকিং জলদস্যু, আরব বণিকদের যাতায়াত ছিল। এসবের বহু প্রমাণ আমেরিকায় গিয়ে কলম্বাস নিজেই পেয়েছেন ও বর্ণনা করেছেন। আসলে 'আবিষ্কার' শব্দটার অর্থই বদলে দিয়েছে ইউরোপ। রবার্ট ব্রিফল্টের মেজাজই খারাপ—

"

কে experimental method-এর আবিষ্কর্তা, সেটা অন্যান্য আরব আবিষ্কারের মতোই— **১ম ইউরোপীয় যে সেটার উল্লেখ করবে সে-ই সেটার আবিষ্কারক**। *ঠিক যেমন কম্পাস Flavio Gioja-এর নামে, অ্যালকোহল Arnold of Villeneuve-এর নামে, লেন্স ও বারুদ Schwartz কিংবা Bacon-এর নামে। এসবই ইউরোপীয় সভ্যতার উৎসের ব্যাপারে বিরাট বিরাট ভুলবার্তার অংশ।*

তো একইভাবে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন কে? ১৪৯৮ সালে জলদস্যু ভাস্কো-দা-গামা। অবাক হয়ে ইউরোপ দেখল, নিজেদের মাঝে মারামারি

করে শক্তিক্ষয় আর কত? ইউরোপের বাইরে বিশাল এক অপ্রস্তুত দুনিয়া পড়ে আছে। ব্যবসায়ীরা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি গড়ে বেরিয়ে পড়ল। পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, ডাচ, ইংরেজ। **এসব কোম্পানির সাথে আছে নিজস্ব সেনাবাহিনী। প্রথমে ব্যবসার অনুমতি, এরপর ব্যবসার নিরাপত্তার কথা বলে সেনাবাহিনী ঢুকানো, ক্যান্টনমেন্ট-দুর্গ নির্মাণ, এরপর নেটিভদের পরাজিত করে উপনিবেশি শাসন প্রতিষ্ঠা... এই ফর্মুলায় সারা দুনিয়ায় উপনিবেশ গাড়ল ইউরোপ।**

ডাকাতির গল্প

ছোটবেলায় আব্বু একটা বই কিনে দিয়েছিলেন—*সব সেরা ডাকাতের গল্প।* অস্থির লাগত পড়তে। বিশে ডাকাত, রঘু ডাকাত, রমা ডাকাতের গল্প। এখন আপনাদের যে ডাকাতের গল্প বলব, তার সাথে এদের কোনো তুলনা চলে না। **ধনসম্পদ ডাকাতি তো করেছেই, মন-দিল-আক্কেল-বুদ্ধি সব ডাকাতি করে ইউরোপে নিয়ে গেছে। আবার দয়া করে ডাকাতি করেছে বলে সর্বস্বান্ত ঘরের মালিক-ছেলেপুলে সবাই সেই ডাকাতের প্রতি কৃতজ্ঞ। এমন দুর্দান্ত সে ডাকাত!**

আমেরিকায় উপনিবেশে ইংল্যান্ড পেরে উঠছিল না অন্যদের সাথে, সপ্তদশ শতকের শুরুতে ইংল্যান্ডের পকেটের হালত সুবিধার ছিল না। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক James Mill বলছেন—

> *ইংরেজদের দেশ সরকারের ব্যর্থতা আর গৃহযুদ্ধে জর্জরিত ছিল। এতটাই যে, বাণিজ্য প্রসার ও সুরক্ষার জন্য পুঁজিই ছিল না তাদের। ওলন্দাজদের সাথে চলত এক অসম প্রতিযোগিতা।*[১]

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর সেই ইংল্যান্ডেরই 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' অবস্থা। ১৭৫৭-তে বাংলা জয়, ১৭৬৫ সালে বাংলার দিওয়ানি (ট্যাক্স কালেকশনের ক্ষমতা) লাভ... ঠিক ১৭৬০-এর দশকেই ইংল্যান্ডে শুরু হয়ে গেল শিল্পবিপ্লব? আরিব্বাসরে! কীভাবে হলো শুনুন William Digby নামের এক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক-কাম-রাজনীতিবিদের ভাষায়—

---

[১] James Mill এর বরাতে *Unhappy India*, Lala Lajpat Rai, 1928 : page : 322

পর্তুগীজ উপনিবেশ

স্পেনীয় উপনিবেশ

ফরাসী উপনিবেশ

ব্রিটিশ উপনিবেশ

পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার সম্পদ স্রোতের মতো এসে জমা হতে থাকে লন্ডনে। ১৭৬০ সালের আগে যেখানে শিল্পকারখানার নাম-গন্ধও ছিল না, সেখানে হাজার হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। [১]

কী পরিমাণ সম্পদ গেছে ইংল্যান্ডে? সেটা শুনবেন P. Spear সাহেবের The Indian Nabobs-বই থেকে—

বাবদ	হিসাবটা টাকায় নয়, পাউন্ডে
মুর্শিদাবাদের কোষাগার লুট	১৫ লক্ষ
যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে	৪ লক্ষ
কোম্পানির সিলেক্ট কমিটি	৯ লক্ষ
কোম্পানির কাউন্সিল মেম্বাররা প্রত্যেকে	৫০-৮০ হাজার করে
ক্লাইভ নিজে	২ লক্ষ ৩৪ হাজার। সাথে বছরে ৩০ হাজার করে পাবে।
জামাই মির কাশিম দিলো	২ লক্ষ
নজম-উদ্দৌলা দিলো	১ লক্ষ ৪৯ হাজার
সাধারণ ব্রিটিশ সেনাদের লুটপাট	বেহিসেব

লর্ড ক্লাইভ নিজেই স্বীকার করেছেন : এমন অরাজকতা-বিশৃঙ্খলা-ঘুষ-দুর্নীতি-লুটপাটের পাশবিক চিত্র বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোথায় পাওয়া যায়নি। (Malcom, Life of Clive) লর্ড মেকলে লিখেছেন[২]—

“

ইংল্যান্ডে সম্পদ আসত সমুদ্রপথে। ওয়াট ও অন্যদের আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ইংল্যান্ডের যেটুকু কমতি ছিল, ইন্ডিয়া সেটুকু সরবরাহ করেছে। ইংল্যান্ডের পুঁজি বহুগুণে বাড়িয়েছে ভারতীয় সম্পদের প্রবেশ।...**শিল্পবিপ্লব, যার ওপর ভিত্তি করে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সম্ভব হয়েছিল কেবল ইন্ডিয়ার সম্পদের কারণে। যা কোনো লোন ছিল না, এমনিতেই নিয়ে নেয়া হয়েছিল (লুট)**। তা নাহলে স্টিম ইঞ্জিন ও যন্ত্রশিল্প পড়েই থাকত

[১] *Prosperous' British India*, Sir William Digby, 1901

[২] *Unhappy India*, Lala Lajpat Rai, 1928

ইংল্যান্ডের। ইংল্যান্ডের উন্নতি মানে ভারতের লোকসান—এমনই লোকসান, যা ভারতে শিল্পকে ফাঁকা করে দিয়েছিল, কৃষিকে স্থবির করে দিয়েছিল। যেকোনো দেশ যদি এইভাবে পাচার করা হয়, সে ধনী-সম্পদশালী হলেও নিঃস্ব হয়ে যাবে।'

ব্রিটেনের সকল যুদ্ধব্যয় (১৯১৩ সাল অব্দি ৩০০ মিলিয়ন পাউন্ড), সকল বিজ্ঞানের ফান্ডিং, সকল প্রযুক্তির বাণিজ্যিকরণের পুঁজি সরবরাহ করেছে ভারত। ভারতকে নিংড়ে ব্রিটেন আজ বিজ্ঞান-দর্পী, ঝকঝকে তকতকে, উন্নত। Sir William Digby লিখেছেন : **১৯০০ পর্যন্ত** ভারত থেকে আইনগতভাবেই (আইন বানিয়ে) আমরা নিয়েছি **৬,০৮০ মিলিয়ন পাউন্ড** (৬০৮০,০০০,০০০ পাউন্ড)[১] Mr. A.J.Wilson মার্চ ১৮৮৪-এর Fortnightly Review ম্যাগাজিনে লেখেন : ভারতীয়দের বছরে মাথাপিছু আয়ই সর্বোচ্চ ৫ পাউন্ড। সেখানে **প্রতিবছর** আমরা কোনো না কোনোভাবে **৩ কোটি পাউন্ড** নিয়ে যাচ্ছি।

আগের ৭০০ বছরে যে ভারতে মাত্র ১৭ বার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, সেই ভারতে ১৭৭০-১৮৫০-এর মাঝে ৮০ বছরের ভেতরে অলরেডি ১২ বার দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে, না খেয়ে মারা গেছে ৬০ লাখ মানুষ [২]। সম্রাট আওরঙ্গজেব রাহিমাহুল্লাহর সময়ে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে চীনকে পেছনে ফেলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনীতিতে (World's Largest Economy) পরিণত হয়, যার মূল্যমান ছিল প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলার। এর জিডিপি ছিল সে সময়ের সমগ্র বিশ্বের ৪ ভাগের ১ ভাগ। [৩] সেই দেশটা ঠিক কী প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে গেলে ১৭৬৯-১৮০০ এর মাঝে ৭ দফা দুর্ভিক্ষের শিক্ষার হতে পারে? **ঠিক কী প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে গেলে দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশে ১৮০১-১৯০০ পর্যন্ত ১০০ বছরে ৩১ টা মন্বন্তরে (মহাদুর্ভিক্ষ) মরে যায় ৪ কোটি ১০ লাখ মানুষ—'না খেয়ে'**[৪] সেটা আশা করি বলে বোঝাতে হবে না। **আজকের উন্নত ইউরোপ-আমেরিকা এনলাইটেনমেন্টের উন্নততর মানবিকতার ফসল নয়, সাম্য-স্বাধীনতা-ভ্রাতৃত্বের ফসল নয়; আজকের সাদা-সভ্যতা, তাদের বিজ্ঞান, তাদের উন্নতি উপনিবেশগুলোতে কোটি কোটি নেটিভের জীবনের ফসল, চূড়ান্ত পাশবিকতার ফসল।**

---

[১] *'Prosperous' British India*, Sir William Digby, 1901

[২] প্রাগুক্ত

[৩] *The World Economy*, Angus Maddison, OECD Publishing (2003), page : 261

[৪] *'Prosperous' British India*, Sir William Digby, 1901

ব্যবসা

সময়টা ১৮১৩। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'কোম্পানি চার্টার' নবায়নের সময় জিজ্ঞাসা করা হলো মাদ্রাজের গভর্নর কর্নেল Thomas Munro-কে,

– আচ্ছা, যদি ইন্ডিয়ার বাজার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় (free trade), তাহলে কি সম্ভাবনা আছে, যে, নেটিভরা (স্থানীয়রা) ব্রিটিশ পণ্য কিনবে?

– আমার মনে হয় না, এতে কাজ হবে। অর্থাৎ ব্রিটিশ-উৎপাদিত পণ্য দিয়ে ভারতের বাজার ভরে ফেললেও এতে ব্রিটিশ পণ্যের চাহিদা বাড়ানো যাবে না।

কেন যাবে না? কী কারণ দেখিয়েছেন কর্নেল মুনরো? তিনি বলেন—

"

*আমাদের সবচেয়ে পুরোনো যে উপনিবেশ, সেখানেও **নেটিভরা আমাদের জীবনযাত্রা গ্রহণ করেনি। আমাদের পণ্য সেখানে নামেমাত্র বিক্রি হয়।** আর ইউরোপীয় গৃহস্থালি পণ্য তো মোটেও বিক্রি হয় না। এমনকি বাপে যদি ইউরো-স্টাইলের কিছু কেনেও, পরের প্রজন্মে ছেলে এসে সেটা ঘর থেকে বের করে দেয়। আমার মনে হয়, এজন্য উচ্চমূল্য দায়ী নয়, অন্য কোনো কারণ আছে ইউরোপীয় পণ্য গ্রহণযোগ্যতা না পাবার, যা আরো স্থায়ী কারণ। আমার খেয়ালে, **কারণগুলো আবহাওয়াগত, ধর্মীয় এবং আদব-কায়দা-সম্পর্কিত** এবং তাদের দেশি পণ্যের উচ্চমান। যেমন ধরুন, একজন হিন্দু মেঝেতে বসে খায় মাটির থালায়, মাদুর-পাটি ছাড়া তার ঘরে কোনো ফার্নিচার নেই। এজন্য আমাদের খাবার টেবিল, সোফা জাতীয় পণ্য তাদের প্রয়োজনও নেই।* [১]

অর্থাৎ **ভারতীয়দের রুচি আলাদা, ইউরোপীয় রুচির পণ্য বিক্রি হচ্ছে না বেনিয়াদের। বিক্রি করতে হলে রুচি বদলে ইউরোপীয় রুচি করে দিতে হবে।** তাহলে তারা ব্রিটিশ পণ্য কিনবে। এটা ছিল ১৮১৩ সালের চিত্র। স্যার উইলিয়াম ডিগবি তার বইয়ে ১৮৯৮-৯৯ সালের চিত্রে দেখাচ্ছেন ২০ লক্ষ ইউরোপীয়-ওয়াশড ইন্ডিয়ান (Europeanized Indian)-এর জন্য বিলাতি পোশাক, খাবার, আসবাবপত্র আমদানি হয়েছে এদেশে। তার মানে এই ৮০-৯০ বছরে ভারতীয়দের রুচির বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তুলনা করুন লর্ড মেকলের বিখ্যাত উক্তিটা—

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪৫

(১৮৩৫-এর শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা এমন প্রজন্ম তৈরি হবে) এরা হবে এমন একটা শ্রেণি, যারা রক্তে-গায়ের রঙে তো ভারতীয়, কিন্তু রুচি-মতামত-নীতি-বিচারবুদ্ধিতে হবে ইংরেজ। (মনোরাজ্যে উপনিবেশ)

শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ৬০ বছরে এক প্রজন্মের ব্যবধানে ২০ লক্ষ ক্রেতা তৈরি করে ফেলা হলো রুচির পরিবর্তন ঘটিয়ে। ভারতবর্ষ হয়ে গেল ব্রিটেনের প্রধান বাজার।

শিক্ষা

উপনিবেশ আমল শুরু হওয়ার আগে উসমানি-অধীন এলাকা (পূর্ব ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা), পশ্চিম আফ্রিকা (মালি, ঘানা, সেনেগাল, মৌরিতানিয়া) এবং উপমহাদেশে (পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান) একটা শক্তিশালী শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। উইলিয়াম হান্টার তার *ইন্ডিয়ান মুসলমানস* গ্রন্থে লেখেন—

"

এ দেশটা আমাদের হুকুমতে আসার আগে মুসলিমরা শুধু শাসনের ব্যাপারেই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও ছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি। *ভারতের যে প্রসিদ্ধ (ইংরেজ) রাষ্ট্রনেতা তাদের ভালোভাবে জানেন, তার কথায় : ভারতীয় মুসলিমদের এমন একটা শিক্ষাপ্রণালি ছিল, যেটা আমাদের আমদানি করা (ব্রিটিশ) প্রণালির চেয়ে নিম্ন হলেও (!) কোনো ক্রমেই ঘৃণার যোগ্য ছিল না।* ***তার দ্বারা উচ্চস্তরের জ্ঞান বিকাশ ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিচ্ছন্ন হতো। সেটা পুরোনো ছাঁচের হলেও তার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় ছিল এবং সেকালের অন্য সব প্রণালির চেয়ে নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট ছিল।*** *এই শিক্ষাব্যবস্থায়ই তারা মানসিক ও আর্থিক প্রাধান্য সহজেই অধিকার করেছিল।'*

সেই শিক্ষাটা কেমন ছিল একটু ধারণা করা যেতে পারে। উপনিবেশ শুরুর ঠিক আগের শতকে আওরঙ্গজেবের মেয়ে শাহজাদি যাইবুন্নিসার সিলেবাস ছিল আরবি গ্রামার, গণিত, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন এবং অন্যান্য বিজ্ঞান সহযোগে। এটা ছিল ঘরোয়া একটা অনানুষ্ঠানিক কারিকুলাম। এ থেকে আনুষ্ঠানিক কারিকুলামের একটা ধারণা নিতে পারি আমরা। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে **বাংলায় ৮০ হাজার** মক্তব ও মাদরাসা ছিল, যেখানে উইলিয়াম হান্টারের বিবরণ অনুযায়ী 'ব্রিটিশ কারিকুলামের মতো না হলেও ঘৃণার যোগ্য ছিল না', বরং **'উচ্চস্তরের জ্ঞান বিকাশ ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিচ্ছন্ন'**

হবার জন্য এবং **'মানসিক ও আর্থিক প্রাধান্য'** অর্জনের উপযোগী ৮০ হাজার **শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল আমাদের ৩ থেকে ৪ কোটি মানুষের জন্য শুধু 'বাংলায়'।**

ফ্রান্সের নিষ্পেষণে নিঃস্ব আফ্রিকার সোনার দেশ, 'মানসা মুসা'র দেশ মালি। উপনিবেশ হবার আগে টিম্বাকতু শহরে ৩টা ভার্সিটি, ১৬শ শতকে। শহরে ১ লাখ অধিবাসীর মধ্যে ২৫ হাজারই ছিল ভার্সিটি স্টুডেন্ট। কুরআন-হাদিস-ফিকহ-সাহিত্য ছিল প্রধান বিষয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে থাকত—মেডিসিন-সার্জারি, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, ফিজিক্স, রসায়ন, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস, চিত্রকলা। ভার্সিটির সামনে বহু ট্রেড-শপ থাকত, ছাত্ররা এখানে হাতেকলমে ব্যবসা শিখত। এখানে কাঠের কাজ, কৃষি, মাছ ধরা, চামড়া শিল্প, সূচিকর্ম, নৌবিদ্যা শিখত।

'এনলাইটেনমেন্ট'-এর যুগে ইউরোপ যখন 'খ্রিস্টধর্ম-সামন্তসমাজ' (রাজতন্ত্র+পোপতন্ত্র) থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদ' (গণতন্ত্র+পুঁজিপতি) সেট-আপে আসছে। নতুন করে সবকিছুর সংজ্ঞা ঠিক করা হচ্ছে। **ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্র-ধর্ম-উদ্দেশ্য-সত্য-নৈতিকতা—সবকিছুর নতুন নতুন ধারণা দিচ্ছেন ইউরোপীয় দার্শনিকরা। পুরোপুরি ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার আলোকে। সুতরাং, 'শিক্ষা'র সংজ্ঞাও বদলে গেল।** Encyclopedia Britannica বলছে—

> **The new social and economic changes** (এনলাইটেনমেন্ট) also called upon the schools (public and private) to broaden their aims and curricula. Schools were expected not only to promote literacy, mental discipline, and good moral character (শিক্ষার আগের উদ্দেশ্য) but also to help prepare children for citizenship, for jobs, and for individual development and success. (পরের উদ্দেশ্য)

আগে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল—লিখতে-পড়তে পারা (promote literacy), শৃঙ্খলা শেখানো (mental discipline) আর নৈতিক চরিত্র গঠন (good moral character)। আর এখন তার সাথে যোগ হলো—

১. নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য যোগ্য নাগরিক তৈরি (citizenship)

২. নতুন অর্থ-ব্যবস্থার (পুঁজিবাদী) জন্য কর্মী তৈরি, যারা চাকুরিতে আসবে (jobs)

৩. নতুন সংজ্ঞার 'ব্যক্তি' তৈরি (individual development), যারা 'সফলতা'র নতুন সংজ্ঞার (material success) জন্য প্রস্তুত হবে।

তাহলে 'নারীশিক্ষা' মানে কী দাঁড়াচ্ছে?

১. মেয়েদেরকে তাদের দেওয়া রাষ্ট্র-কাঠামোর যোগ্য নাগরিক বানানো

২. পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থার কর্মী বানানো

৩. 'ব্যক্তি' হিসেবে মেয়েদের তৈরি করা, যারা ধর্মকে ঝেড়ে ফেলে নিজের নৈতিকতার মাপকাঠি ঠিক করতে পারে। নিজেকে পশ্চিমাদের সংজ্ঞায় 'সফল' হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। খ্যাতি-অর্থ-পদ-আধুনিকতার দাসে পরিণত হতে পারে।

'শিক্ষা' মানে 'নারীশিক্ষা' মানে যদি হয় 'এই', তাহলে ইউরোপের বাকি সব সংজ্ঞার মতো, ওই 'শিক্ষা' 'নারীশিক্ষা'র সাথেও ইসলাম একমত নয়। এই যে এদেশের বড় বড় আলিমগণ যে এই সেক্যুলার 'শিক্ষা' 'নারীশিক্ষা'র বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং শুরু থেকেই বলে এসেছেন—এই কারণে বলেন। **আমরা না বুঝলেও আলিমরা ঠিকই বুঝেছিলেন, ব্রিটিশরা কী করতে যাচ্ছে। বিপদ আঁচ করেই তারা অনেকে 'ইংরেজি শিক্ষার' বিরোধিতা করেছিলেন।**

দেশে দেশে উপনিবেশবাদ জেঁকে বসল। ইংরেজরা সুবে বাংলার খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পেয়ে লক্ষ্য করল যে, ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় ৮০ হাজার মক্তব ও মাদরাসা ছিল। **এই ৮০ হাজার মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকার জন্য বাংলার চার ভাগের এক ভাগ জমি লাখেরাজভাবে বরাদ্দ ছিল। আরে? ৪ ভাগের ১ ভাগ খাজনা হাতছাড়া হবে, তাই কি হয়?** ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমেই এই লাখেরাজ সম্পত্তি বিভিন্ন আইন, বিধিবিধান প্রণয়ন ও জোরজবরদস্তি করে দেশের হিন্দু জমিদারদের কাছে ইজারা দিতে থাকে। এ-সংক্রান্ত তিনটি বিধান হলো—

(১) ১৭৯৩ সালের রেগুলেশন—১৯,
(২) ১৯১৮ সালের রেগুলেশন—২,
(৩) রিজাম্পশান ল' অব ১৮২৮ (লাখেরাজ ভূমি পুনঃগ্রহণ আইন)।

ফলে মাদ্রাসার আয় কমতে থাকে। বহু মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৬৫ সালে বাংলায় মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল আশি হাজার (Max Muller)। ২০০ বছর পর ১৯৬৫ সালে এ সংখ্যা দুই হাজারের নিচে নেমে আসে।

১৮৩০ সালের পর তাদের খেয়াল হলো। কী খেয়াল? এই মূর্খ নেটিভদের শিক্ষিত করা দরকার—এই দয়া? জি না। তাদের খেয়াল হলো, **এই বিশাল দেশ দীর্ঘমেয়াদে শাসন করতে হলে আমাদের কিছু অনুগত সেবাদাস তৈরি করা দরকার, আমাদের পণ্যের বিক্রি বাড়াতে এদের রুচি বদলে দেওয়া দরকার।** যারা আমাদের আর এই বাদামি নেটিভদের মধ্যস্থতা করবে (দালাল), এদেশে রক্ষা করবে আমাদের স্বার্থ (এমনকি আমরা চলে গেলেও)। ১৮৩৪ সালে ভারতে শিক্ষা প্রসারের জন্য (?) কমিটি করা হয়। এর প্রধান ছিলেন লর্ড মেকলে। স্কিমের রিপোর্টে কমিটির উদ্দেশ্য হিসেবে লেখেন (কথাগুলো খেয়াল করুন)—

“

বর্তমানে এমন একটি শ্রেণি তৈরি করার জন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা নেওয়া উচিত, যারা আমাদের ও আমাদের মিলিয়ন মিলিয়ন প্রজাদের মাঝে ভাষ্যকার হিসেবে কাজ করবে। (উদ্দেশ্য শিক্ষার প্রসার নয়)

এরা হবে এমন একটা শ্রেণি, যারা রক্তে-গায়ের রঙে তো ভারতীয়, কিন্তু রুচি-মতামত-নীতি-বিচারবুদ্ধিতে হবে ইংরেজ। (মনোরাজ্যে উপনিবেশ)

এই শ্রেণির কাছে আমরা দায়িত্ব দেবো তাদের দেশের প্রচলিত কথাগুলোকে সংস্কার করার এবং পশ্চিমা পরিভাষা নিয়ে তাদের স্থানীয় ভাষাগুলোকে সমৃদ্ধ করার। (পশ্চিমা দর্শন-সংজ্ঞা-পরিভাষা গ্রহণ ও আত্মীকরণ)

তাদেরকে আমরা বাহন হিসেবে দেবো বিভিন্ন ডিগ্রি, যাতে চড়ে তারা এই জ্ঞান পৌঁছে দেবে বাকি জনগণকে। (ডক্টরেট-নোবেল প্রাইজ-স্যার-রায়বাহাদুর-খানবাহাদুর) [১]

পশ্চিমা শিক্ষা দর্শনের একটাই উদ্দেশ্য ছিল—

পাশ্চাত্য সভ্যতার মহান ধারণাগুলো (এনলাইটেনমেন্ট থেকে পাওয়া) যেন বুঝিয়ে দেওয়া যায় শিক্ষার্থীদের। কারণ এই আইডিয়াগুলো চিরন্তন, ধ্রুব সত্য এবং সর্বযুগের সমাধান। [২]

---

[১] Minute on Indian Education,2nd February, 1935; Thomas Babington Macaulay, point 12.

[২] Perennialism দর্শন। [Philosophical Perspectives in Education,Oregon State University ওয়েবসাইট]

এভাবেই ইউরোপের নিজের অভিজ্ঞতা (আলোকায়নের তরিকা) 'সর্বজনীন পরম সত্য' হিসেবে পুরো দুনিয়ার ওপর চাপানোর এজেন্ডা নেওয়া হলো। যদিও ইসলামি ভূখণ্ডে, চীনের অভিজ্ঞতা ইউরোপ থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। **উপনিবেশের মওকায় এভাবেই তারা সেই শ্রেণিটা তৈরি করে ফেলল, 'যারা চামড়ায় ভারতীয়, মগজে ইউরোপীয়'।**

যেহেতু শিক্ষার সংজ্ঞা হলো 'ইউরোপের বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি শেখা-ধারণ করা ও আত্মীকরণ করে চামড়ায় ভারতীয় মগজে ইউরোপীয় হওয়া'। এই সংজ্ঞায় যারা পড়বে, তারা হচ্ছে 'শিক্ষিত'। আর যারা এই সংজ্ঞায় আসবে না, তারা 'অশিক্ষিত', 'মূর্খ', 'প্রস্তর যুগের লোক', 'পশ্চাৎপদ'। তারা কারা? তারা হচ্ছে, যারা প্যারালাল শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে সেই আগেরটা লালন করে চলে। বিপদ টের পেয়ে ১৮৬৬ সালে আলিমগণ প্রতিষ্ঠা করেন দেওবন্দ মাদরাসা। সমাজের অর্থায়নে টিকে গেল এনলাইটেনমেন্ট-বিরোধী শিক্ষাধারা।

ব্রিটিশরা যখন ক্ষমতা দিয়ে গেল, কাদের কাছে দিয়ে গেল? এই 'চামড়ায় ভারতীয় মগজে ব্রিটিশ'দের হাতেই, যাদের আদর করে ডাকা হয় Children of Macaulay। এরাই আমাদের প্রেসিডেন্ট-মন্ত্রী-আমলা-শিক্ষক-বাবা-দাদা হলেন। তারাই আমাদের কারিকুলাম বানালেন, তারাই পলিসি করলেন, তারাই পরস্পর যুদ্ধ করলেন। বলা হয় দেশভাগ নাকি হয়েছিল 'ধর্মের ভিত্তিতে'... বাংলাদেশের জন্মই নাকি প্রমাণ করে দিলো 'ধর্ম' কোথাও ভিত্তি হতে পারে না, ধর্ম ব্যর্থ। বাজারে খুব চলে এই চেতনাটা। আচ্ছা, সেক্যুলার ব্রিটিশ দেশভাগ করল খাবলা খাবলা করে। দেশ দিয়ে গেল সেক্যুলারদের হাতেই : জিন্নাহ-নেহেরু দুজনই বিলাতের ব্যারিস্টারি পড়াকালীন দোস্ত। যুদ্ধ করল সেক্যুলারে-সেক্যুলারে। বাঙালি মা-বোনদের ধর্ষণ করল পাক সেক্যুলার দেশের সেক্যুলার আর্মি। এই পুরো নাটকে 'ধর্ম' 'ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ' 'আলিমসমাজ'-এর দোষটা কোথায়? **সব রোল প্লে করল 'চামড়ায় ভারতীয় মগজে ইংরেজ'রা। দোষ হচ্ছে ধর্মের।** মজা তো, মজা না?

সেই লর্ড মেকলের শিক্ষায় আমরাও 'শিক্ষিত', আমরা 'Children of Macaulay'। মনেপ্রাণে আমরা ধারণ করি ইউরোপীয় চেতনা। এনলাইটেনমেন্ট থেকে মডার্নিটি হয়ে পাওয়া ইউরোপীয় অভিজ্ঞতাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি। ধর্ম মানে যদি হয় 'ধারণ করা', তবে আমাদের ধর্ম 'পাশ্চাত্য দর্শন', কারণ জেনে না-জেনে ওটাই আমরা ধারণ করি। যদিও মুখে বলি 'আমি মুসলিম' বা 'আমি হিন্দু'।

কুরআন-হাদিস-শারিয়া নিয়ে পড়তে গেলে এই ধর্মে-ধর্মে বাড়ি খায়। তাই মনে আজ কুরআন নিয়ে এত প্রশ্ন, হাদিস নিয়ে প্রশ্ন, আলিমদের প্রতি এত বিষোদগার, কুরবানির সময় এলে উথলে-ওঠে পশুপ্রেম। খুব স্বাভাবিক। ইউরোপীয় প্রতিটি দর্শন, প্রতিটি ধারণা, প্রতিটি সংজ্ঞা আমাদের মনে 'কুরআনের চেয়ে সত্য'।

লর্ড মেকলেরা সফল। ঠিকই এই শিক্ষাপলিসির দরুন এক প্রজন্মের ব্যবধানে ২০ লক্ষ ক্রেতা তৈরি হয়ে গেল, তৈরি হয়ে গেল ব্রিটিশ-তোষণকারী হাজার হাজার নেটিভ মানসিক দাস। বংশ পরম্পরায় সেই গোলামি করে চলছি আমরা, চলব। ৩য় বিশ্ব যদি সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন চায়, সবার আগে 'মেকলের ভূত' নামাতে হবে। আর চেষ্টা করতে হবে পশ্চিমা সভ্যতাকে বুঝতে। **সেক্যুলারিজম-লিবারেলিজম-হিউম্যানিজম-সমতা-স্বাধীনতা-উন্নতি-প্রগতি এসব চমৎকার শব্দ বলতে ইউরোপ কী বোঝায়, কী শেখায়, জাতিসংঘকে দিয়ে কী চাপায়?**

শিল্প ধ্বংস

কীভাবে সর্বোচ্চ জিডিপির দেশে লাগাতার দুর্ভিক্ষ লাগাতে হয়, তা তো দেখেছেনই। এবার দেখুন কীভাবে শিল্পোন্নত একটা দেশকে কৃষিপ্রধান বানাতে হয়। মোগল আমলে ঠিক যে পরিমাণ মানুষের পেশা ছিল কৃষি, প্রায় কাছাকাছি (৪০%) মানুষের পেশা ছিল শিল্প। বাণিজ্যপ্রধান এলাকা ছিল এদেশ। প্রধান রপ্তানিপণ্য ছিল : মসলিন-সিল্ক-কিংখাব-প্রিন্টের কাপড়, অ্যাম্ব্রয়ডারি, পাটের গালিচা, তামা-পিতলের পাত্র, গহনা, লেদার প্রোডাক্ট, অস্ত্রপাতি, পারফিউম, হাতির দাঁতের কারুকাজ, কাগজ যেত ইউরোপ-আমেরিকায়[১]। সুলতান আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ফ্রাসোয়াঁ বার্নিয়ের একটি চিঠি লেখেন ফ্রান্সের অর্থসচিব মঁশিয়ে কলবার্টকে। তাতে তিনি মুঘল আমলে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লেখেন—

> *হিন্দুস্তান প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। সোনা-রুপা পৃথিবীর অন্য সব জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্তানে এসে পৌঁছায় এবং হিন্দুস্থানের গুপ্ত-গহ্বরে অন্তর্ধান হয়ে যায়। আমেরিকা-ইউরোপের সোনা এসে জমে তুরস্কে, তুর্কী পণ্যের*

[১] A journey from Madras through the countries of Mysore, Kanara and Malabar, Francis Buchanan MD, Fellow of Royal Society.

বিনিময়ে। আর যেত ইয়ামেনে, ইয়ামেনি কফির বদলে। আর তুরস্ক-ইয়ামেন-পারস্য সবারই দরকার হিন্দুস্তানি পণ্য। ডাচ ব্যবসায়ীরা জাপানের সাথে বাণিজ্য করে যা পেত, তাও এসে জমা হতো ভারতে। যা কিছু পর্তুগাল-ফ্রান্স থেকে আসে, তাও ফেরত যায় না। তার বদলে হিন্দুস্তানের পণ্যের চালান যেত। ... এর কারণ হলো, হিন্দুস্তানের বণিকরা সোনা দিয়ে দাম শোধ না করে, পণ্য দিয়েই দাম দিত। আর পণ্যের পসরা নিয়ে দেশ-বিদেশে গেলে, সেই জাহাজেই তাল তাল সোনা বোঝাই করে ফেরত আসত।[১]

উপমহাদেশের সমৃদ্ধ বস্ত্রশিল্প ছিল ইংল্যান্ডের তাঁতিদের চক্ষুশূল। সপ্তদশ শতকে ইংরেজ তাঁতিদের দাবির মুখে বাধ্য হয়ে আইন করে ভারতীয় কাপড়ের প্রবেশ বন্ধ করেছিল ব্রিটিশ সরকার। শিল্পবিপ্লব শুরুর পর যন্ত্রচালিত কারখানার নিম্নমানের কাপড় বিক্রির বাজার সৃষ্টি করার জন্য ভারতের বস্ত্রশিল্প ধ্বংস করে দেবার বিকল্প ছিল না। **নিজের বাজার ভারতীয় পণ্যের জন্য বন্ধ, আর ভারতের বাজার তাদের পণ্যের জন্য মুক্ত।** ১৭ মার্চ ১৭৬৯-এর এক আদেশবলে কোম্পানি তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে : ভারতে কাঁচা রেশম উৎপাদন বাড়াতে হবে, রেশমবস্ত্র উৎপাদন কমাতে হবে। ঘরে উৎপাদন করতে দেওয়া যাবে না, বলপ্রয়োগে রেশমশিল্পীদের 'কোম্পানির ফ্যাক্টরি'-তে এসে কাজ করতে বাধ্য করা হবে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই আদেশের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। বলা হয়[২]—

"

*এই আদেশ একটি নিখুঁত পলিসি-প্ল্যান—একই সাথে বাধ্য করা এবং উৎসাহিত করা। **ফলে বাংলার শিল্পকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ধ্বংস করবে। এর ফলে ওই শিল্পোন্নত দেশটির চেহারাই পাল্টে যাবে, বরং গ্রেটব্রিটেনের শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামালের এক ময়দানে পরিণত করাই উদ্দেশ্য।***

নিজ ঘরে রেশমশিল্পীরা যেন কাজ করতে না পারে, কোম্পানির স্বার্থে কেবল যেন কোম্পানির ফ্যাক্টরিতেই কাজ করে, এজন্য সরকারি ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হওয়া চাই। পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর শাস্তির দ্বারা সরকারি ক্ষমতাবলে এটা করা হোক তারা চায় (কোম্পানি)।

---

[১] বাদশাহি আমল, বিনয় ঘোষ, পৃষ্ঠা : ৬৯-৭১

[২] Ninth Report of the House of Commons Select Committee on Administration of Justice in India, 1783, আর্টিকেল ৯১-৯২-৯৩.

কারিগরদের বেতনের লোভ দেখিয়ে ফিরিয়ে রাখা হবে তাঁত থেকে, যাতে আমাদের জন্য কাঁচামাল রয়ে যায়। তাদেরকে আমাদের কারখানায় আটকে দেওয়া (locked up) হবে। **তাদের যে পণ্য আগে বিকাশলাভ করেছিল, উচ্চমূল্য করে দিয়ে, তা ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ করে দেওয়া হবে গ্রেটব্রিটেনের ক্ষমতাবলে।**

এইসব বিধিনিষেধ আর উৎসাহের দ্বারাই বাংলায় আমাদের চাওয়া পূর্ণ হবে। **শ্রমকে শিল্প থেকে কাঁচামালের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।** এই পলিসির ফলে কাঁচা রেশমের উৎপাদন ব্যাপক বেড়েছে।

ব্রিটিশ ব্যবসায়ী William Bolts তার Considerations on India Affairs পত্র সংকলনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভয়াবহ লুটপাটের খতিয়ান তুলে এনেছেন। তিনি লেখেন—

“

*পুরো দেশজুড়ে **শিল্পশ্রমিকদের ওপর হেন অত্যাচার নেই, যা করা হতো না।** অত্যাচারের পরিমাণ বাড়তেই থাকত, **বিশেষ করে তাঁতিদের ওপর।** তাঁতি, দালাল ও পাইকারদেরকে উৎপাদন-সংগ্রহের কোটা পূরণ না হবার জন্য গ্রেপ্তার, জেল, মোটা জরিমানা, চাবুকপেটা এবং নিজ ভূমি থেকে বহিষ্কার করা হতো। কম উৎপাদন করলে তাঁতিদের পণ্য ছিনিয়ে নেয়া হতো দাম ছাড়াই। কাঁচা রেশমশিল্পীদের ওপরও এরকম অত্যাচার হতো। এমন ঘটনাও জানা গেছে, **এই বাধ্যশ্রম থেকে বাঁচতে তাঁতিরা নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুলিই কেটে ফেলেছে।** লর্ড ক্লাইভের সময় তো আর্মেনীয় বণিকদের কারখানা গুঁড়িয়ে দিয়ে রেশমচাষীদের জোর করে ইংরেজ কারখানায় আনা হয়েছে। (পৃষ্ঠা : ১৯৪)*[১]

শিল্পোন্নত ভারতবর্ষ-বাংলাকে এভাবেই সাম্য-ভ্রাতৃত্ব-স্বাধীনতা দিয়ে কৃষিপ্রধান দেশ বানিয়ে দেওয়া হলো। আর নেটিভরা ভাবল তারা উন্নত হচ্ছে, ব্রিটিশরা তাদের সভ্যতা শেখাচ্ছে। ইউরোপের ফর্মুলা মানলেই নেটিভরা উন্নত হতে পারবে, ঠিক একদিন, তোমরা দেখে নিয়ো।

[১] William Bolts, Merchant And Alderman, Or Judge Of The Hon. The Mayor's Court Of Calcutta, Considerations on India Affairs, 1772

সব টাকার খ্যালা

প্রজা ও জমিদারের মাঝে **মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী অংশটার** উৎপত্তি ষোড়শ শতক থেকে। উপনিবেশের মাধ্যমে ইউরোপের পুঁজি বাড়ছে, ব্যবসাপাতি বাড়ছে। **জমিদারেরা ছিল এদের বিকাশে বাধা। কারণ এই বণিকেরা ছিল উৎপাদক প্রজা আর শোষক জমিদারের মাঝখানে, যাদেরকে জমিদারেরা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করত, ব্যবসায় বিধিনিষেধ-খাজনাপাতি আরোপ করে।**[১] অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড বলেন—

❝

*ষোড়শ শতকে এই **নতুন শিশু অর্থনীতি (পুঁজিবাদ)** থেকে জন্ম নিল নতুন মনোভাব—বাজার-মানসিকতা, যার মূল্যবোধগুলো ভিন্ন ধরনের।... ধর্মের শিক্ষা ছিল, আর্থিকভাবেও প্রত্যেকে অপরের জন্য দায়ী। বিপরীতে নতুন এই মানসিকতায় সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন অন্য সবার চেয়ে ওপরে ওঠা, অপরকে পিছে ফেলা আর টেক্কা দেবার প্রচেষ্টা। ভ্রাতৃভাবের চেয়ে প্রতিযোগিতাই দরকারি মানসিকতা এই নতুন ব্যবস্থাতে।... ব্যবহারের নৈতিকতার চেয়ে সম্পদ সংগ্রহের দ্বারা মানুষের বিচার হতে লাগল।... **অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝেই এই নব্য অর্থনৈতিক ধারণা একটা 'সর্বজনীন জীবনধারা'য় পরিণত হয়ে পড়ে (পুঁজিবাদ)। সেক্যুলার ও বস্তুবাদী মূল্যবোধ, যা দ্বারা পশ্চিম ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকার মানুষ প্রভাবিত, এই নতুন***

---

[১] অর্থনীতিবিদদের যুগ, ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড

দর্শনই ছিল তার ভিত্তি।[১]

সুতরাং,, জমিদারদের সাথে এই ব্যবসায়ীদের একটা স্নায়ুযুদ্ধ চলছে। ওদিকে জমিদার-রাজাদেরকে হাওয়া দেয় চার্চ। জমিদার-চার্চ-রাজা— এই পুরো সিন্ডিকেটটাই ব্যবসায়ীদের শত্রু। অবশেষে বাটে পাওয়া গেল সিন্ডিকেটকে। যাজকদের অনৈতিকতা, শতাব্দীর পর শতাব্দী ডাইনি-নিধন, বুবোনিক প্লেগ, চার্চ-সমর্থিত সামন্ততন্ত্রের অত্যাচার, ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ ইউরোপে শুরু হলো বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন—এনলাইটেনমেন্ট। **জমিদারদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে ব্যবসার ওপর নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নেবার দর্শন দেওয়া হতে লাগল : মার্কেন্টাইল অর্থনীতি, ফিজিওক্রাট, এরপর লিবারেল। ব্যবসাপাতির পক্ষে যা যা উপকারী, যেমন : ক্রেতার ভোগের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত মালিকানা, সরকারি হস্তক্ষেপ না থাকা ইত্যাদি আলোচনা এনলাইটেনমেন্ট দর্শনে চলতে থাকল।** জন্ম নিল পুঁজিবাদ, মুনাফাই যার লক্ষ্য। উপনিবেশ ও শিল্পবিপ্লবের মওকায় পুঁজির বিকাশে বিকশিত হলো এই মধ্যবিত্ত শিল্পপতিরা। শুধু কি তাই, এই **এনলাইটেনমেন্ট ফিলোসফারদের একটা বড় অংশ নিজেরাই ছিলেন ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, বিনিয়োগকারী (জন লক, স্টুয়ার্ট মিল)।**

পরবর্তী শতকগুলোতে 'এনলাইটেনমেন্ট'-এর যুগে ইউরোপের নৈতিকতার যে বিবর্তন, তা যেন পুষ্টি জুগিয়েছে এই শিশু অর্থনীতিকেই, ব্যবসা-মনোবৃত্তিকেই। বলা হয়েছে—

- মানুষ স্বভাবগতভাবে স্বার্থপর (Thomas Hobbes)। এমন পরিবেশ করে দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব, যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থ সর্বোচ্চ চরিতার্থ করতে পারে।
- জীবনের লক্ষ্য হলো সর্বাধিক সুখ চরিতার্থ করা (ভোগ) এবং সর্বনিম্ন কষ্ট পাওয়া (maximizing pleasure and minimizing pain)। [hedonistic principle, John Locke]
- এটা করতে চাই সর্বাধিক স্বাধীনতা। জন্তু থেকে ব্যক্তি (human) তখনই হতে পারবেন, যখন হবেন 'পরিপূর্ণ স্বাধীন' (Jean-Paul Sartre)।

---

[১] *অর্থনীতিবিদদের যুগ*, পৃষ্ঠা : ১১-১৭; ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড,

- আর তখনই স্বাধীন বলা হবে—যখন কেউ আগের কোনো মূল্যবোধকে (ধর্ম) মেনে না নেবে। সে মূল্যবোধ-নৈতিকতা নিজে ঠিক করে। (Values are not recognaized by you, values are determined by you).[১] সে-ই স্বাধীন 'ব্যক্তি' যে নৈতিকতার স্রষ্টা, নিজের নৈতিকতা নিজেই ঠিক করে (creator of values) [Kierkegaard] [২] বাইরের কোনো নৈতিকতা (ধর্ম) তার ভোগ-ফুর্তিকে বাধা দেয় না।
- রাষ্ট্রের কাজ হলো : সর্বাধিক মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখ (ভোগ) নিশ্চিত করা (greatest good for the greatest number)। [utilitarianism, Jeremy Bentham]
- এটা করতে গিয়ে কোনো কাজ ততক্ষণই বৈধ, যতক্ষণ তা অন্য কারো ক্ষতি না করছে। [harm principle, John Stuart Mill]
- এজন্য যদি কোনো কাজে কারো সম্মতি থাকে, তাহলে তা বৈধ। সম্মতি না থাকলে অবৈধ। [consent-based model]

খেয়াল করলে দেখা যায়, **এই প্রতিটি কথাই বৈধ-অবৈধের নতুন ধারণা দিচ্ছে, যা ব্যবসার অবাধ সুযোগ তৈরি করে। যা যা ব্যবসাকে, পণ্য বিক্রয়কে বাধা দেয়; মুনাফা ও ভোগের ওপর নৈতিকতা আরোপ করে, ভোগকে নয়, ত্যাগকে উৎসাহিত করে—এমন সবকিছুকে (ধর্ম, পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ) ভেঙে অকার্যকর করে দিতে পারলে লাভেই লাভ। আর রাষ্ট্র হবে সর্বশক্তিমান, যা সযত্নে রক্ষা করবে পুঁজিপতিদের অবাধ ব্যবসার স্বার্থ।** কীভাবে করে—

ক.

আগের ধর্মভিত্তিক নৈতিকতা ভোগকে নিরুৎসাহিত করে, ত্যাগকে উৎসাহিত করে। সুতরাং,, 'ব্যক্তি'র নতুন সংজ্ঞা দাও : যে নিজের ভালোমন্দ নিজে ঠিক করে সে human, সেই আলোকিত। বাকি সবাই অন্ধকার যুগের মানুষ। এভাবে ধর্মকে হটিয়ে হিউম্যানিজম, ধর্মনিরপেক্ষতা, লিবারেল ইথিক্সকে আনা হলো।

---

[১] প্রাগুক্ত। দর্শনের সব আলোচনাগুলো এখানে থেকে নেয়া : *The Human Person in Contemporary Philosophy*, Frederick C. Copleston; PHILOSOPHY; Vol. 25, No. 92 (Jan., 1950), page: 3-19

[২] A man becomes an 'individual/person' by exercising his free choice, by freely giving form and direction of his life. – Kierkegaard, father of modern existentialism

* বাজারে নতুন ভোক্তা সৃষ্টি করা
নারীকেও ক্রেতা বানাও, ভোক্তা বানাও। why should boys have all the fun...
আগে পরিবার ইউনিট হিসেবে ক্রেতা ছিল, এখন স্বামী-স্ত্রী স্বাধীন দুই ক্রেতা।
* শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা
চাকরির জন্য প্রার্থী বাড়াও। নারীদের শ্রমবাজারে নিয়ে এসো। পুরুষের সাথে নারীর অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করো।
* নতুন ব্যবসা সৃষ্টি করা
চাহিদা যারা পূরণ করছে (পরিবার ও সমাজ),
- তাদেরকে সরিয়ে দেয়া বা
- পৃথক করে দেয়া বা
- একত্র হতে না দেয়া
সেই চাহিদা নিয়ে পণ্য ছাড়ো, নতুন ব্যবসা সৃষ্টি করো।
ঊর্ধ্বমুখী ও একমুখী মুনাফা প্রবাহ
৫০% সম্পদ ১% মানুষের হাতে
গরীব আরও গরীব
ধনী আরও ধনী
নারীকে নির্ভরশীল না রেখে স্বাবলম্বী করা
নারীশিক্ষা
নারী ক্ষমতায়ন
নারীপ্রগতি
ছেলেদের স্বাবলম্বী হওয়া পেছাও। পরিবার গঠন পেছাও
দীর্ঘসূত্রী কারিকুলাম
চাকরির কৃত্রিম প্রতিযোগিতা
বছরে...
৭০০০০ কোটি ডলারের স্বাস্থ্য ব্যবসা
১৩৪৪০০ কোটি ডলারের এলকোহল ব্যবসা
৪৩৫০০ কোটি ডলারের ড্রাগ ব্যবসা
৯৭০০ কোটি ডলারের পর্নব্যবসা
যৌনকাজে ব্যবহৃত মানব পাচার থেকে ৯৯০০ কোটি ডলার
পতিতাব্যবসা বছরে ১৮৬০০ কোটি ডলারের
কেবল Erectile Dysfunction Market-ই ২০২৪ সালের মধ্যে ৪২৫ কোটি ডলারে পৌঁছবে বছরে।
যৌনবাহিত রোগের ওষুধের মার্কেট ২০১৭ সালে সারা দুনিয়ায় প্রায় ৩৩০০ কোটি ডলার, ২০২৫ সালের মধ্যে হবে ৮৬০০ কোটি ডলার।
ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বক্স অফিস ব্যবসা ৩৮০০ কোটি ডলার
বছরে ৩৩০০ কোটি ডলারের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবসা
ক্যাবল টিভি ও স্যাটেলাইট ব্যবসা বছরে ২৮৬০০ কোটি ডলার
উচ্চতর শিক্ষার মার্কেট ২০১৬ সালে ছিল ৫১.৮ বিলিয়ন ডলারের। যা ২০২৫ সালে হবে বছরে ১০৫.৭২ বিলিয়ন ডলারের।

খ.

পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য মানুষ ত্যাগ করে, sacrifice করে, যা ভোগকে কমায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আদর্শের দ্বারা তৈরি হবে স্বার্থপর মানুষ, যার ফোকাস হবে শুধু নিজের ভোগ। পরিবারের পিতা সন্তানকে Deterred consumption শেখায়, কম ভোগ করতে শেখায়। যে পরিবারে বাবা থাকে না, সে পরিবারের সন্তানরা হয় compulsive consumer.[১] সুতরাং, **ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারীবাদ প্রভৃতি ব্যবহার করে পরিবার ভেঙে দাও, দুর্বল করে দাও, পরিবার গঠন পিছিয়ে দাও, লিভ-টুগেদারভিত্তিক ভঙ্গুর পরিবার (fragile family) তৈরি করো।** বাপকে সন্তান যেন না পায়, নিজের ভোগ স্যাক্রিফাইস করার মতো কেউ যেন না থাকে।

গ.

স্বাধীন মানুষ নিজের ইচ্ছার দাসত্ব করবে। ফলে স্বাধীনতা বৃদ্ধি করবে ভোক্তাসংখ্যা। পরাধীন ব্যক্তির ভোগ সীমিত। নেগেটিভ ফ্রিডমকে প্রোমোট করো, সব বাধা ভেঙে দাও। কেউ কাউকে নিয়ন্ত্রণের অধিকার রাখে না। লিবারেল, সমতা, সমানাধিকার। আগে স্বামী-স্ত্রী মিলে এক গাড়ি কিনত। এখন দুজনের দুটো গাড়ি, ডাবল ডাবল পণ্য বিক্রি হবে।

ঘ.

সমতা ও তা থেকে উৎসারিত অন্যান্য আইন প্রত্যেকের ভোগের অধিকার নিশ্চিত করবে।

ঠিক এভাবেই এনলাইটেনমেন্টের পুরো কাঠামোটাই পুঁজিবাদের পক্ষে কাজ করবে। **ভোগ বাড়লে ক্রেতা বাড়বে, ক্রেতা বাড়লে পণ্য বেশি বিক্রি হবে, বেশি বিক্রি মানে বেশি মুনাফা—পুঁজিবাদ। যা যা এই ভোগকে নিরুৎসাহিত করে, ভোগের অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় : ধর্ম, পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ—সবকিছুকে ভেঙে অকার্যকর করে দিতে পারলে লাভেই লাভ। আর রাষ্ট্র হবে সর্বশক্তিমান, যা সযত্নে রক্ষা করবে পুঁজিপতিদের অবাধ ব্যবসার স্বার্থ।**

সমতা-স্বাধীনতা-গণতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দগুলো কেবল শ্রুতিমধুর উন্নত মূল্যবোধ নয়, প্রতিটি শব্দের পেছনে আছে অর্থনৈতিক দর্শন। একটা উদাহরণ দিলেই বাকি

---

[১] Aric Rindfleisch et al. (1997). Family Structure, Materialism And Compulsive Consumption, Jounal of Consumer Research, vol 23, no.4, pp. 312-325

সবগুলো একসাথে ধরতে পারবেন। যেমন : পশ্চিমা সভ্যতার সবচেয়ে মানবিক অর্জনের মাঝে একটি হলো পৃথিবী থেকে দাসপ্রথা বিলোপ (?)। আসলেই বিলোপ হয়েছে কি না, সে আলাপ পরে। তারা আইনকানুন বানিয়ে ফুল স্কেল বিলোপ করেছে। ১৫০০ সাল থেকে ১৮০০ সাল এই ৩০০ বছর দাসব্যবসা ছিল ইউরোপের অন্যতম লাভের ব্যবসা। Bank of England, Lloyds of London, Barclays Bank এরা সবাই দাসব্যবসার বিনিয়োগকারী। যেমন ধরেন, ব্রিটেনের Royal Africa Company প্রতিটা ট্রিপে ৩৮% লাভ করত ১৬৮০ সালের দিকে, আফ্রিকা থেকে একটা দাস ৩ পাউন্ডে কিনে আমেরিকায় বেচত ২০ পাউন্ডে। কলোনিগুলো থেকে যা রপ্তানি হতো, তার ৭৫% ছিল দাসশ্রম; কিন্তু ... কী হলো এরপর?

» **১৮০৩ সালে ডেনমার্ক দাস 'ব্যবসা'কে অবৈধ করে।**
» **১৮০৭-০৮ এ আমেরিকা ও ব্রিটেন নিজ নিজ দেশে দাস আমদানিকে অপরাধ সাব্যস্ত করে।**
» **ডাচরা ১৮১৪ সালে**
» **পর্তুগাল, স্পেন ও ফ্রান্স ১৮২০ এর মধ্যে**

সালগুলো লক্ষ করুন। **৩০০ বছর ধরে চলা আমেরিকা-ইউরোপের অন্যতম লাভের ব্যবসাটা ১৭ বছরের মধ্যে তারা ধুমধাম গুটিয়ে দিয়েছে। যেসব দেশ দাসব্যবসা থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হতো, তারা সবাই উনিশ শতকের প্রথম ২০ বছরেই কেন ব্যবসা বন্ধ করে দিলো?** কী এমন ঘটল যে, পুরোপুরি দাসপ্রথা-নির্ভর অর্থনীতি যাদের তারাই হঠাৎ করে দাসপ্রথাবিরোধী (abolitionist) হয়ে গেল?

■ ১৭৬০ এর পরে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব হয়। নিত্যনতুন মেশিন আবিষ্কারের ফলে মার্কেটে নতুন দাসের প্রয়োজন কমে আসে, মানবশ্রমের দরকার হ্রাস পায়। ব্যাংকগুলো দাসব্যবসার চেয়ে এখন শিল্প কারখানায় বিনিয়োগে বেশি আগ্রহী।

■ উঠতি শিল্পপতি সমাজ এবং পুরোনো জমিদার সমাজ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। জমিদার সমাজ ছিল এই দাসব্যবসার মূল বিনিয়োগকারী এবং দাস দ্বারা কৃষির (plantation sector) মাধ্যমে লাভবান। যেমন The Royal Adventurers কোম্পানির মাথাদের মধ্যে ছিল ২ জন আল্ডারম্যান, ৩ জন ডিউক, ৮ জন আর্ল,

৭ জন লর্ড, ১ জন কাউন্টেস, ২৭ জন নাইট[১]। দাসকোম্পানিগুলোর নাম দেখেন : The Royal Adventurers, The Royal African Company ... নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে এখানে রাজপরিবারের বা তাদের সমর্থনপুষ্টদের পৃষ্ঠপোষকতা বা বিনিয়োগ রয়েছে। মানে **দাসব্যবসা জমিদারদের, শিল্প-কারখানা পুঁজিপতিদের।**

» ফলে জমিদারদের শক্তি নিঃশেষ করতে দাসব্যবসা বন্ধ করে দাসপ্রথা বিলোপ করা প্রয়োজন। ওদিকে শিল্পপতিদের দাসের দরকার নেই, তাদের আছে যন্ত্র।

» শিল্প প্রোডাক্ট বিক্রি করে আনতে হচ্ছে চিনি, আবার ওদিকে দাসদের দিয়ে উৎপাদন করানো হচ্ছে চিনি, ফলে শিল্পপণ্য বিক্রি ব্যাহত হচ্ছে।

» আফ্রিকাতে পণ্য বিক্রির জন্য স্বাধীন ক্রেতা চাই। তাদেরকে দাস বানিয়ে নিয়ে যাওয়াটা জমিদারদের জন্য লাভজনক হলেও, ব্যবসায়ীদের লোকসান। **সবদিক দিয়েই দাসপ্রথা শিল্পপতিদের জন্য লোকসান।**

■ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া ছাড়াও বিশ্বের নানা জায়গায় ততদিনে ব্রিটেনের উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। **ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার ব্যবসাগুলোর কর্ণধার জমিদারেরা, আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্ণধার হলো ব্যবসায়ীরা।** দাসপ্রথার পক্ষে-বিপক্ষে কারা ছিল একটু দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

---
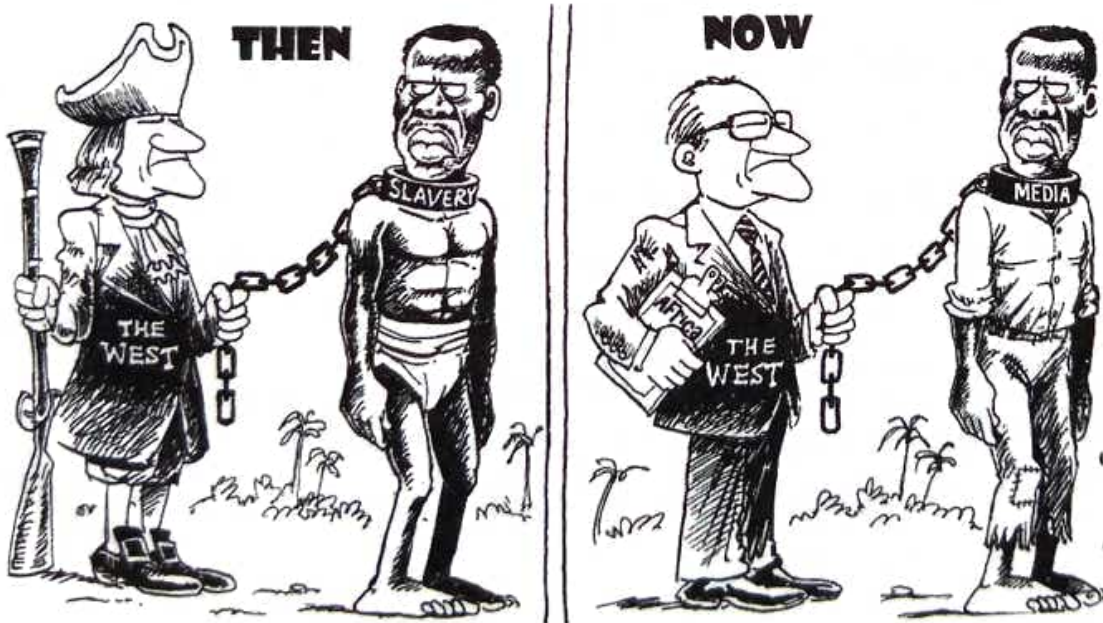
[১] এগুলো অভিজাত পরিবার, সামন্ত ও জমিদারদের নানান পদ-পদবী. মর্যাদার ক্রমধারা রাফলি এমন— duke/duchess > marquess/marchioness > earl/countess > viscount/viscountess > baron/baroness. BRETTE WARSHAW (SEP 17, 2019) What's the Difference.

দাসপ্রথার পক্ষে	দাসপ্রথার বিপক্ষে
রাজা ৩য় জর্জ রাজা ৪র্থ উইলিয়াম চার্চ তৎকালীন প্রধান মানবাধিকার কর্মীরা: » John Cay » Bryan Blundell » Foster Cunliffe » মেয়র Thomas Leyland » Heywood পরিবার » Tarlton পরিবার	■ Thornton পরিবার (ইস্ট ইন্ডিয়া স্টকের মালিক) ■ Zachary Macaulay (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার) ■ James Cropper (ইস্ট ইন্ডিয়ার চিনির প্রধান আমদানিকারক) ■ Thomas Whitmore (পার্লামেন্টে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি)

দ্বিতীয়ত : অন্য কিছু বেশি লাভজনক ছিল

■ ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা শিল্প-কারখানাগুলোয় উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য আফ্রিকার বাজারও প্রয়োজন, যে প্রয়োজনটা আগে ছিল না। সব কর্মক্ষম আফ্রিকানকে ধরে নিয়ে এলে পণ্য কিনবে কে?[১]

■ নতুন অর্থনীতিতে (পুঁজিবাদ) দাসপ্রথার চেয়ে waged labour বা বেতনভুক্ত শ্রমিক বেশি লাভের। কেননা দাস তো স্বাধীন ভোক্তা নয়; বরং বেতনভুক্ত শ্রমিক নিজেই ভোক্তা। আধুনিক অর্থনীতির জনক Adam Smith-এর মতে, যে ব্যক্তি সম্পত্তি অর্জন করতে পারে না, তার প্রবণতাই থাকে : খাবে বেশি, শ্রম দেবে কম। বেশি শ্রম সে কেন দেবে? তার তো লাভ নেই বেশি কষ্ট করে। সুতরাং,, দাসের চেয়ে স্বাধীন ভাড়াটে শ্রমিক বেশি economically superior. দাসের পেছনে যা খরচা হতো, সেটাই বেতনাকারে দেওয়া হবে। শ্রমিক ওভারটাইম করে করে ভোগ বাড়ানোর চেষ্টা করবে। কাজও পাওয়া গেল বেশি, ভোক্তার মার্কেটও বড় হলো।

সুতরাং, ব্যবসায়ীদের নতুন অর্থনীতির জন্য দাসপ্রথা ছিল একটা লস-প্রোজেক্ট। যার কারণে উনিশ শতকের নতুন অর্থনীতি, নতুন রাজনীতি এবং নতুন সমাজের

---

[১] Trevor Getz. Why Was Slavery Abolished? : Three Theories. Khan Academy

জন্য দাসপ্রথার আর প্রয়োজন নেই। সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসের জন্যও তাদের শক্তির উৎস ধ্বংস করা দরকার ছিল, কারণ এখন শিল্পপতিদের শাসন শুরু হবে, যার নাম গণতন্ত্র। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবে এদের হাতেই পতন ঘটল জমিদারতন্ত্রের, এরাই দেশে পত্তন করল গণতন্ত্রের, যাতে নিজেদের ব্যবসার অনুকূলে শাসনযন্ত্রকে ব্যবহার করা যায়। সেই সাথে নিজেরাও সরাসরি মন্ত্রী ইত্যাদি হবার দ্বারা শাসনে হস্তক্ষেপ করা যায়।

উপনিবেশ-যুগে তারা যা করেছে, ঠিক একই কাজ তারা নব্য-উপনিবেশি যুগেও করে চলেছে। অষ্টাদশ শতকের সেই মধ্যবিত্ত পুঁজিপতিরা আজকের মাল্টিন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রির মালিক। **পার্থক্য হলো, তখন কোম্পানিগুলোরই নিজস্ব সেনাবাহিনী ছিল। আর এখনকার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির নিজের বাহিনী থাকে না, তবে গণতন্ত্রের মাধ্যমে যে পুতুল সরকার তারা বানায়, সেই সরকারি বাহিনীকে ব্যবহার করেই একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার জুটিয়ে নেয়। নিজ দেশের সরকার, ইইউ, জাতিসংঘ দিয়ে বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ করে, কিংবা তাদের সাপ্লায়ারদের দিয়ে ভেতর থেকে চাপ দিয়ে ৩য় বিশ্বের সরকারকে তাদের মনমতো পলিসি করতে বাধ্য করে।** দেশে দেশে সরকার যা আমরা দেখি, এরা পুতুল। সরকারে বসায় এরা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-মিডিয়া-রাষ্ট্র এসবকিছু এই শ্রেণির হাতে। ৫০% সম্পদ যে ১%-এর হাতে, এরা হচ্ছে সেই তারা। পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে, যুদ্ধ থেকে নিয়ে রিঅ্যাডুকেশন ক্যাম্প, আইন থেকে নিয়ে নারীবাদ—সবকিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই অংশটাকেই লাভবান করে। এরাই একসময় দাসব্যবসায় বিনিয়োগ করেছে, এরাই পরে দাসপ্রথা বন্ধে আইন করেছে নিজেদের স্বার্থে, আবার এরাই সীমিত আকারে ভিন্ন নামে দাসপ্রথা টিকিয়ে রেখেছে নিজেদেরই স্বার্থে।

- **উপনিবেশবাদ হলো : গরু পরাধীন, আমিই পালব, আমিই খাওয়াব, আমিই দুধ নেব। আর নব্য-উপনিবেশবাদ হলো : গরু আমি পালব না, গরু স্বাধীন, নিজের মতো চরে খাবে, আমি দিনশেষে শুধু দুধটুকু দুয়ে নেব।** আগে ব্রিটিশ দাদন দিয়ে, পিটিয়ে মেরে নীল চাষ করাত, দোষ হতো ব্রিটিশের। এখন নেয় এদেশীয় সরকার দিয়ে পলিসি করিয়ে পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে, ব্রিটিশের হাত ময়লা হয় না। ম্যাপটা থাকে সাদা সাদা। আর ভারতের ম্যাপ হয় কালো কালো। গরিব দেশের সরকার আইন বানায় গরিব দেশের প্রডিউসার সাপ্লায়ারদের চাপে কিংবা আমেরিকান গ্লোবাল কোম্পানি আমেরিকা সরকারকে দিয়ে গরিব দেশের সরকারকে চাপ দেওয়ায়। গরিব দেশে এই সাপ্লায়াররা-শিল্পপতিরাই মন্ত্রিসভা

আলো করে বসে থাকে। Govt. of the Capitalist, by the Capitalist, for the Capitalist. এর নাম 'গণতন্ত্র'। কেউ যদি মনমতো কাজ না করে, পরের টার্মে বদলে দেওয়া যায়। সাপ্লাই চেইন ঠিক রয়ে যায়। দাসরা দাস রয়ে যায়। আর যে দেশে এই মজার সিস্টেমটা নেই, সেখানে গিয়ে জোর করে 'গণতন্ত্র' দেওয়া হয়। অবশ্য স্বৈরশাসক বা বাদশাহ অতখানি সুযোগ দিলে গণতন্ত্র তখন আর জরুরি থাকে না। দেশে দেশে দুনিয়া চালায় পুঁজিপতিরা। এই দুনিয়া ওদের, আমাদের নয়।

» **একদিকে তারা পুরো দুনিয়াকে এনলাইটেনমেন্টের স্বাধীনতা-সমতা শেখাচ্ছে, অন্যদিকে ৪.৫ কোটি মানুষকে দাস বানিয়ে রেখেছে ব্যবসার খাতিরে।**[১]

» **প্রতি বছর দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ থেকে ২০ লক্ষ শিশু ইউরোপে-যুক্তরাষ্ট্রে পাচার করা হয়।**[২]

» **পূর্ব ইউরোপ থেকে প্রতি বছর বহু নারী ও শিশু আমেরিকাতে পাচার করা হয় পর্নোগ্রাফির জন্য।**

» **ILO-এর মতে, আধুনিক দাসদের কারণে বছরে ১৫০ বিলিয়ন ডলার মুনাফা হয়। টপ ৫টা ইন্ডাস্ট্রির নাম যদি বলা যায়, যারা এই দাসপ্রথার ওপর মুনাফা করছে এবং টিকে আছে—**

- ইলেক্ট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি
- গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি
- ফুড এন্ড অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি
- সেক্স ইন্ডাস্ট্রি (বার ও নাইটক্লাব)
- ক্যাসিনো ও হোটেল

» **Oxfam, UK-এর ethical trade manager Rachel Wilshaw বলেন—**

---

[১] Global Slavery Index—2016

[২] Child Sex Trafficking In Latin America, United Nations Human Rights Council.

আমরা এখন জানি, অধিকাংশ গ্লোবাল কোম্পানিরই সাপ্লাই চেইনে কোথাও না কোথাও আধুনিক দাসপ্রথা রয়েছে।

■ নব্য-উপনিবেশবাদের ন্যাক্কারজনক খুল্লমখুল্লা প্রদর্শনী করে চলেছে ফ্রান্স।

» স্বাধীনতার পর গত ৬০ বছর ধরে প্রতি বছর ফরাসি সেন্ট্রাল ব্যাংকে ৫০০ বিলিয়ন ডলার জমা দেয় ১৪টা আফ্রিকান দেশ colonial debt হিসেবে।

» ফ্রান্স তাদের এই শর্তে স্বাধীনতা দিয়েছে, মোট বৈদেশিক রিজার্ভের ৮৫ % ফ্রান্সে পাঠাতে হবে। আর বাকি ১৫ % দিয়ে আফ্রিকা চলবে।

» না দিলে হয় আর্মি দিয়ে ক্যু করিয়ে বা গুপ্তহত্যা করে সরকার বদলে দেওয়া হবে।

» আফ্রিকার খনিজের ওপর একচেটিয়া অধিকার থাকবে ফরাসি কোম্পানিগুলোর। পানি, বিদ্যুৎ, পরিবহণ, টেলিফোন, বন্দর, ব্যাংক, বাণিজ্য, নির্মাণশিল্প, কৃষিসহ সকল সেক্টরে ফরাসি কোম্পানি অগ্রগণ্য থাকবে। 'France Diplomatie' অনুযায়ী, ২০১৭ সালে ২১০৯টির বেশি কোম্পানি আফ্রিকা মহাদেশে একচেটিয়া ব্যবসা করছে।

'GOLD DIGGERS'

এখন আমাকে বলেন, ২০১৬-১৭ তে আইভরি কোস্টের ২৩ লাখ এডাল্ট যে কোকো ফ্যাক্টরিতে দাসত্ব করে, সে দায় কি আফ্রিকার, না অন্য কারো? সেদেশের ১০-১৭ বছরের ৮৯১,০০০ শিশু যে স্কুলে না গিয়ে কোকো মাঠে নামমাত্র মূল্যে

শ্রম দেয়, সে দায় কার?[১] আফ্রিকার, নাকি যারা আফ্রিকার ৮৫ % সম্পদ নিয়ে যায় প্রতিবছর, তাদের?

উন্নত মূল্যবোধের নামে, সভ্যতার নামে যেসব মতবাদ তারা ফেরি করছে, চাপিয়ে দিচ্ছে সেগুলো ৩য় বিশ্বে ব্যবসার নতুন নতুন ফ্রন্ট খোলার পাঁয়তারা। তাদের দেশে তো তাদের বাজার আছেই, ৩য় বিশ্বের ধর্ম-পরিবার-সমাজ ধ্বংস করে দিয়ে আমাদেরকে তাদের পণ্য-সেবা গ্রহণে বাধ্য করার কৌশল হিসেবে আমাদের রুচি-মূল্যবোধ, ভালোমন্দের মাপকাঠি বদলে দেওয়ার চেষ্টা আজও অব্যাহত, সে উপনিবেশ যুগের মতোই। দেখুন...

» EMIS-২০১৭ রিপোর্টে এসেছে ইউরোপের ১,২৭,৭৯২ জন গে-পুরুষের ৯৪ % অ্যান্টি-রেট্রোভাইরাল প্রোফাইল্যাক্সিস নিচ্ছে। গে, লেসবিয়ানদের জন্য আলাদা কেয়ার আলাদা ডিপার্টমেন্ট করার পরও বছরে ৩০-৪০ হাজার এইডস কেস সমকামীদের ভেতর থেকে।

» safer sex এর নামে ডেন্টাল ড্যাম (ওরাল সেক্সের জন্য), সেক্স টয়, লুব্রিকেন্ট দেদারসে ইউজ করতে হয়।

» এই লক্ষ লক্ষ সমকামীকে কন্টিনিউয়াস স্ক্রিনিং, প্রোফাইল্যাক্সিস করাতে হয়।

» আমেরিকাতে একজন পুরুষকে নারী হতে গড়ে গুনতে হয় ১ লক্ষ ডলার। পেনসিলভ্যানিয়ার Philadelphia Center for Transgender Surgery তাদের খরচ জানিয়েছে : পুরুষ থেকে নারী হতে $১৪০,৪৫০ এবং নারী থেকে পুরুষ হতে $১২৪,৪০০ মাত্র।[২] লিঙ্গা সার্জারিতে লাগে ৩০,০০০ ডলার প্লাস। চেহারার সার্জারিতে লাগে ২৫,০০০-৬০,০০০ ডলার। স্তন সার্জারিতে লাগে ৫,০০০-১০,০০০ ডলার।[৩]

» ২০১৭ সালে শুধু পুরুষ-টু-নারী সার্জারির মার্কেট ছিল সাড়ে ১১ কোটি ডলারের। ২০১৬ সালে মোট এই সার্জারি হয়েছে ৩২৫০ টা, যা আগের বছরের চেয়ে

---

[১] Global slavery index 2018 report

[২] Alyssa Jackson (July 31, 2015), The high cost of being transgender, CNN Health

[৩] www.teenvogue.com

১৯% বেশি, মানে মার্কেট ক্রমেই বাড়ছে। ২০২৬ সালের মধ্যে এই মার্কেট গিয়ে দাঁড়াবে বছরে ১৫০ কোটি ডলারে[১]।

» শুধু সার্জারির কথা বললাম। বাকিটা জীবন তাকে হরমোন থেরাপি নিতে হয়, যার খরচ বছরে ১৫০০ ডলার।

সমকামিতাকে প্রোমোট করা, জেন্ডার ডিসফোরিয়াকে উসকে দেওয়া, জেন্ডার আইডেনটিটির নামে বায়োলজিক্যাল সেক্স নিয়ে অতৃপ্তি জাগানো এগুলো ১ম বিশ্বের আরেকটা পুঁজিবাদী অ্যাজেন্ডা। মিডিয়া তাদের হাতে, বিজ্ঞান তাদের হাতে। এগুলো ব্যবহার করে ৩য় বিশ্ব থেকে আরো মুনাফা লুটে নেবার একটা 'কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি' প্রকল্প। সেই ১৮১৩ সালে মাদ্রাজের গভর্নর কর্নেল মুনরোর কথাটা মনে করুন, রুচি বদলে না দিলে বিলাতি পণ্য কেনানো যাবে না নেটিভদেরকে দিয়ে। ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে রুচি বদলানোর কাজটা করেছিলেন লর্ড মেকলে। আজও ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে ৪২৮ কোটি টাকা ঋণ দিলো[২]। কোন ইইউ? যার দূতাবাসগুলোয় সমকামিতার পতাকা ওড়ে। যে ইইউ গাম্বিয়াকে চাপ দিয়ে সমকামিতা বৈধ করাতে চেয়েছিল, না পেরে মিলিয়ন ডলার অনুদান প্রত্যাহার করেছে। সেই ইইউ আমাদের লোন দিয়েছে, কী দাবি তাদের আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়? বোঝা যায়?

প্রতিটি নাস্তিক ইসলামবিদ্বেষী, প্রতিটি নারীবাদী, প্রতিটি সমকামী অ্যাক্টিভিস্ট, প্রতিটি পশ্চিমান্ধ বিজ্ঞানবাদী সজ্ঞানে-অজ্ঞানে নব্য উপনিবেশবাদের রাজাকার... ১ম বিশ্বের দালাল ছাড়া আর কিছুই নয়।

[১] Sex Reassignment Surgery Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2018 - 2026, Transparency Market Research

[২] দেশের শিক্ষাখাতে ৪২৮ কোটি টাকা দিয়েছে ইইউ, ইনকিলাব (১৯ মে, ২০২০,)

আধুনিকতা

এনলাইটেনমেন্টের পর ইউরোপের চিন্তাজগৎ প্রবেশ করল রোমান্টিক যুগে (১৮০০-১৮৫০)। এনলাইটেনমেন্ট যুক্তি শিখিয়ে গিয়েছিল, রোমান্টিসিজম সেখানে আবেগের ওপর জোর দিলো। আলোকায়ন শিখিয়েছিল প্রকৃতিতে মুগ্ধ না হয়ে বরং প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ। আর রোমান্টিকতা শেখালো প্রকৃতি নিয়ে বিমুগ্ধতা। এনলাইটেনমেন্ট বলেছিল গ্রেকো-রোমান যুক্তি-বস্তু-মানববাদে ফেরত যাবার কথা। বিপরীতে রোমান্টিসিজম এসে বলল, মধ্যযুগীয় ভাবালুতার কথা, মধ্যযুগের বীরদের বীরত্বগাথা শুনিয়ে জাতীয়তাকে আবেগের পর্যায়ে নিয়ে গেল (তুলনা করুন আজকের দেশপ্রেম চেতনার সাথে), Romantic nationalism বলে একে।

এনলাইটেনমেন্টের বিরোধিতা করতে গিয়ে সে বরং আলোকায়ন প্রকল্পতেই আরো ঘি ঢেলে গেল। যুক্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে বরং মানুষকে আরো আত্মমগ্ন করে গেল। অযৌক্তিক আবেগ-কর্মকেও জাস্টিফাই করে দিলো নিয়ম-শৃঙ্খলা-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে। **ধর্মকে কেবল 'স্রষ্টার সাথে একান্ত ব্যক্তিগত অনুভব' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এনলাইটেনমেন্টের সেই ধর্মনিরপেক্ষতা কনসেপ্টকেই আরো সাহায্য করে গেল। এমন এক গডের ধারণা দিলো, যে গড কোনো নিয়মকানুন আরোপ করেন না। আপনি নিজে যা বুঝবেন, তাই ধর্ম (ধর্ম যার যার)।** ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের কফিনে শেষ পেরেক বলা যেতে পারে। আলোকায়নের বিরোধিতা করতে গিয়ে আলোকায়ন যুগের ব্যক্তিবাদ (individualism)-কেই আরো ঘনীভূত করল রোমান্টিকতা। বলা হল:

- ধর্ম যার যার বুঝমতো। যে যা বোঝে, সেটাই ধর্ম।
- অন্যের আবেগকে সম্মান করা
- প্রত্যেকের মত প্রকাশের অধিকার
- ঐতিহ্য-প্রথার নিয়ন্ত্রণকে আরো অস্বীকার

আসল কথা হলো, ইউরোপ-আমেরিকায় ক্যালভিনিজম নামে প্রোটেস্ট্যান্টদের একটা ধার্মিক মতবাদ বেশ প্রসার পাচ্ছিল। একই সাথে যুক্তি-স্বাধীনতা-সমতা এবং ধর্মকে প্রাসঙ্গিক করে তোলার দরুন ক্যালভিনিজম খ্রিস্টদুনিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল, যা (ধর্মীয় কর্তৃত্ব অস্বীকারের) এনলাইটেনমেন্ট প্রকল্পকে বাধাগ্রস্ত করছিল। রোমান্টিকতা এসে আটকাল ক্যালভিনিজমকে। ইসলামোফোবিয়া থেকে বাঁচতে আমরা যেমন অনেকে ইসলামকেই কাটছাঁট করে ফেলি, তেমনি এ পর্যায়ে মডার্নিস্ট খ্রিস্টবাদ জন্ম নেয়। আত্মার গভীরে আত্মিক বিষয়ের যে অনুভূতি, তাই ধর্ম। খ্রিস্টবাদের আজ তো এই অবস্থা যে, সমকামী পাদরিও তারা মেনে নিয়েছে।

এরপর এলো আধুনিকতা। এনলাইটেনমেন্টের গাছটা আরো ডালপালা মেলে দিলো, ডালে ডালে ধরল ফল। আধুনিকতার শুরুটা যে ঠিক কখন, সে ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। কেউ বলেন সেই রেনেসাঁর সময়ই আধুনিকতার যুগ শুরু হয়ে গেছে। কেউ বলছেন ১৭শ-১৮শ শতকের এনলাইটেনমেন্ট থেকেই আধুনিকতার শুরু। কেউ আরো কেঁচে এনেছেন, বলছেন আধুনিক যুদ্ধের (দুটো বিশ্বযুদ্ধ) সময়টাই মডার্নিটি। সাধারণভাবে ১৯শ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের শুরুকে (১৮৭০-১৯৩০) মডার্নিটি ধরা হয়। আসলে একেক ফিল্ডে কথিত 'আধুনিক চিন্তাকাঠামো' একেক সময়ে এসেছে। মডার্নিটি হলো সময়কাল, আর মডার্নিজম হলো দৃষ্টিভঙ্গিটা। তাই ব্যাপারটাকে সময়কাল দিয়ে না বুঝে ঠিক কী কী বস্তুকে 'মডার্নিজম' বলা হচ্ছে, তা বুঝলে আপনি নিজেই আঁচ করতে পারবেন—কখন থেকে ইউরোপ মডার্নিটিতে প্রবেশ করেছে। মডার্নিজম বা আধুনিক চিন্তার বিশিষ্ট দিকগুলো হলো—

১. রাষ্ট্রনীতিতে

- রাজতন্ত্রের বদলে গণতন্ত্রের জনপ্রিয়তা
- সাংবিধানিক ক্ষমতা ভাগাভাগি (আইনসভা, বিচারবিভাগ, নির্বাহী বিভাগ)
- যুদ্ধ-সংঘর্ষের বদলে ফর্মাল রাজনৈতিক সংগ্রাম (মাঠের রাজনীতি) ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা
- জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থা

২. অর্থব্যবস্থায়

» জটিল অর্থনীতি
» কৃষির বদলে বৃহৎ শিল্পায়ন
» মার্কেট ইকোনমি
» অর্থনীতির বৈশ্বিক রূপ (economic globalization)
» ব্যাপক শহরায়ণ ও শহরে বসবাসে আগ্রহ
» পুঁজিবাদ ও অধিক ভোগের মানসিকতা

৩. বিশ্বাসগত

» দুনিয়ার প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি যে, মানব প্রচেষ্টা (বিজ্ঞান-প্রযুক্তি) দিয়ে দুনিয়া বদলে দেওয়া সম্ভব। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে দুনিয়াকে আরো ভোগ্য করা সম্ভব।

» প্রগতিতে (constant progress) বিশ্বাস। গতকালের চেয়ে আজ মানবজাতি যেকোনো দিক দিয়েই (প্রযুক্তি, রাজনীতি ও নৈতিকতায়) আরো বেশি উন্নত। আমরা এভাবে উন্নত হতেই থাকব।

» ধর্মীয় টেক্সটের সত্যতা অস্বীকার। সত্যের মাপকাঠি হিসেবে ওহি এবং ওহির ব্যাখ্যাদাতাদের কর্তৃত্ব বাতিল। মানুষের নিজ নিজ বিচারবুদ্ধিই সত্যের পথ।

» নতুন যা কিছু, পুরোনোর চেয়ে (ধর্ম) তা কল্যাণকর।

৪. ব্যক্তি পর্যায়ে

» গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন ও শক্তিশালী সমাজের বিপরীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা
» আগের কমন নৈতিকতা ও মূল্যবোধ (ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক) থেকে সরে আসা
» মানুষে-মানুষে এবং মানবসমাজে বিচ্ছিন্নতা বেড়ে যাওয়া

৫. জ্ঞানগত

» যা ইন্দ্রিয় দ্বারা বোঝা যাবে, তাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য তথ্য। অতীন্দ্রিয় বা মেটাফিজিক্যাল কোনোকিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষের জ্ঞানের ক্রমবর্ধমান উন্নতির ফলে একসময় ধর্ম হারিয়ে যাবে; দর্শন ও অপরাপর মানবিক জ্ঞান ক্রমেই বস্তুবাদী হয়ে উঠবে এবং পুরো মানবজ্ঞানই বিজ্ঞানের অধীনে চলে আসবে।

» ২ ধরনের কথার অর্থ হয়— যুক্তি-বিশ্লেষণ (analytical statement) আর

পর্যবেক্ষণলব্ধ (empirical statement); এই ছকের বাইরে বাকি সব অনর্থক।

» প্রতিটি বিষয়কে আবার বিচার করতে হবে, দেখতে হবে কী কী প্রগতিকে বাধা দিচ্ছে, তদস্থলে নতুন আইডিয়া আনতে হবে, যা বাধাদানকারী বিষয় (ধর্ম)-কে রিপ্লেস করবে। যেমন :

- মানুষের উৎপত্তির উত্তর দেবে ডারউইনবাদ
- প্রতিটি হিউম্যান সায়েন্সকে 'বিবর্তন' দিয়ে বুঝতে হবে
- বিশ্বের উৎপত্তির উত্তর দেবে আধুনিক কসমোলজি
- আইন-নৈতিকতার শূন্যস্থান পূরণ করবে লিবারেল ইথিক্স
- আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন পূরণ করবে মেডিটেশন, স্ট্রেস রিলিভিং কাজকর্ম
- আত্মার প্রশ্নের জবার দেবে আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও নিউরোসায়েন্স।

চাই এই নতুন রিপ্লেসমেন্ট যতই হাস্যকর শোনাক, যতই অযৌক্তিক হোক। আমেরিকান evolutionary biologist ও জিনবিজ্ঞানী Richard Lewontin-এর সরল স্বীকারোক্তি—

> *আমরা সর্বদা বিজ্ঞানের পক্ষ নিই, যদিও বিজ্ঞানের কিছু কিছু দাবি হাস্যকর; যদিও বিজ্ঞানীমহল মেনে নিয়েছেন কিছু ছেলে-ভোলানো গাল্পগল্প, যার প্রমাণ নেই। কারণ আমরা আগে থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রকৃতিবাদের কাছে। ব্যাপারটা এমন নয় যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের কোনোভাবে বাধ্য করে জাগতিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে; বরং আগে থেকেই (a priori adherence) বস্তুগত কারণ খোঁজার ওয়াদা আমাদেরকে ঠেলে দেয় এমন কিছু উপকরণ ও ধারণা তৈরির দিকে– যা শুধু বস্তুগত ব্যাখ্যাই উৎপাদন করবে। সে ব্যাখ্যা যতই কাণ্ডজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক হোক, আমজনতার কাছে যতই দুর্বোধ্য ঠেকুক। আর* ***যেহেতু আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নেব না, সুতরাং, বস্তুবাদই শেষকথা।*** [১]

যেকোনো মূল্যে ধর্মের আবেদন-কর্তৃত্ব-অংশগ্রহণকে বাতিল করে জীবনকে ভোগ করে যাওয়ার এই পুরো চিন্তাকাঠামোটাকে বলা হচ্ছে আধুনিকতা বা আধুনিক চিন্তা। এভাবে চিন্তা করতে পারলে আপনি আধুনিক, না পারলে আপনি মধ্যযুগীয়-জঙ্গি।

---

[১] Richard C. Lewontin (1997), Billions and Billions of Demons (a review of Carl sagan's The Demon-Haunted World), The New York Review

খ্রিষ্টান ধর্মতাত্ত্বিক থমাস ওডেনের মতে মডার্নিটির ৪টি বেসিক নীতি হলো—

১. Moral relativism : মানে, নৈতিকতার স্কেল ফিক্সড নয় (যেমনটা ধর্ম বলতে চায়); বরং ব্যক্তিভেদে, সমাজভেদে, অবস্থাভেদে, যুগভেদে ভালোমন্দের ধারণা বদলায়। যেমন : ব্যভিচার-সমকামিতা এখন ভালো।

২. Autonomous individualism : আমার নৈতিকতা (ধর্ম) কেউ ঠিক করে দেবে না। আমি নিজেই নিজের বৈধ-অবৈধ ঠিক করব। আমি আমার ভালোমন্দের নির্ধারক।

৩. Narcissistic hedonism : আত্মপ্রেম; নিজেকে খুশি করার, খুশি রাখার নিরন্তর চেস্টা। শিশ্নোদরপরায়ণ ভোক্তা।

৪. Reductive naturalism : যা কিছু দেখা যায়, শোনা যায়, ধরা যায় বা অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, তার বাইরে কিছুই নেই।

মডার্নিটির বিপরীত শব্দ হলো ঐতিহ্য (Tradition)। মূল কথা হলো, আগে যা ঘটেছে তা হলো ট্রাডিশন বা প্রথা। প্রথা (মূলত ধর্ম) সমাজকে এগোতে দেয় না, আটকে রাখে। আজকের দিন অতীতের চেয়ে উত্তম, ভবিষ্যৎ আজকের চেয়ে উত্তম। অতীতের চেয়ে আজ যেমন জ্ঞানবিজ্ঞানে মানুষ উন্নত হয়েছে, তেমনি নৈতিকতায়ও উন্নত হয়েছে। আজকের সেক্যুলার-লিবারেল নৈতিকতা আগের ধর্মের নৈতিকতা থেকে উত্তম এবং যত দিন যাচ্ছে আমরা উত্তম হচ্ছি। প্রথাকে ঝেড়ে না ফেলতে পারলে আমরা উন্নত হতে পারব না। **ভবিষ্যতে আমরা আরো উন্নত হতে থাকব সমকাম মেনে নিয়ে, ব্যক্তিস্বাধীনতা মেনে নিয়ে, নারীবাদ-বিজ্ঞানবাদ মেনে নিয়ে, ফ্রি-সেক্স মেনে নিয়ে।**

আধুনিকতাবাদ একটা স্বতন্ত্র দ্বীন, যা বাকি সব ধর্মকে অকেজো-সেকেলে-বাতিল সাব্যস্ত করে। এমনকি নৈতিকতার ক্ষেত্রেও ধর্মকে নিষ্প্রয়োজন সাব্যস্ত করে নিজেকে ধর্মের আসনে বসায়। মানুষের চিন্তাজগতে ধর্মের আবেদন চিরতরে শেষ করে দেয়। এটা এমন ধর্ম যার সমালোচনা সহ্য করা হয় না। এই ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করলে আপনার মনুষ্যত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠবে। আপনি মধ্যযুগীয়, বর্বর, বিপজ্জনক এবং পটেনশিয়াল জঙ্গি।

পাঠক এবার মিলিয়ে নিন : সেই রেনেসাঁ থেকে শুরু, যাকে বলা হচ্ছিল ir-religion বা অধর্ম। পরের ধাপে এনলাইটেনমেন্টের মূল আহ্বান secularization বা

ধর্মকে সব জায়গা থেকে হটিয়ে দেওয়া। রোমান্টিক যুগে এসে ধর্মকে নিছক অনুভবের জায়গায় আটকে দেওয়া। আর মডার্নিটিতে এসে নৈতিকতা ও জ্ঞানতত্ত্বের যে প্রশ্নগুলোর উত্তর ধর্ম ছাড়া আর কারো কাছে ছিল না, সেগুলো থেকেও ধর্মকে বিতাড়িত করল ইউরোপ। **ইউরোপের যুদ্ধটাই ধর্মের সাথে। ধর্মের সাথে ব্যবসায়ীদের হাজার বছরের সংগ্রাম শেষে আজকের আধুনিক ইউরোপ আমরা পেলাম। আবার এভাবেও বলতে পারেন ক্যাথলিক কর্তৃত্বের সাথে বণিক সম্প্রদায়ের (প্রধানত ইহুদি) লড়াইয়ের দ্বারা নতুন এক ব্যবসাবান্ধব পৃথিবী তৈরি, পুঁজিবাদী জুলুমের কারাগার তৈরি।** মানব-রচিত (সেন্টপল) খ্রিষ্টধর্মের অন্যায়-দুর্নীতির নাগপাশ ছিন্ন করার একটা যৌক্তিক প্রেক্ষাপট নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু **সবকিছু ছাপিয়ে যা প্রকট হয়ে ওঠে তা হলো—'ধর্মীয় নৈতিকতা অস্বীকার'-এর মাধ্যমে অবাধ ভোগ-লালসার দরজা খুলে দেওয়া। ক্রেতার অবাধ ভোগ তথা বিক্রেতার অবাধ ব্যবসাকে যা যা বাধাগ্রস্ত করে, সবকিছুকে অযৌক্তিক ও অজ্ঞতা বলা হলো।** আর মডার্নিটির উদ্দেশ্যই হলো সকল 'অজ্ঞতা-কুসংস্কার' থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দেওয়া। এজন্যই আপনি দেখবেন ব্যবসায়ী-চালিত দেশ (১ম বিশ্ব) সবাইকে লিবারেট করে বেড়ায়।

প্রশ্ন

পশ্চিমা সভ্যতা বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে প্রভূত উন্নতি করেছে (সে যেভাবেই হোক, টাকার উৎস যা-ই হোক)। তাদের জীবনযাত্রা সহজ হয়েছে, নতুন নতুন পণ্যসেবা ভোগ করছে তারা, সকল ভিন্নমত সফলভাবে দমন করে মানুষের চিন্তায় সমতা এনেছে, ফলে একটা টেকসই সিস্টেম ডেভলপ করেছে। এসব দেখে নেটিভদের চোখ গেছে ধাঁধিয়ে। যে নেটিভদের (উপনিবেশ-শাসিত) চুষে খেয়ে দুর্ভিক্ষে মেরে আজ ১ম বিশ্ব '১ম বিশ্ব' হয়েছে। তাদের উত্তরপুরুষ আমরা সেই জোঁকের প্রতি মুগ্ধ-কৃতজ্ঞ। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এই উন্নতি দেখে আমরা ভাবছি, হুবহু ওদের অনুকরণ করলেই বুঝি আমরাও ওদের মতো লাইফস্টাইল পাব। ওদের মতো আইন, ওদের মতো রাষ্ট্র, ওদের নৈতিকতা, ওদের পরিবার-কাঠামো। ওরা যেমন ধর্মকে ঝেঁটিয়ে আজ উন্নত হয়েছে, আমাদেরকেও আমাদের ধর্মকে হটাতে হবে। ধর্মান্ধ না হয়ে 'আধুনিক' হতে হবে, 'আলোকিত মানুষ চাই'। এজন্য আছে প্রথম 'আলো'। এনলাইটেনমেন্টের ফেরিওয়ালা।

৩টা ভুল আছে এখানে।

প্রথমত, হিউম্যান সায়েন্স (মানবিক বিভাগ) আর ন্যাচারাল সায়েন্স (বিজ্ঞান বিভাগ) এক নয়। বিজ্ঞান বিভাগে যেমন ২+২=৪, ওপর থেকে ফেললে নিচেই পড়বে, ২ অণু হাইড্রোজেন আর ১ অণু অক্সিজেন মিলে যেমন পানিই হবে। হিউম্যান সায়েন্স ব্যাপারটা এমন ধ্রুব নয়। মানবমন, পরিবার, সমাজ, চিন্তা এগুলো অনেক বেশি জটিল। এগুলোর ক্ষেত্রে ছোট্ট স্যাম্পলের ওপর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ

করে প্রাপ্ত ফলকে পুরো মানবজাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলে তা সত্য থেকে দূরেই নিয়ে যায়। **আমরা পশ্চিমা সামাজিক বিজ্ঞানকে পশ্চিমা প্রকৃতিবিজ্ঞানের মতোই অকাট্য সত্য মনে করি, কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানগুলো পশ্চিমা সমাজের অভিজ্ঞতা বা ফলাফল।** একই সূত্র চীন বা মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রেও সত্য হবে, তা নয়; কিন্তু আমরা ইউরোপীয় চিন্তাপদ্ধতি, তাদের নৈতিকতা, তাদের রাষ্ট্রচিন্তা, তাদের আইন জোর করে আমাদের দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি। যেমন : আধুনিককালে নারী সকল সমাজেই নিগৃহীত হয়েছে, এটা সত্য। কিন্তু পশ্চিমা স্টাইলের নারীবাদই যে সকল সমাজের জন্য সমাধান, এটা বাড়াবাড়ি। কেন আফগান নারীদেরকে ইউরোপীয় নারীদের মতোই স্বাধীন হতে হবে? তারা যেমন থাকতে চায়, থাকতে দিন না। না, তা হবে না। তাদেরকে স্বাধীন হতেই হবে, আফগান পরিবারগুলোও ইউরোপের পরিবারের মতো ভেঙে দিতে হবে। পরিবার যে চাহিদাগুলো মেটাত, সেগুলো নিয়ে ১ম বিশ্ব ব্যবসা করবে। আফগান নারীদেরকে কর্মক্ষেত্রে এনে প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে দিতে হবে। যাতে কম বেতনে শ্রম পাওয়া যায়, গার্মেন্টস সেক্টরের মতো সস্তায় শ্রম মেলে। **এনলাইটেনমেন্টকে ব্যাবহারিক প্রয়োগ করার দরুন সমাজে অকস্মাৎ শূন্যতা দেখা দেয়। আগে শ্রেণি দ্বারা, নানান প্রতিষ্ঠান দ্বারা (ধর্ম, পরিবার, দাসপ্রথা, ভূস্বামী) যে সমাজের শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত হতো, নতুন সমতাভিত্তিক সমাজে এইসব নিয়ামকগুলো উপেক্ষিত হলো। এনলাইটেনমেন্ট-পরবর্তী মডার্নিটিতে এইসব সামাজিক সমস্যা নিরসনের জন্য নতুন এক সাবজেক্টই তৈরি হলো, যাকে আমরা sociology নামে চিনি। সাবজেক্টটাই হলো ধর্মকে হটিয়ে কীভাবে শূন্যতা পুরণ করা যায়, তা নিয়ে। সুতরাং,, এর গবেষণাগুলো কেমন হবে তা বলাই বাহুল্য।**

আর দ্বিতীয় ভুলটা হলো, ধর্ম-প্রথাকে ঝেড়ে ইউরোপীয় মানে 'আধুনিক' হওয়া। ধর্ম নিয়ে ইউরোপের অভিজ্ঞতা আর মুসলিম বিশ্বের অভিজ্ঞতা তো এক নয়। তাহলে একই ফর্মুলা কেন প্রয়োগ করতে হবে? **যেসময় ওদের ধর্ম ওদের গলার কাঁটা হয়ে আছে, ঠিক একই মুহূর্তে আমাদের ধর্ম আমাদেরকে সুপার পাওয়ার করে দিয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, আইনের শাসন, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ, নারীবৈষম্য বিলোপ, দাসদের অবস্থার মানবিকিকরণ, ভারসাম্যপূর্ণ সরকারব্যবস্থা এসব তো আমাদেরকে আমাদের ধর্মই দিয়েছে।** ইউরোপীয় কায়দায় 'ধর্ম থেকে মুক্তি' কি দরকার ছিল আমাদের? যখন আমাদের আইনে ধর্ম ছিল, রাষ্ট্রে ধর্ম ছিল, পরিবারে-সমাজে-বাজারে-আদালতে ধর্ম ছিল, তখনই আমরা শ্রেষ্ঠ ছিলাম।

আমাদের তো শ্রেষ্ঠ হতে ধর্মকে ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। ওরা গলার বেড়ি খুলেছে, আর ওদের দেখাদেখি আমরা খুলেছি সোনার হার। ওদের ধর্ম অজ্ঞতা-কুসংস্কার, কারণ খ্রিস্টবাদসহ যেকোনো বাতিল মতবাদের ভিত্তিই হলো অলীক কল্পকাহিনি-কেরামতি। আর আমাদের ধর্ম শিখিয়েছে জ্ঞান-যুক্তি-বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ। বিনা যাচাইয়ে মেনে নেওয়াকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। কেবল আল্লাহ-রাসুল যা বলেছেন (যা তাদের কথা হিসেবে প্রমাণিত ও যাচাইকৃত), তা ছাড়া কোনো অলৌকিকত্ব শরিয়তের অংশ নয়, বিধান নয়। ইসলাম যৌক্তিকভাবে 'প্রমাণিত' ওহি, বিচারবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্তজ্ঞানের সম্মিলন। বাছবিচারহীন দাবিকৃত ওহি ও তার কর্তৃপক্ষের মনগড়া ফাতওয়া যেমন সমাধান নয়, তেমনি কেবল ক্ষীণদৃষ্টি ইন্দ্রিয় ও মানবিক-বিচারবুদ্ধি থেকে পাওয়া জ্ঞানও সমাধান নয়। খ্রিস্টবাদের মতো ইসলামকেও অজ্ঞতা-কুসংস্কার-অযুক্তি মনে করাটা ইসলাম সম্পর্কেই অজ্ঞতার প্রকাশ।

ইউরোপকে যদি ধর্মকে ফেলে দিয়ে উন্নত জীবন খুঁজতে হয়, আমাদেরকে তাহলে উন্নত জীবন খুঁজতে হবে ধর্মের কোলে ফিরে গিয়ে। আমাদের...

» জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা

» দ্বিমুখী সম্পদ-প্রবাহের দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচন

» নৈতিকতা পরিচালিত জবাবদিহি-তাড়িত অফিস-আদালত-বাজার

» স্ট্রেসমুক্তির জায়গা প্রশান্তিময় পরিবার

» অপরাধের শাস্তি দেবে আদালত আর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করবে সমাজ। সেই ফাংশনিং সমাজ

» মানুষের সামগ্রিক সংজ্ঞা ও সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিতকারী শিক্ষা

» জালিম পুঁজিবাদের থাবামুক্ত সত্যান্বেষী জ্ঞান-বিজ্ঞান

» নীতিবোধ-চালিত মানুষ (নট ভোগ-তাড়িত)

» প্লেটোর তথাকথিত আদর্শ-রাষ্ট্র ও 'জ্ঞানী-রাজা'র শাসন

এগুলো আমরা পেছনে রেখে এসেছি। দিন যত যাচ্ছে উন্নত হচ্ছি, এটা ইউরোপের ইতিহাস, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর '১ম বিশ্ব' হয়ে ওঠার ইতিহাস। মুসলিম **বিশ্বের ইতিহাস হলো : আমরা উন্নত ছিলাম, দিন যত যাচ্ছে তত নতজানু হচ্ছি,**

অবনত হচ্ছি, গোল্লায় যাচ্ছি। মদিনায় সিনেমা-হল হচ্ছে, মুসলিম দেশে ব্যভিচার-সমকামিতা বৈধ হচ্ছে। যুবসমাজের মাঝে অপরাধ-মাদক-বেকারত্ব-হতাশা বেড়েই চলেছে। **যত দিন যাবে, ১ম বিশ্বের ব্যবসার বস্তু হতেই থাকব, আমাদের রুচি বদলে দিয়ে তাদের পণ্য কিনতে বাধ্য করবে। গরিব আরো গরিব হতেই থাকবে, ধনীরা হবে আরো ধনী। মডার্নিজম আমাদের সমাধান নয়।**

তার মানে ৩য় ভুলটা হচ্ছে, দিন যত যাচ্ছে, আমরা সব দিক দিয়েই উন্নত হচ্ছি, তা কিন্তু মোটেও নয়। **বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে উন্নতি মানেই নৈতিকতা-মূল্যবোধে উন্নতি নয়; বরং কমনসেন্স ও অভিজ্ঞতা এটাই বলে যে— 'তামার বিষে' স্বভাব নষ্ট হয়, আর 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' হয়। সুতরাং,, ১ম ও ৩য় বিশ্ব, উভয়েরই নৈতিকতা যত দিন যাচ্ছে, কমছে।** ইতিহাসও তাই বলছে—

- ইবনু খালদুন বিভিন্ন আরব সভ্যতার ওপর গবেষণা করে সাধারণ ফর্মুলা বের করেছেন : রুক্ষ বেদুইন জীবনযাপনে ধর্ম ও নীতিবোধ প্রবল থাকে, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় বিভবশক্তি মজুত হয়। রাজ্য স্থাপনের পর যত শহরায়ণ, আরাম-আয়েশ, বিলাসদ্রব্য বাড়ে; তত অনৈতিক কার্যকলাপ বেড়ে যায়। শেষে গিয়ে সাম্রাজ্যটা ধ্বংস হয়, রুক্ষ-ধার্মিক অন্য কোনো জাতির হাতে, তারা আবার একই চক্রে পড়ে যায়।

- নৃতাত্ত্বিক Joseph Daniel Unwin MC (1895–1936) প্রায় ৫ হাজার বছরের ইতিহাস ঘেঁটে ৮৬টি আদিম গোত্র ও ৫টি বৃহৎ সভ্যতার ওপর একটি পর্যালোচনা করেন। *Sex and Culture* (1934) বইয়ে তিনি ফলাফল তুলে ধরেন বিস্তারিত আকারে। তার মতে, প্রতিটি সমাজ শুরুতে যৌনতা ও নৈতিকতার ব্যাপারে কঠোর থাকে, সমৃদ্ধির চূড়ায় পৌঁছে তাদের ভেতরে শুরু হয় নৈতিক অবক্ষয়। ব্যভিচার-সমকাম-প্রকাশ্য অশ্লীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকার অর্থ সভ্যতার পতন আসন্ন।

অর্থাৎ **সভ্যতার উন্নতি ও নৈতিকতার উন্নতি বস্তুত ব্যস্তানুপাতিক। তার মানে, মডার্নিজম ওদেরও সমাধান নয়। মানবজাতির সমস্যার সমাধান একমাত্র ইসলাম।** আগের দুই গবেষণার সাথে মিলিয়ে নিন। মডার্নিজমের এই পুরো ধারণাটা বিকশিত হয়েছে ভোক্তা-পুঁজিবাদী কালচারে। ১৯৬০-এর দশকে ভোগবাদী মানসিকতার সাথে মডার্নিজমের চূড়া একাকার হয়ে গেছে। এর ফলে পশ্চিমা সমাজ আজ যে অবস্থানে এসে পৌঁছেছে, তা হলো—

পরিবার-ব্যবস্থার ভাঙন

» ১৯৭০ সালে আমেরিকায় লিভ-টুগেদার পরিবারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৫ লাখ, ২০০২ এসে সেটা হলো ৪৯ লাখ।[১] ১ম বাচ্চা জন্মের পর এসব পরিবার টেকে ৩৫ %, মানে ভেঙেই যায় ৬৫ % (Donahue et al, 2010)।

» আমেরিকার ৫০ % ১ম বিয়ে বিচ্ছেদে পর্যবসিত হয় (Bramlett & Mosher, 2001)। রিসার্চ জানাচ্ছে, মোট ডিভোর্সির ৪২ %-এরই বিবাহিত জীবনে ব্যভিচারের ইতিহাস আছে (Janus, 1993)।

জনসংখ্যা হ্রাস

» একটা দেশের জনসংখ্যা স্থির রাখতে প্রয়োজনীয় জন্মহার ২.১ %। অর্থাৎ প্রতি নারীকে তার জীবদ্দশায় ২.১ জন সন্তান জন্ম দিতে হবে, নইলে সে দেশের জনসংখ্যা কমে যাবে। সভ্য দেশগুলোর জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে দ্রুত। ইউরোপীয় ইউনিয়নের গড় ১.৬ %, আমেরিকার ১.৭৭ %। মূল কারণ গত ৫০ বছরের নারীবাদী এজেন্ডা। অনেক উন্নত দেশকেই (South Korea, Singapore, France, Australia, Canada, Russia, Poland) বিয়ে ও সন্তান জন্মদানকে উৎসাহিত করতে হচ্ছে ট্যাক্স মাফ, বাড়িভাড়া প্রদান, গণপরিষেবায় বিশেষ ছাড়, বেবি-বোনাস ইত্যাদি অফারের দ্বারা।[২]

» আমেরিকাতে প্রতি বছরে প্রায় ১০ লক্ষ গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে, যার এক তৃতীয়াংশই গর্ভধারণের ৬ষ্ঠ সপ্তাহের পর।[৩] ব্রিটেনে টোটাল গর্ভধারণের ২৪ % ফেলে দেওয়া হয় (induced abortion)।[৪]

---

[১] US Census Bureau. 2003. 'Unmarried-Couple Households, by Presence of Children : 1960 to Present,' Table UC-1, June 12, 2003.

[২] Neil Howe (Mar 29, 2019), Nations Labor To Raise Their Birthrates, Forbes

[৩] U.S. Abortion Statistics [abort73.com]

[৪] U.K. Abortion Statistics, Department of Health and Social Care (England and Wales), National Services Scotland, and the Department of Health (Northern Ireland).

মনোবিকল ভবিষ্যৎ-প্রজন্ম

» **আমেরিকায় মোট জন্মের ৪১% শিশুই** বিয়ে বহির্ভূত বাবা-মায়ের সন্তান। ২০১৬ সালে ইউরোপ-আমেরিকার অর্ধেক শিশু বিয়ে-ছাড়া (out-of-wedlock) জন্ম।[১]। যে পরিবারের ৬৫%-ই ভেঙে যায়, ভাঙার জন্যই যার সৃষ্টি। যতদিন ভালো লাগবে একসাথে থাকব, ভালো না লাগলে থাকব না।

» এসব বিচ্ছিন্ন পরিবারের সন্তানদের—

- স্বাস্থ্য ২০% কম।
- আচরণগত সমস্যা থাকে বেশি। সাইকোলজিস্টের সাহায্য প্রয়োজন পড়ে ৩০০% বেশি।
- আত্মহত্যা-প্রচেষ্টার সম্ভাবনা দ্বিগুণ।
- স্কুলে মারপিট ও চুরিচামারিতে লিপ্ত হবার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি। সিঙ্গেল মা-বাবা ও লিভ-টুগেদারের বাচ্চাদের ৪২%-ই স্কুলে মারপিট করে।
- স্কুলে রেজাল্ট খারাপ হয় বেশি।
- স্কুল থেকে ঝরে পড়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণ।
- কারাগারে যাবার সম্ভাবনা নর্মাল পরিবারের চেয়ে ১২ গুণ বেশি।[২]
- ভবিষ্যতে কিশোর অপরাধ ও প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধের প্রবণতা (Farrington, 1990)।

ব্রিটেনে এক-তৃতীয়াংশ বাচ্চা এমন, ব্রোকেন ফ্যামিলির।[৩] আমেরিকার ৫০% শিশু বাপ-মায়ের ডিভোর্স দেখে। এই ৫০%-এর ৫০% আবার বাপ-মায়ের ২য়

---

[১] https ://twitter.com/spectatorindex/status/988307897955237888?lang=en

[২] Wisconsin Department of Health and Social Services, Division of Youth Services, 'Family Status of Delinquents in Juvenile Correctional Facilities in Wisconsin' (1994).

[৩] STEVE DOUGHTY (2010). Nation of broken families : One in three children lives with a single-parent or with step mum or dad. THE DAILY MAIL. Study by Office for National Statistics

বিয়েও ভাঙতে দেখে। ৪২ % ডিভোর্সের কারণ ব্যভিচার।

যৌনবিপ্লব

» আমেরিকার ৩.৫ % মানুষ সমকামী হিসেবে নিজেদের আইডেন্টিফাই করে, অথচ শিশু ভিকটিমদের এক-তৃতীয়াংশই ছেলে বাচ্চা। তার মানে ১-৩ % মানুষ দায়ী ৩৩ % শিশুধর্ষণের জন্য। এ-সংক্রান্ত সব রিসার্চও সরিয়ে ফেলা হয়েছে নেট থেকে।[১]

» ইউরোপের ৯৪ % সমকামী অ্যান্টি-রেট্রোভাইরাল প্রোফাইল্যাক্সিস নেবার পরও, গে-লেসবিয়ানদের জন্য আলাদা কেয়ার আলাদা ডিপার্টমেন্ট করার পরও বছরে ৩০-৪০ হাজার এইডস কেস সমকামীদের ভেতর থেকে।

» টপ ৫টা পর্নসাইট প্রতিদিন ২০ কোটি বার ভিজিট হচ্ছে। ১৩-২৪ বছর বয়েসী ৬৪ % তরুণ-তরুণী সপ্তাহে কমসে কম ১ বার ইন্টারনেটে পর্ন খোঁজে। ডার্ক ওয়েবে শিশুপর্ন, শবদেহপর্ন কী নেই। ক্রমবর্ধমান যৌন অপরাধের জন্য দায়ী বছরে ১০ হাজার কোটি ডলারের এই পর্নো ইন্ডাস্ট্রি।

» শুধু জার্মানিতে প্রায় ৪ লক্ষ পতিতা দৈনিক ১ মিলিয়ন পুরুষকে যৌন সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে।[২]

» ২০১৮ সালে এসে ILO জানাচ্ছে লাতিন আমেরিকা থেকে ইউরোপ-আমেরিকায় পাচারই হচ্ছে ২০ লক্ষ শিশু।[৩] আর লাতিন আমেরিকার ভেতরে আরো ৪০ লক্ষ পথশিশু যৌনপেশায় নিয়োজিত।[৪]

» আমেরিকার ১ম শিশুদের ৪৮ % অবিবাহিত মায়ের সন্তান।[৫]

---

[১] Freund, K., & Watson, R. J. (1992). The proportions of heterosexual and homosexual pedophiles among sex offenders against children : an exploratory study. Journal of sex & marital therapy, 18(1), 34–43. [resulting proportion of true pedophiles among persons with a homosexual erotic development is greater than that in persons who develop heterosexually.]

[২] Prostitution in Germany : A giant Teutonic brothel, The Economist (Nov 16th 2013)

[৩] Child Sex Trafficking In Latin America, United Nations Human Rights Council.

[৪] Ann Barger Hannum. ReVista : Harvard Review of Latin America. (Winter 2002)

[৫] Knot Yet : The Benefits and Costs of Delayed Marriage in America, a new

» ব্রিটেনের ৮১% গর্ভপাত করে অবিবাহিত মেয়েরা।[১]

» ব্রিটেনে প্রতি চার জন নারীর মধ্য থেকে অন্তত একজন নারী অফিস-সেক্স করে।[২]

প্রযুক্তির অপব্যবহার

» আধুনিকতার আইডিয়া (জাতিরাষ্ট্র, উগ্র জাতীয়তাবাদ, ইউরোসেন্ট্রিজম, শ্বেত-শ্রেষ্ঠত্ব, সেক্যুলারিজম-লিবারেলিজম চাপিয়ে দেওয়া, পুঁজিবাদের বিশ্বায়ন) **থেকে গত শতকে সবচেয়ে গণবিধ্বংসী যুদ্ধগুলো হয়েছে। দুটো বিশ্বযুদ্ধ, উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা, আরব-ইসরাইল সমস্যা, স্নায়ুযুদ্ধের অংশ (কোরিয়া-ভিয়েতনাম) মিলে গত শতকে নিহত হয়েছে ১৭-২৫ কোটি মানুষ।**[৩] আর এই শতকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে মারা গেছে ৬ মিলিয়ন।

» অস্ত্রবাণিজ্যে ৫টা টপ কোম্পানির মার্কেট ২০১৯ সালে ছিল ১৬৬ বিলিয়ন ডলার। টপ ২৫টা মিলে ৩৬১ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করেছে ২০১৮ সালে।[৪] একদিকে মহাকাশ গবেষণায় বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার খরচ করছে উন্নত দেশগুলো,[৫] আরেকদিকে প্রতিবছর ৯০ লক্ষ মানুষ এই দুনিয়ায় মারা যাচ্ছে না খেয়ে বা ক্ষুধাকেন্দ্রিক অসুখে।[৬] এই মুহূর্তে পৃথিবীর ১.০২ বিলিয়ন (১০২

---

report from the National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, the National Marriage Project at the University of Virginia, and the RELATE Institute.

[১] Abortion Statistics, England and Wales : 2019, Department of Health and Social Care (England and Wales) 2020

[২] Klein, L. B., & Martin, S. L. (2021). Sexual Harassment of College and University Students : A Systematic Review. Trauma, violence & abuse, 22(4), 777–792.

[৩] necrometrics.com

[৪] Global arms industry : Sales by the top 25 companies up 8.5 per cent; Big players active in Global South, Stockholm International Peace Research Institute (7 December 2020)

[৫] Space Market Research Reports & Consulting, MarketsandMarkets Research Private Ltd.

[৬] Mercy Corps : What you need to know about global hunger (2017 estimate).

কোটি) মানুষ ক্ষুধার্ত।[১] ১% মানুষের হাতে বিশ্বের ৫০% সম্পদ,[২] যা আরো বাড়ছে। গরিব আরো গরিব হচ্ছে।

» ২০২০ সালের অক্টোবর অব্দি আমেরিকা ৯৩৪ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে সামরিক খাতে। সেই আমেরিকারই ৩৮ মিলিয়ন মানুষ ওই বছর ক্ষুধায় কষ্ট করেছে। সেই আমেরিকারই ৩৭.২৫ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে (দিনে ৩৫ ডলার আয়) সেই বছর। সেই আমেরিকারই ১০% লোক মিনিমাম স্বাস্থ্যসেবাও পায়নি সে বছর, অথচ মঙ্গলে-চাঁদে বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। এবার ভাবেন বাকি দুনিয়ার কি কল্যাণ হচ্ছে।

অপরাধ বৃদ্ধি

» আমেরিকাতে প্রতি ৫ জনে ১ জন **হাইস্কুলের ছাত্রী** তাদের প্রেমিকের দ্বারা (dating partner) যৌন-নিগ্রহের শিকার।

» ২০-২৫% নারী তাদের **কলেজ জীবনে** ধর্ষণ কিংবা ধর্ষণচেষ্টার শিকার হচ্ছে।

» আমেরিকার **৮১% নারী যৌন হয়রানির শিকার, তার ৩৮% যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে কর্মস্থলে**

» পতিতাদের মাঝে ৭১% শারীরিক প্রহারের শিকার, আর ৬২% নিয়মিত ধর্ষণের শিকার। ৮৯% এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু তাদের আর উপায় নেই (Farley et al. 2003)।

নৈতিক প্রগতি (?)

» পশ্চিমা নৈতিকতার নতুন সংজ্ঞায়—অনাগত শিশু তো nonexistence। একজন nonexistence-এর ক্ষতির আশঙ্কায় জীবিত মানুষের হিউম্যান রাইটসে (পড়ুন 'ফুর্তিতে') হস্তক্ষেপ করা যাবে না।[৩] এই নৈতিকতায়

---

[১] UN Food and Agriculture Organization : 1.02 billion people hungry

[২] Half of world's wealth now in hands of 1% of population, The Guardian (Oct 2015)
Oxfam says wealth of richest 1% equal to other 99%, BBC (Jan 2016)

[৩] Stuebing অজাচার কেস। ২০০৮ সালে জার্মান ফেডারেল কোর্ট (সুপ্রিম কোর্ট)-এর ৭ জন বিচারকের ১ জন অজাচারের পক্ষ নেন। তার যুক্তি। সেক্যুলার লিবারেল নৈতিকতা এটাই

গর্ভপাত 'তেমন কিছু না'। আমেরিকার গর্ভপাতের এক-তৃতীয়াংশই হয় গর্ভধারণের ৬ষ্ঠ সপ্তাহের পর।[১]

» ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে এখন নবজাতক-হত্যার (after-birth abortion) বৈধতার আলাপ চলছে। বলা হচ্ছে, ভ্রূণ আর নবজাতকের মাঝে স্ট্যাটাসগত কোনো পার্থক্য নেই। যে যুক্তিতে গর্ভপাত করা যায়, সেই একই যুক্তিতে নবজাতককে হত্যাও করা যেতে পারে, কেননা দুটোর কোনোটাকেই Person বলে ধরা হয় না।[২]

» ফিনল্যান্ড, রোমানিয়া ও হাঙ্গেরিতে পশুকে আহত না করে যৌনসঙ্গম বৈধ।[৩] আমেরিকার Hawaii, Kentucky, Nevada, New Mexico, Ohio, Texas, Vermont, West Virginia, Wyoming এবং the District of Columbia-তে পশুমৈথুন আইনত বৈধ।[৪]

এনলাইটেনমেন্ট-মডার্নিটিতে খোদ পশ্চিমেরই মুক্তি মেলেনি। সেই ১৮-শ শতকের শেষেই এনলাইটেনমেন্ট চিন্তাধারার সমালোচনা শুরু হয়েছে, যাকে পরে নাম দেওয়া হয় কাউন্টার-এনলাইটেনমেন্ট। আসলেই আলোকায়ন মানবজাতির জন্য কল্যাণ বয়ে এনেছে কি না, তা নিয়ে কথা বলেছেন একাডেমিকরা। মডার্নিজম চিন্তার সমালোচনা হচ্ছে পোস্ট-মডার্নিজম শিরোনামে। আজ ৩য় বিশ্ব অন্ধভাবে ১ম বিশ্বের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে। আম গাছ লাগিয়ে কাঁঠাল খেতে চাইলে তো হবে না। **এনলাইটেনমেন্ট-মডার্নিটির সব কনসেপ্ট হুবহু কপি-পেস্ট করবেন, আর তার ফলাফল হুবহু নেবেন না, তাই কি হয়? নিজেদের এই প্রতিটি পরিণতির দিকেই ডাকছে ১ম বিশ্ব আমাদেরকে। তাদের প্রগতির যে ফর্মুলা, তার রেজাল্ট এই ঘুণেধরা নষ্ট সভ্যতা। বাঁচতে চাইলে এই কালো-সভ্যতার প্রতিটি উপাদানকে হয় ত্যাগ করুন, নইলে যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করুন; চোখ বুজে ঝাঁপ দেবেন না।**

---

[১] U.S. Abortion Statistics [abort73.com]

[২] Giubilini A, Minerva F (2013), After-birth abortion : why should the baby live?Journal of Medical Ethics 2013;39 :261-263.

[৩] The Animal Prostitution and Bestiality Brothels in Europe : The 50 Shades of Shame. sarahmaxresearch.com [June 27, 2017]

[৪] The dark truth about bestiality parties, Metro [Apr 2017]

আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইসলাম

মানুষের কিছু চিরন্তন প্রশ্ন আছে, যেগুলোর উত্তর সে খোঁজার চেষ্টা করে।

» আমি কে?

» আমি কোথা থেকে এলাম?

» আমার শুরু কী, শেষ কী?

» দুনিয়াতে আমার কাজটা কী?

» কেন আমি এখানে?

» আমি কোথায় যাব?

» কীসে আমার সার্থকতা?

সেরকম একটা মৌলিক প্রশ্ন—আমি কী? আমি কে? এইসব চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর নিজস্ব জ্ঞানের আলোকে মানুষ খুঁজেছে। 'জীবন-ভাবনা' বলতে পারেন এটাকে। জগৎ-ভাবনা বা বিশ্ব-ব্যাখ্যা বা ওয়ার্ল্ডভিউও বলা যায়। প্রতিযুগেই চিন্তাশীল মানুষ এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভেবেছে। একেই আমরা 'দর্শন' নামে পড়ি। অমুকের দর্শন, তমুকের দর্শন। মানে তাদের জগৎ-ভাবনা। সীমিত মানব-চিন্তন এ নিয়ে যা কিছু ভেবেছে, তা দুই ধারার বাইরে উত্তর দিতে পারেনি। মোটাদাগে দুটো মেইনস্ট্রিম পাওয়া যায় এই বিশ্ব-ব্যাখ্যার—বস্তুবাদ আর ভাববাদ।

এক. ভাববাদ : দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে আধ্যাত্মিকতার ভেতর এসবের উত্তর খোঁজা। এর মাঝেই প্রকৃত অর্থ তালাশ।

দুই. বস্তুবাদ : কেবল দুনিয়ার বস্তুগত ব্যাখ্যার ভেতরেই সত্যের খোঁজ। বস্তুগত বিষয়ের বাইরে এমন কিছুর অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন, যা অবস্তু।

রেনেসাঁ-এনলাইটেনমেন্ট-মডার্নিটি প্রভৃতি ধাপ পেরিয়ে গত ৭ শ' বছরে ইউরোপ তার চিন্তার অভিযাত্রায় আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে, তা হলো—বস্তুবাদ। **মানুষ-প্রকৃতি-বিশ্ব-জ্ঞান-মন ইত্যাদি সকল প্রশ্নের বস্তুবাদী সংজ্ঞাকে ভিত্তি ধরে নেয়া হয়েছে; কারণ বস্তু স্পষ্ট-সহজ-বোধগম্য।** আর বস্তুর বাইরে সকল কিছুর অস্তিত্বকে হয় অস্বীকার করা হয়েছে, বা অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। **পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, বিজ্ঞানবাদ, আধুনিক দর্শন, ইতিহাসবাদ (historicism)—সবই বস্তুবাদের সন্তান। উপনিবেশের মওকায় এই ইউরোপীয় চরম বস্তুবাদ পুরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে এই বস্তুবাদেরই জয়জয়কার। এই দুনিয়াটাই সব। জন্মেছো, ভোগ করো, ভোগেই সার্থকতা, এরপর মরে যাও, মৃত্যুর পর কিছু নেই।** সবকিছুর উত্তর খোঁজা হয়েছে বস্তুগত জিনিসের ভেতর। বিজ্ঞানও রাস্তা ঠিক করে নিয়েছে—'প্রকৃতিবাদ'। বিজ্ঞান বস্তুর ভেতরেই প্রতিটি বিষয়ের সত্য খুঁজবে। অতিপ্রাকৃতিক কিছু বিজ্ঞানের লক্ষ্যও নয়, টুলসও নয়। আমি কী?— দেখা যাক এই প্রশ্নের জবাব বস্তুবাদ কী দেয়?

প্রশ্ন : আমি কী?
বস্তুবাদ : আমি প্রকৃতির বেছে নেওয়া ফিটেস্ট বৈশিষ্ট্যের এককোষী প্রাণী থেকে বিবর্তিত এক উন্নত জানোয়ার। আর কিছু নই।

প্রশ্ন : তাহলে আমি যে ভাবি, কবিতা লিখি, মানবসেবা করি, গান গাই। আমার স্বপ্ন, সাধনা, প্রেরণা, আশা—এগুলো? এগুলো কী?
বস্তুবাদ : এগুলো কেবল আমাদের জটিল স্নায়ুতন্ত্রের কিছু কেমিক্যাল-ঘটিত ক্রিয়া-বিক্রিয়া। আর কিছু না। (বস্তু দিয়ে ব্যাখ্যা)

বলা হচ্ছে—ব্রেইনে ডোপামিন নামক কেমিক্যালের বান আর তার প্রতিক্রিয়ায় চোখ-মুখের পেশীর সংকোচন—এটাই হাসি-আনন্দ; এর বাইরে আর কিচ্ছু নেই। তাহলে এই আনন্দ'বোধ'-টা কী? এটা তো কেমিক্যালও নয়, পেশীও নয়। এই অনুভূতি'বোধ'টা করল কে? ঠিক ২:০০ টায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগকারী সোবহান

সাহেবের দেহ তো দেহই আছে। ১:৫৯ মিনিটে কী ছিল তার দেহে, যা ২:০১ মিনিটে আর নেই? কোষগুলো সবই তো তখনো সজীব। বস্তুবাদী পশ্চিমের জবাব হলো—এই বোধ, এই চেতনা, এই ভাব বলে আলাদা কিছু নেই। এগুলো এই ব্রেইন-কেমিক্যালেরই অংশ। হয় না ভাই, হিসেব মেলে না। মানুষ কী?—এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে না পারলে 'মানুষের সমস্যাগুলো কী কী' তা বোঝাও সম্ভব নয়, সমাধান কী হবে, তাও বাতলানো সম্ভব নয়। মানুষ কী?—**এই প্রশ্নের উত্তর যদি অসম্পূর্ণ-আংশিক-একপেশে হয়, তাহলে যত সমাধানই আপনি খাড়া করবেন সবই হবে অপূর্ণ-আংশিক-একপেশে,** যা কখনো কিছুটার সমাধান করবে, কখনো সমস্যাকেই আরো বাড়িয়ে তুলবে।

একটা সময় অব্দি ভাববাদ পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে। হাজার বছর ধরে জোর করে পরিয়ে রাখা ভাববাদের ঠুলি ইউরোপকে অতিষ্ঠ করে রেখেছিল। মধ্যযুগের পর থেকে ভাববাদের রাজত্ব কমতে থাকে। আর যাতে কোনোদিন এই ভাববাদী দুঃশাসন ফিরে না আসে, সেজন্য 'বস্তুবাদের চরমপন্থা'য় অবস্থান নিয়েছে ইউরোপ। এই অবস্থানেরই ফলাফল আজকের **নৈতিকতায় লিবারেলিজম, নারী-দর্শনে নারীবাদ, সফলতার সংজ্ঞায় ভোগবাদ, অর্থক্ষেত্রে পুঁজিবাদ, রাষ্ট্রনীতিতে গণতন্ত্র, সমরনীতিতে রেজিমেন্ট সিস্টেম, ব্যক্তিনীতিতে ক্যারিয়ারিজম, জ্ঞানতত্ত্বে প্রকৃতিবাদ, আধ্যাত্মিকতায় দেশপ্রেম, প্রেরণায় জাতীয়তাবাদ।** এই প্রতিটি ক্ষেত্রে একসময় ভাববাদ (পৌলীয় খ্রিস্টবাদ) রাজত্ব করেছে। এই প্রতিটি জায়গা থেকে ভাববাদকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে ইউরোপ বদ্ধপরিকর।

মানুষের চরম ভাববাদী সংজ্ঞা হটিয়ে এখন মানুষের চরম বস্তুবাদী সংজ্ঞা। অসম্পূর্ণ **সংজ্ঞা ও অনুসিদ্ধান্তে আগেও মানবতা ধুঁকেছে, এখনো ধুঁকছে।** ভাববাদের যুগে জমিদার-যাজকদের অত্যাচারে প্রজারা ভুগেছে। বস্তুবাদের যুগে উন্নত বিশ্বের প্রজাদের ভোগা শেষ শিল্পবিপ্লবের পর পর, এখন ফার্স্ট-ওয়ার্ল্ডের কাছে ভুগছে থার্ড-ওয়ার্ল্ড[১]। যেন **বিশ্বায়নের গ্লোবাল-ভিলেজে সামন্তরাজা উন্নত বিশ্ব আর প্রজা উন্নয়নশীল-অনুন্নতরা।** কিচ্ছু বদলায়নি, মানবজাতি সমাধান পায়নি। ট্রায়াল-এরোর (trial-error) করে, নিজেদের মধ্যযুগীয় অভিজ্ঞতাকে পুরো দুনিয়ায় জেনারেলাইজেশন করে, ব্যবসার খাতিরে সব নৈতিক সংস্কার ভেঙে দিয়ে যে সভ্যতা বস্তুবাদ দিয়েছে, তা—

---

[১] Lenin, Imperialism : The Highest Stage of Capitalism

» টিকা দেওয়া সমকামীদের মধ্য থেকে প্রতি বছর ৪০ হাজার নতুন এইডস রোগী তৈরি করছে।[১]

» ৪ কোটি মডার্ন স্লেভ (দাস) বানিয়ে রেখেছে।[২]

» দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রতিবছর ২০ লক্ষ কিশোরীকে পাচার করছে ইউরোপ-আমেরিকায়।[৩]

» মাদকের থাবায় ৩১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ ধুঁকছে।[৪]

» সাড়ে ৮১ কোটি মানুষ না খেয়ে আছে আর ওদিকে মঙ্গলগ্রহ জয় করা হচ্ছে।[৫]

» আধ্যাত্মিকতাহীন জীবনে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে ১ জন, বছরে ৮ লাখ মানুষ হতাশায় আত্মহত্যা করছে।[৬]

» অস্ত্রব্যবসায়ীদের মুনাফা পৌঁছাতে পৃথিবীর কোনায় কোনায় গৃহযুদ্ধ হচ্ছে, ৬ কোটি ৯০ লাখ শরণার্থীকে[৭] চুকাতে হচ্ছে সে মূল্য।

» **বস্তুবাদ চাপিয়ে দিতে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে ৬০ লক্ষ লোকের প্রাণ[৮] নেওয়া আমেরিকার জন্য বৈধ করে দিয়েছে পৃথিবী**

---

[১] ইউরোপের ১,২৭,৭৯২ জন গে-পুরুষের ৯৪% অ্যান্টি-রেট্রোভাইরাল প্রোফাইল্যাক্সিস নিচ্ছে। গে, লেসবিয়ানদের জন্য আলাদা কেয়ার আলাদা ডিপার্টমেন্ট করার পরও বছরে ৩০-৪০ হাজার এইডস কেস সমকামীদের ভেতর থেকে। TECHNICAL REPORT, EMIS-2017 The European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey, Key findings from 50 countries.

[২]he Global Slavery Index 2018, Walk Free Foundation.

[৩] Child Sex Trafficking In Latin America, United Nations Human Rights Council

[৪] United Nations Office on Drugs and Crime এর ২০১৫ সালের হিসাব, WORLD DRUG REPORT 2017

[৫] Bukar Tijani, FAO Assistant Director-General and Regional Representative for Africa-র বরাতে The number of people suffering from chronic undernourishment in sub-Saharan Africa has increased, FAO

[৬] Suicide in the world : Global Health Estimates, World Health Organization 2019

[৭] UN High Commissioner For Refugees-এর সাইটে How many refugees are there around the world?

[৮] Nicolas J.S. Davies (2018) How Many People Has the U.S. Killed in its Post-9/11 Wars? Part 1-2-3, Consortiumnews.

কেন? সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা মানুষের সংজ্ঞায়। 'মানুষ স্বার্থপর ও বদ, যৌনতা ও অর্থতাড়িত উন্নত পশু' এই বস্তুবাদী সংজ্ঞার ওপর রাষ্ট্র দাঁড় করালে তা হবে 'পশুদেরই রাষ্ট্র', সমাজের সংজ্ঞা দিলে তা হবে 'যৌনস্বাধীন স্বার্থপরের সমাজ', বাজারের সংজ্ঞা দিলে তা হবে 'দয়ামায়াহীন মুনাফালোভীদের বাজার'।

আসলে দেখেন বস্তুবাদের কোনো জবাবদিহিতা নেই। বস্তুগত প্রগতির কাছে নীতিনৈতিকতা অর্থহীন। এসব ভাববাদী টপিক। একটা বস্তুবাদী রাষ্ট্র ঠিক এরকমই ভয়ংকর। বস্তুবাদী সমাজ কিংবা বস্তুবাদী মানুষ এই ভয়ংকরেরই ছোট ভার্সন। তাদের সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপারটা হলো—**তাদের নিজ পর্যায়ে কোনো জবাবদিহিতা নেই। ব্যক্তির হয়তো রাষ্ট্রীয় জবাবদিহিতা আছে, কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিক জবাবদিহিতা নেই। রাষ্ট্রের আবার রাষ্ট্রীয় জবাবদিহিতা নেই।** দুনিয়ার প্রতিটি সরকারই ফ্যাসিস্ট ও জালিম। হোয়াটএভার গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক।

» কখনো ওয়ান ম্যান ফ্যাসিজম (স্বৈরতন্ত্র)
» কখনো ওয়ান পার্টি ফ্যাসিজম (সমাজতন্ত্র)
» কখনো ওয়ান সিন্ডিকেট ফ্যাসিজম (গণতন্ত্র)

মানবসত্তা ও সভ্যতার বস্তুবাদী ব্যাখ্যার অনিবার্য পরিণতি এগুলো। উইঘুরদের 'অর্গান হার্ভেস্টিং' টা আপনি জানলেন, কারণ সমাজতান্ত্রিক ব্লক কোণঠাসা, কিন্তু আফ্রিকার কালোদের গিনিপিগ বানিয়ে ড্রাগ ট্রায়ালের কথা আপনি জানবেন না, কারণ এই পুঁজিপতিরা মূলধারা। সম্প্রতি একটা ফটো দেখেছি আমরা, ফ্রান্স কজন আলজেরিয়ানকে বেঁধে রেখে পরমাণু বোমা পরীক্ষা করছে, চোখের ওপর বিস্ফোরণের কী প্রভাব সেটা দেখার জন্য। বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে আধুনিক দাসপ্রথার চিৎকারগুলোও আপনি শুনবেন না। দিনশেষে এরা সবাই নিরেট বস্তুবাদী। যাদের কাছে 'মানুষে'র কোনো দাম নেই।

সমাধান কী? সমাধান হলো, মানুষের একটা পরিপূর্ণ সংজ্ঞা। মানুষ কেবল দেহটাই নয়, যে কেবল দেহের সুখই মানবজনমের উদ্দেশ্য। আবার দেহ ছাড়া শুধু আত্মাও নয় যে, কেবল আত্মার নাজাতের জন্যই দেহের চাহিদা ত্যাগ করতে হবে, দেহকে কষ্ট দিতে হবে। মানুষ বস্তু (দেহ) ও অবস্তুর (আত্মা) সমন্বয়। দুটো মিলেই মানুষ। মানুষের পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতি এমন হওয়া চাই, যেন দুটোই বিকশিত হয়, তৃপ্ত হয়। বস্তুবাদ আর ভাববাদের সমন্বয় অনেক দার্শনিকই খুঁজেছেন। যান্ত্রিক সভ্যতাও এগোবে। আবার ভালোবাসা, মনুষ্যত্ব, কবিতারাও মরবে না। প্রকৃতিকে

ব্যবহার (বস্তুবাদ) করতে গিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যটাকে (ভাববাদ) ধ্বংস করা হবে না। এমন একটা সভ্যতা দরকার ছিল।

বস্তুবাদ যে আত্মাহীন মানুষের সংজ্ঞা দেয়, তার থেকে বেরোনো আধ্যাত্মিকতাহীন পরিবার, আধ্যাত্মিকতাহীন সমাজ, আধ্যাত্মিকতাহীন রাষ্ট্র, আধ্যাত্মিকতাহীন বাজারে সমস্যার অন্ত নেই। কেননা মানুষের একটা উপাদানকেই গোনায় ধরা হয়নি। যেন মোবাইলের বাইরে ময়লা হয়েছে দেখা যাচ্ছে, তাই সমাধান হলো আচ্ছা করে ডিটারজেন্ট দিয়ে ধোও; কিন্তু ভেতরে যে অদেখা আরো উপাদান আছে, যা পানি লাগলে নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং,, পানি দিয়ে ধোয়াটা অসম্পূর্ণ সমাধান এবং ক্ষতিকরও। আজ মানবজীবনেরও একই হাল।

» এমন মানুষ দরকার ছিল, যারা ভোগবাদের পিছে ছুটে জবাবদিহিতা হারাবে না। আধ্যাত্মিক মানুষ।
» একটা আধ্যাত্মিক সমাজ। যার জবাবদিহিতা রয়েছে কারো কাছে।
» একটা আধ্যাত্মিক বাজার। কর্মচঞ্চল কিন্তু জবাবদিহিতায় কারো সাথে কানেক্টেড।
» একটা আধ্যাত্মিক রাষ্ট্র। যা আরো সুপিরিয়র কারো কাছে জবাবদিহিতায় আবদ্ধ।
» এমন একটা আধ্যাত্মিক কোর্ট। জবাবদিহিতা টেবিলে, এজলাসে।

এমন সভ্যতা ছিল পৃথিবীর বুকে একদিন। চক্ষুদোষে অন্ধ চিনলি না। ১৪ শ' বছর আগে সকল বস্তু-অবস্তুর কারিগর মহান আল্লাহ বলে দিয়েছিলেন—

وَكَذَٰلِكَ جَعَلناكُم أُمَّةً وَسَطًا لِتَكونوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ وَيَكونَ الرَّسولُ عَلَيكُم شَهيدًا

> *আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে বানিয়েছি 'মধ্যপন্থী জাতি', যাতে তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও, আর তোমাদের ওপর সাক্ষী হবেন রাসুল...*[১]

অর্থাৎ, সকল চরমপন্থি মতাদর্শ ও চরমপন্থি জাতির মাঝে তোমরা হচ্ছ মধ্যপন্থি। **তোমাদেরকে নমুনা করে অপরাপর জাতিকে—মতাবলম্বীদের বিচার হবে। আর তোমাদের বিচার হবে রাসুলকে মাপকাঠি রেখে। আদর্শগতভাবে অতিভাববাদী খ্রিষ্টধর্ম আর অতিবস্তুবাদী পশ্চিমা সভ্যতার ঠিক মাঝখানে ইসলামের অবস্থান।** আল্লাহ খোদ মুসলিমদের সম্বোধন করেছেন 'মধ্যপন্থি' উম্মত হিসেবে। ইসলামে

[১] সুরা বাকারা, আয়াত :১৪৩

আধ্যাত্মিকতা জগৎ-মায়া-চাহিদাকে ত্যাগ করে নয়, এগুলোকে সাথে নিয়ে এগুলোর ভেতরেই আধ্যাত্মিকতা। ইসলাম হলো সেই জীবনপদ্ধতি বা জীবনদর্শন (দ্বীন), যা খোদ স্রষ্টা দিয়েছেন। 'বানালেনই যিনি, তিনিই কি জানবেন না' যে, মানুষকে কোন উপাদানে বানিয়েছেন। বস্তু-অবস্তু, দেহ-আত্মা, ফিতরাত-নৈতিকতা, সমষ্টি-ব্যষ্টি, বায়োলজি-সাইকোলজি, সোশিওবায়োলজি-সোশ্যাল সাইকোলজি-ইকোলজি সকল বিষয় ব্যালেন্স করে সর্বাঙ্গসুন্দর, সর্বোচ্চ কল্যাণদাত্রী জীবনপথ 'সিরাতুল মুস্তাকিম' দেওয়া হয়েছে।

» হেরা গুহায় ধ্যান কিন্তু মক্কার বাজারে-মেলায় মেহনত।

» পড়ছেন সালাত, কিন্তু জামাআতে।

» সারাদিন সিয়াম, সন্ধ্যের পর খাওয়া-সহবাস। 'আমি (কিছুদিন) রোজাও রাখি, আবার (কিছুদিন রোজা না রেখে) পানাহারও করি। রাতের কিছু অংশে জেগে (নফল ও তাহাজ্জুদ) সালাত পড়ি, আবার কিছু অংশ ঘুমাইও। নারীদেরকে আমি বিয়েশাদিও করি। শুনে রাখো, এগুলো আমার সুন্নাহ, আমার পথ। যে আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'[১]

» আমার উম্মতের বৈরাগ্য হলো জিহাদ।[২]

» রোগাক্রান্ত উট রেখো না সুস্থ উটের সাথে।[৩] মহামারি এলাকায় যাবে না,

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৫০৬৩; *সহিহ মুসলিম* : ১৪০১; *সুনানু নাসায়ি* : ৩২১৭; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৩৫৩৪, ১৪০৪৫; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৩১৭

[২] *সুনানু সাইদ বিন মানসুর* : ২৩০৯; *শুআবুল ঈমান* : ৯৩০৪; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৩৮০৭; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ১৯৩৩৩; *মুসনাদু আবি ইয়ালা* : ৪২০৪; *আল-জিহাদ*, ইবনুল মুবারক : ১৬; *মুসনাদুল বাযযার* : ৭৩৪৯। হাদিসটি মুরসাল সহিহ। *মুসনাদু আহমাদ*-সহ অন্যান্য কিতাবের সনদ মুত্তাসিল (ধারাবাহিক সনদবিশিষ্ট) হলেও সব সনদেই একটা না একটা দুর্বলতা আছেই, কিন্তু সুনানু সাইদ ইবনু মানসুরের বর্ণিত হাদিসের সনদে কোনো দুর্বল বর্ণনাকারী নেই, সবাই সিকা বা নির্ভরযোগ্য। অবশ্য এটা মুরসাল (সনদের শেষে সাহাবির নাম উল্লেখবিহীন) হাদিস। মুরসাল হাদিস যেহেতু ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ও ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ-সহ অনেক ইমামের কাছেই গ্রহণযোগ্য, তাই সহিহ সনদে বর্ণিত মুরসাল হাদিস প্রমাণযোগ্য বলেই বিবেচিত হবে। এ হাদিসটি আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাড়াও আবু সাইদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু, আবু যর গিফারি রাযিয়াল্লাহু আনহু-সহ প্রমুখ সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে। সবগুলো সনদে কমবেশি দুর্বলতা থাকলেও সামগ্রিক সনদ বিবেচনায় এটা হাসান লি-গাইরিহি পর্যায়ের হাদিস বলে গণ্য হবে।—শারয়ি সম্পাদক

[৩] *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৯১১, *সুনানুল কুবরা* – বায়হাকি, হাদিস : ১৪২৪০

সে এলাকায় আগে থেকেই অবস্থান করছে, সে সেখান থেকে বেরোবে না।[১] ভরসা করো, সবর করো; কারণ, মহামারিতে মৃত ব্যক্তি শহিদ।[২]

বস্তুকে বস্তু দ্বারা, অবস্তুকে অবস্তু দ্বারা খোরাক দাও। ওষুধও খাও, তাওয়াক্কুলও করো। শুধু বস্তুর পেছনে ছুটলে অবস্তু পেরেশান হয়, শুধু অবস্তুর পেছনে ছুটলে বস্তু কষ্ট পায়। 'নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংস কোরো না। নিজের ওপর রহম করো।' মায়া ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না। মায়ার যথার্থ লালনেই চূড়ান্ত মুক্তি।

» মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।[৩]

» পিতা জান্নাতের দরজা।[৪]

» সেই শ্রেষ্ঠ মুমিন যার ব্যবহার ভালো, তার ব্যবহারই ভালো যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো।[৫] কেবল গরিব-দুঃখী, ধর্মপ্রতিষ্ঠানে দিলেই সাদাকা, তা নয়। স্ত্রীর মুখে তুলে দেওয়া লোকমাও সাদাকা। স্ত্রীর জন্য খরচেরও উত্তম বদলা দেওয়া হবে আখিরাতে[৬]

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৫৭২৮

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৩১১১

[৩] *সুনানু নাসায়ি* : ৩১০৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৭৮১; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ২৫০২, ৭২৪৮; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৫৫৩৮; *শুআবুল ঈমান* : ৭৪৪৮, ৭৪৪৯। হাদিসটির সনদ হাসান

[৪] *জামি তিরমিযি* : ১৯০০; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২০৮৯, ৩৬৬৩; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ২৭৯৯, ৭২৫১, ৭২৫২; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৪২৫; *মুসনাদু আহমাদ* : ২১৭১৭, ২১৭২৬, ২৭৫১১, ২৭৫২৮, ২৭৫৫২; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ২৫৪০০। -হাদিসটি সহিহ

[৫] সর্বাধিক পরিপূর্ণ মুমিন সে, যার ব্যবহার-চরিত্র ভালো, আর (ব্যবহার-চরিত্রে) যে নিজের স্ত্রীর কাছে উত্তম সেই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। *জামি তিরমিযি* : ১১৬২ ও ৩৮৯৫ ; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৪১৭৬; *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৪৪২০; *শুআবুল ঈমান* : ২৭, ৭৬১২। হাদিসটির সনদ হাসান

[৬] 'সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশে যা-ই ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার প্রতিদান নিশ্চিতরূপে প্রদান করা হবে; এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও।' (*সহিহ বুখারি* : ৫৬)
'আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি একটি দিনার আল্লাহর পথে ব্যয় করলে, একটি দিনার গোলাম আযাদ করার জন্য ব্যয় করলে, একটি দিনার মিসকিনদের দান করলে এবং একটি দিনার তোমার স্ত্রী-পরিবারের জন্য ব্যয় করলে। এগুলোর মধ্যে সাওয়াবের দিক থেকে ওই দিনারটিই সর্বোত্তম, যা তুমি তোমার স্ত্রী-পরিবারের জন্য ব্যয় করেছ।' (*সহিহ মুসলিম* : ৯৯৫)

» কন্যা সন্তান লালনে জান্নাতের ওয়াদা।[১]

» উত্তম সন্তান সাদাকায়ে জারিয়া।[২]

» প্রতিবেশীর হক এত বেশি বলা হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশঙ্কা করেছেন, প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ না বানিয়ে দেওয়া হয়।[৩]

» আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৪]

বুনন (fabric)

ইসলাম একটা বুননের মতো। এর দুটো প্যাটার্ন বা ধারা। একটাকে বলবো Divergent, মানে one-to-many. একটা হুকুম বা বিধান জীবনের প্রত্যেক স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে। আরেকটা বুনন হলো many-to-one বা Convergent. জীবনের নানান স্তরে অনেকগুলো বিধান মিলে একটা ধারণা-চেতনা বা হুকুমকে প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে...
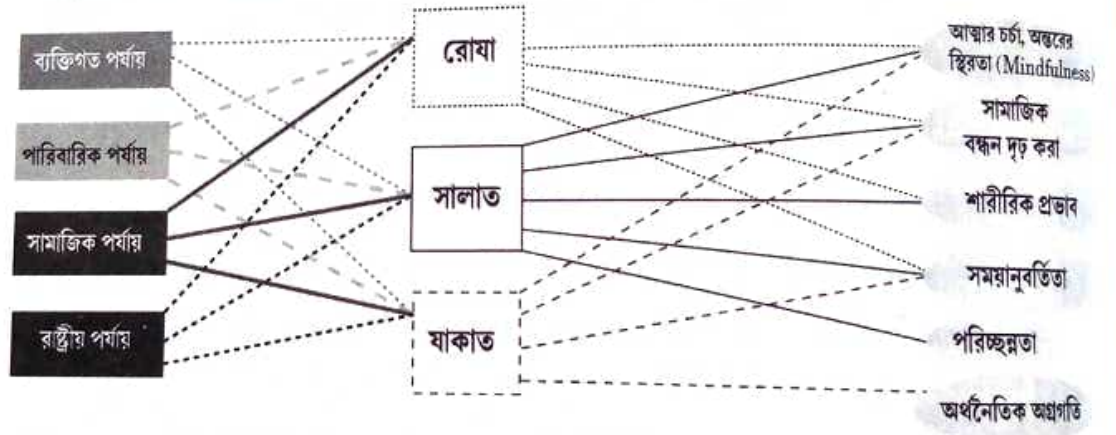
ইসলাম একটা বুনটের মতো
বিভিন্ন পর্যায় মিলে একটি বিধান বাস্তবায়ন করবে। একটি বিধান একাধিক উদ্দেশ্য পূরণে অংশ নেবে।
একটি উদ্দেশ্য পূর্ণতা পাবে একাধিক বিধানের সম্মিলিত ইফেক্টে।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৬৩১; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৮৮০; *জামি তিরমিযি* : ১৩৭৬; *সুনানু নাসায়ি* : ৩৬৫১; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৪১, ২৪১; *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৮৪৪

[২] *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৭৩৪৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৪২৫, ১৪২৪৭; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ২৫৪৪০; *শুআবুল ঈমান* : ৮৩১১; *আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি* : ৬১৯৯। হাদিসটি হাসান

[৩] *সহিহ বুখারি* : ৬০১৪, ৬০১৫; *সহিহ মুসলিম* : ২৬২৫; *সুনানু আবি দাউদ* : ৫১৫২; *জামি তিরমিযি* : ১৯৪২, ১৯৪৩; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৬৭৩, ৩৬৭৪

[৪] *সহিহ বুখারি* : ৫৯৮৪; *সহিহ মুসলিম* : ২৫৫৬; *সুনানু আবি দাউদ* : ১৬৯৬; *জামি তিরমিযি* : ১৯০৯; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬৭৩২, ১৬৭৩৩, ১৬৭৬৩, ১৬৭৭২

একটা লম্বা সময় আমি খিদমাহ হাসপাতালে ডিউটি করতাম। আপনারা যারা জানেন না, তাদের সুবিধার জন্য বলছি, এটা তাবলিগের সাথি ও আলিমদের পরিচালিত হাসপাতাল, খিলগাঁওয়ে। নারী-পুরুষ আলাদা ফ্লোর। সব বিষয়ের মহিলা ডাক্তার আছে (অর্থোপেডিক্স মানে হাড্ডি ছাড়া)। পুরুষ ফ্লোরে পুরুষ নার্স। আল্ট্রাসনো থেকে ব্লাড যে নেয় সে পর্যন্ত আলাদা, ক্লিনারও আলাদা। মোটামুটি চেস্টার কোনো ত্রুটি নেই একটা ইসলামসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার। স্টাফদের-ডাক্তারদের সবাই তাবলিগ-সম্পৃক্ত অবশ্যই নয়, স্বাভাবিকভাবে মেজরিটিই তাবলিগের সাথে সম্পর্কহীন, কিন্তু আমার আন্দাজে এখানে শতভাগ স্টাফ-ডাক্তারই জামাআতের সাথে সালাত আদায় করেন। একদম কট্টর লীগঘেঁষা কয়েকজন স্যার ছিলেন, তারাও নামাযি। একজনের ভয়ে আমরা সবাই তটস্থ থাকতাম, তিনিও। একাধিক স্টাফ ও ডাক্তারকে আমি দেখেছি চোখের সামনে দাড়ি কাটা বন্ধ করে দিতে, টাখনুর ওপর কাপড়ে অভ্যস্ত হতে। যাক, আমি যে পয়েন্টে আসতে চাচ্ছি সেটা হলো, এখানে প্রায় শতভাগ স্টাফ জামাআতের সাথে সালাত আদায় করেন, দাড়ি থাক বা না থাক, পাঞ্জাবি বা টাই-স্যুট পরা হোক। এমন না যে অথোরিটি হুকুম করেছে বা নামাযি দেখে দেখে চাকরিতে নিয়োগ দিয়েছে। এর পেছনে কর্তৃপক্ষের একটা সিদ্ধান্ত জাস্ট। সেটা হলো, বেসমেন্টে যে মসজিদ আছে, সেখানকার জামাআতটা একদম পাশের খিলগাঁও শাহি মসজিদের জামাআতের ১৫ মিনিট পর। শুধু এতটুকু। আপনার পাশের চেয়ারের সহকর্মীটা মূল মসজিদের জামাআতের জন্য গেল, সে আসার পর আপনার ভেতর থেকেই একটা ঠেলা কাজ করছে—এখন বেসমেন্টে জামাআত। এত সুন্দর সুযোগ, তারপরও যদি না পড়ি, কেমন হলো ব্যাপারটা। এই ভেতরের তাড়না যেকোনো ঈমানওয়ালাকে সালাতে টেনে নেবে।

এবার উলটোটা ভাবেন। ধরেন বেসমেন্টে মসজিদ আছে, কিন্তু টাইম দুই মসজিদে একই। যারা সালাত পড়ে, তারা পড়বে, কিন্তু যে পড়ত না, সে আর পড়বে না, অজুহাত খাড়া করবে—সবাই একসাথে গেলে কি হয়? পাশের জন তো গেছে, আমি পরে পড়ে নেব ইত্যাদি। নতুন নামাযি তৈরির সুযোগ থাকল না। আবার ধরেন যদি বেসমেন্টে মসজিদটা না থাকে, তাহলে নামাযি লোকদেরও অনেকে কাজের মাঝে বেরিয়ে পাশের মসজিদে গিয়ে জামাআত ধরার আগ্রহ হারাবে। হয় ভেতরে পড়ে নেবে, বা বাসার জন্য জমাবে। নতুন করে সালাত ধরা তো বাদই দিলাম। জামাআতে যারা আগে পড়ত, তাদের সংখ্যাই কমতে থাকবে।

এ রকম আরো উদাহরণ আছে। এমনিতে ক্যাডেট কলেজগুলোতে মাগরিবের সালাত বাধ্যতামূলক। বাকি সালাত ক্যাডেটরা 'হাউস মস্ক'-এ পড়ে নিত জামাআত করে, হাতেগোনা কিছু ছেলে ৫ ওয়াক্ত পড়ত। ধরেন এক হাউসে ১০০ জন, সেখানে ১০-১৫ জন নামাযি পাবেন। আরো কিছু ছেলে নিজের প্লেসে সালাত পড়ে নিত। সাকুল্যে ২০-২৫ জন। বাকি শিডিউল খুব টায়টায় থাকে, ফলে সেন্ট্রাল মসজিদে মূল জামাআতে পড়ার চিন্তাও করা যায় না। গতকাল ছোট ভাইয়ের কাছে শুনলাম, ওদের সামসময়িক কালে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে একজন প্রিন্সিপ্যাল শিডিউলে কিছু চেঞ্জ আনেন। জাস্ট ১০-১৫ মিনিট পিছিয়ে দেন। ধরেন, লাঞ্চ ৩০ মিনিট পিছিয়ে দিলে যুহরটা পাওয়া যায়, গেমস টাইম ১৫ মিনিট পিছিয়ে দিলে প্রথম ওয়াক্তে আসর ধরা যায়। আর মসজিদের জামাআতের টাইম এগিয়ে দিলেন। এখন বাকি কাজ হলো, ইমাম সাহেব জুমআর বয়ানে সালাত সম্পর্কে কয়েক জুমআ বয়ান করে দেবেন। ব্যস, বহু ছেলে সালাত ধরেছিল, বহু।

আব্বু মুহতারাম রিটায়ার্ড করেছিলেন লাস্ট পোস্টিং সেতু বিভাগ থেকে। সেতু বিভাগে সেসময়কার সচিব মহোদয় বর্তমান কেবিনেট সচিব। নিজেও ইসলাম সম্পর্কে প্রচুর স্টাডি করেন, নেভি চিফ বাসভবনের উলটোদিকের মসজিদে শুক্রবার জুমআ-পূর্ব বয়ান করেন। ড্রিলিং বয়ান। তো, উনার অফিসে তিনি যুহরের সালাতের আগে কিছু কথা রাখতেন, প্রতিদিন অল্প অল্প। অফিস স্টাফ প্রায় সবাই সালাতে আসত কমবেশি। অফিস প্রধান নিজে আসেন সালাতে, তার সুনজরও কাম্য। অনেকের শুরুটা এমন হলেও, নিয়ত সহিহ হয়ে যেতে আর কদিন। কিছুদিন আগেই তো, প্রধানমন্ত্রী বললেন না? 'নামাযি ও দাড়ি-রাখা লোক আমি পছন্দ করি।'[১] আগের কেবিনেট সচিব মহোদয়ও বিয়ার্ডেড, নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সচিব সাহেবও বিয়ার্ডেড। এখন এটাই স্বাভাবিক, অনেক অফিসারই দাড়ি রাখার ব্যাপারটা ভাববে। যারা 'জামায়াত' ট্যাগের ভয় পেতেন, তারা আর পাবেন না। অনেকেই নতুন করে জামাআতে সালাত ধরবেন, হয়তো আগে একা পড়তেন বা জমিয়ে বাসায় পড়তেন কিংবা পড়তেন না।

এবার খিদমাহ হাসপাতালটাকে, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজটাকে, সেতুভবনটাকে একটা রাষ্ট্র চিন্তা করুন। আর আমল হিসেবে শুধু সালাত চিন্তা করুন। দেখেন সালাতের—

---

[১] ৩০ অক্টোবর, ২০১৯, যুগান্তর

» **একটা রাষ্ট্রীয় বুনন আছে (মসজিদ-টাইম-সুযোগ তৈরি-নামাযিদের মূল্যায়ন),**

» **একটা সামাজিক বুনন আছে (নামাযিদের মাঝে থাকা বেনামাযির প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি),**

» **পারিবারিক বুনন আছে (বাবা-মায়ের কেয়ার, তিরস্কার ইত্যাদি),**

» **সেই সাথে ব্যক্তিক বুনন (দায়বদ্ধতা, অভ্যাস ইত্যাদি)।**

সবকটা বুনন মিলে 'ইকামাতে সালাত' হচ্ছে, সালাত প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

» **নামাযি বাড়ছে,**

» **বেনামাযি নামাযি হচ্ছে,**

» **নামাযি জামাআতের পাবন্দি করছে,**

» **সালাতকে জীবনে ধরে রাখছে।**

এভাবে দ্বীনের প্রত্যেকটা বিধানের পরতে পরতে এমন বুনন আছে। এক পরত ছুটিয়ে দিলে বাকিগুলোও ছুটে যায়। কর্তৃপক্ষের লেভেলে সালাতের সহায়তা বাদ দিলে শেষে গিয়ে ব্যক্তিজীবনেও সালাত বিঘ্নিত হয়।

এমনি করে ইসলামের প্রতিটা বিধান। ব্যক্তিজীবনে ইসলামি মূল্যবোধ শিক্ষা ও জবাবদিহিতার আধ্যাত্মিকতা, পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতি সম্মানের শিক্ষা, নারীকে পুরুষের জন্য 'আন-এভেইলেবল' করে দেওয়া (নেট, কলেজ-ভার্সিটি, অফিস), নারীর পূর্ণ পর্দা (শুধু বোরকা নয়), সাথে বিচার-ব্যবস্থার দ্রুততা ও দক্ষতা, আর কঠোর রাষ্ট্রীয় আইন ও শাস্তি। এই পুরো বুননটা ধর্ষণ-পরকীয়ার বলি—পড়ে থাকা নবজাতক গর্ভপাত এসব ঠেকাবে।

রাষ্ট্রীয় আইন, গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজসহ পুঁজিপতিদের যাকাত সংগ্রহ, সঠিক স্থানে যাকাত পৌঁছোনো, তাদেরকে স্বাবলম্বী করার মতো এককালীন অর্থ প্রদান—এই পুরো কাঠামোটা দারিদ্র্য বিমোচন করবে আর দেশি-বিদেশি মাইক্রোসুদি এনজিওদের টাকা পাচার নস্যাৎ করবে। **ইসলামের এই টোটাল সিস্টেম কারা চায় না, ভেবে দেখুন। এই গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজরাই প্রতি টার্মে সরকার বসায় গণতান্ত্রিক সিস্টেমে, সব দেশেই। মন্ত্রীদের অনেকেই শিল্পপতি পুঁজিপতি।** মাইক্রোসুদি এনজিওদের কাজ করতে দেবার আন্তর্জাতিক চাপ। তেড়িবেড়ি করলে আন্তর্জাতিক

মহলের বিরাগভাজন হবে। পরের টার্মে চেঞ্জ করার সিস্টেম তো আছেই। দারিদ্র্য-বিমোচনের নামে মন্ত্রণালয়-অধিদপ্তর-পলিসি-শত শত অফিসার-মিটিং ইটিং সিটিং। কাজের কাজ? পুরো সিস্টেমটা নষ্ট। পুরো সিস্টেমটা।

ঝকঝকে বুননের পশমি কাপড়টা দেখলেন না। শতচ্ছিন্ন পলেস্টারের কাপড়ে আধনেংটো, জমিদারবাবুর সার্বভৌম নওকর।

বরিষে
করোনা-ধারা
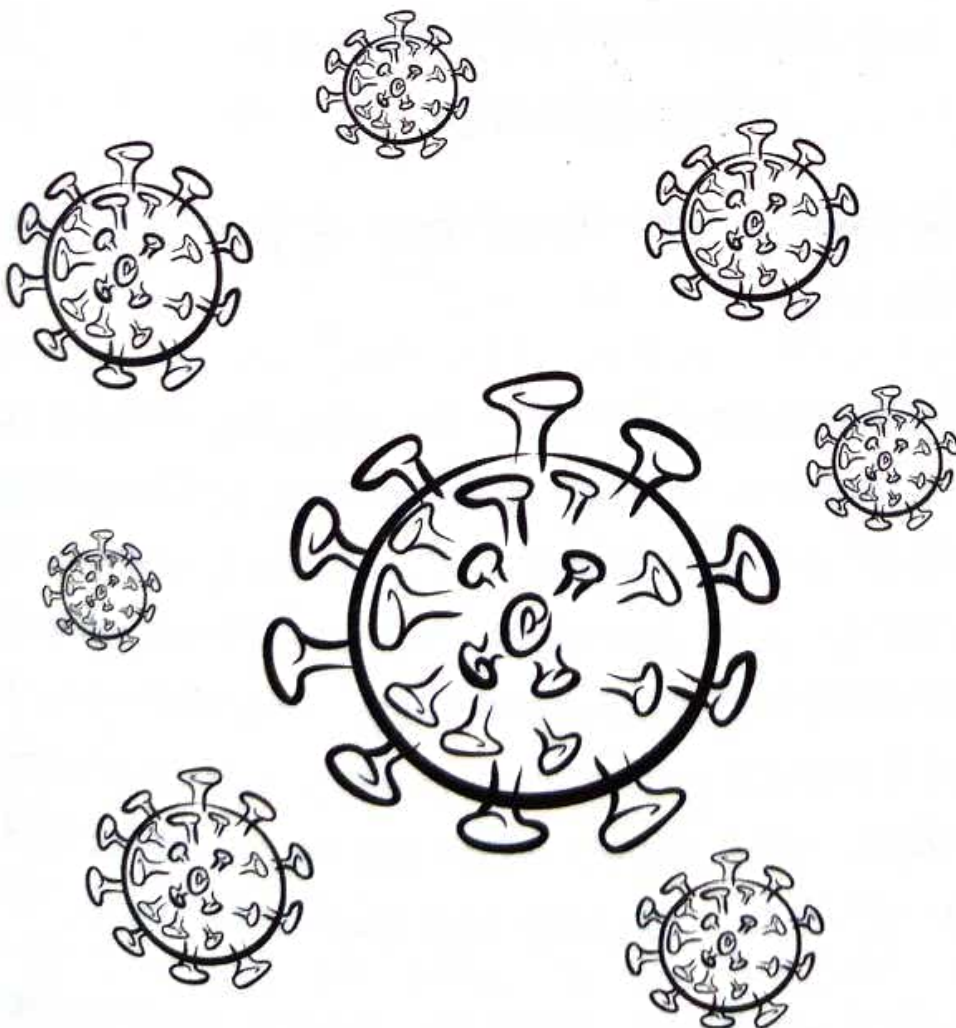
ন্যাকামো

যদি বেঁচে যাও এবারের মতো

যদি কেটে যায় মৃত্যুর ভয়

জেনো বিজ্ঞান লড়েছিল একা

মন্দির-মসজিদ নয়

পদ্যখানা কোন কবি লিখেছেন, জানি না। যে উদ্দেশ্যেই লিখে থাকুন, আমি কথাটার সাথে শতভাগ একমত।

যদি মসজিদকে মন্দিরের কাতারে নামিয়ে আনা হয়, তবে সেই মসজিদের তো আসলেই জাগতিক সমস্যায় কোনো ভূমিকা না থাকারই কথা। মন্দির পুরোদস্তুর একটা আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান, জাগতিক ভূমিকাশূন্য বা ঊনশূন্য। মানত, পার্থিব উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মনের সান্ত্বনা, পার্বণের আনুষ্ঠানিকতা। এখন মসজিদও তাই। সংখ্যাগুরু মুসলিম সপ্তাহান্তে হাজিরা দেয়। মুষ্টিমেয় মুসলিম ৩ ওয়াক্ত। এক চিমটি মুসলিম ৫ ওয়াক্ত আধ্যাত্মিকতাহীন ওঠবস করে আসে। হাতেগোনা কিছু মানুষ আধ্যাত্মিকতার খোঁজ পায় এখানে এসে। একটাই জাগতিক ভূমিকা হতে পারত, জুমুআর আগে আধঘণ্টা জনসংযোগ। ওটুকুও সময় কই, সবাই আসে আরবি খুতবার মাঝে।

আসবাবপত্রের এক বিরাট রুম। পিপিই, ভেন্টিলেটর, ভ্যাকসিন রিসার্চ আধুনিক যন্ত্রপাতির যেখানে নাভিশ্বাস উঠে গেছে, সেখানে মহামারিতে কী ক্ষমতা থাকতে

পারে একটা খালি রুমের? যে রুমটার **শিক্ষাকার্যক্রম** কেড়ে নিয়েছেন, বিচারকার্য কেড়ে নিয়েছেন, বাজার-নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিয়েছেন, প্রশাসনিক কার্যক্রম ছিনিয়ে নিয়েছেন, সমাজচর্চা কেড়ে নিয়েছেন। এখন বলছেন জাগতিক কোনো ভূমিকা নেই। যে রুমটা সুশিক্ষিত, আত্মসংযমী সোনার মানুষ তৈরি করত, তার হাত-পা বেঁধে দিয়ে দুর্নীতিবাজ-লোভী পুঁজিবাদী মানুষ তৈরির কারখানা বানিয়ে এখন এসব ন্যাকামো? পারেনও বস। এরপরও যেটুকু সুযোগ ছিল জুমআর মওকায়, ইমাম সাহেবরা জনসচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখেননি, বলছেন?

বিজ্ঞানের কাজই জাগতিক। **প্রকৃতিবাদকে ধর্ম হিসেবে মেনে নেওয়া বিজ্ঞানের সামনে খোদ স্রষ্টা এলেও বিজ্ঞান মুখ ফুটে বলতে পারবে না, ইনি স্রষ্টা। জাগতিক ব্যাখ্যা করবে, বলবে চোখের ভুল, বলবে এলিয়েন। সে রাস্তা শুরুতে বন্ধ করে নিয়েই বিজ্ঞান হাঁটে।** প্রতিটি বিষয়ের জাগতিক ব্যাখ্যা দেবার মধ্যেই বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ। বস্তু দিয়ে ব্যাখ্যা। তার চোখে 'মন' জাস্ট কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া। পৃথিবী-আমি-আপনি সব উদ্দেশ্যহীন এবং পরিণতিহীন। যা কিছু বস্তু দিয়ে ব্যাখ্যা হয় না, তা বিজ্ঞানের চোখে কুসংস্কার। মহামারি একটা ইহজাগতিক বস্তুগত বিষয়। সুতরাং,, বিজ্ঞান এখানে কাজ করবে, এটাই স্বাভাবিক। এখানে আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা থাকবে না, এটাও স্বাভাবিক।

এবার আসুন। হিন্দুধর্ম 'অজানা-উৎস' থেকে হাজার বছরের মানবসমাজের সৃষ্টি। আর ইসলাম ঐতিহাসিকভাবে সত্য ও নির্দিষ্ট উৎস থেকে আগত। টেক্সট প্রজন্মান্তরে সুরক্ষিত। সরাসরি স্রষ্টার প্রত্যাদেশ ও বিধান। আপনি বলবেন, সেটা তো হিন্দুধর্মও দাবি করে। আখেরে কার দাবি সত্য, কারটা মিথ্যা, এটা আপনাকেই যুক্তিবুদ্ধি খাটিয়ে বের করে নিতে হবে। হিন্দুধর্ম কিছু আধ্যাত্মিকতা, নীতিকথা ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সমষ্টি। **বিপরীতে ইসলাম টোটাল একটা সিস্টেম। আধ্যাত্মিকতা মেইন সফটওয়্যার; সাথে নীতিকথা-ব্যক্তিক লাইফস্টাইল, পরিবার কাঠামো, সমাজব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, রাষ্ট্রচিন্তা, স্বাস্থ্যনীতি, আন্তর্জাতিক আইন ও সমরনীতি, বিচারব্যবস্থা ও দর্শন। ইসলাম ধর্ম নয়, ধর্ম ইসলামের একটা অংশ। ইসলাম ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মিলিয়ে টোটাল সিস্টেম। এখন ইসলামের হাত-পা ছেঁটে দিয়ে ধর্মের খাপে ভরে দিয়ে আপনি বলছেন, ইসলাম দৌড়াতে পারে না।** সব জাগতিক কর্মকাণ্ড, জাগতিক বিষয়াবলির সাথে ইসলামের সব সম্বন্ধ আপনি 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র কাঁচি দিয়ে চেঁছে এখন এসেছেন 'মহামারিতে ইসলামের কোনো ভূমিকা নেই' কাব্য নিয়ে।

ইসলাম তো বলেছিলই, রোগ (pathogenesis) সংক্রামক নয়;[১] রোগের কারণ (pathogen) সংক্রমণ-ক্ষম। তাই—

১. সুস্থ উট আর অসুস্থ উট একসাথে রেখো না[২]। (social distance)

২. মহামারি উপদ্রুত এলাকায় যেয়ো না, মহামারির এলাকা থেকে বের হয়ো না (lockdown)।[৩] মরে গেলে শহিদের ভিআইপি মর্যাদা পাবে ওপারে।[৪]

এই শিক্ষাটা তো আপনারা আমাদের শেখাতে দিলেন না। যারা মসজিদে-মাদরাসায় পড়েছে, তাদের কাছে এসব লকডাউন, সামাজিক দূরত্ব নতুন কিছু তো নয়, বরং ধর্মীয় আদেশের মতো জরুরি। অথচ ওদিকে ইটালি-প্রবাসীদের শেখাতে ব্যর্থ আপনাদের সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা। নারায়ণগঞ্জের অধিবাসীরা জলপথে ত্যাগ করছে নিজ জেলা, আপনার সেক্যুলার শিক্ষা ব্যর্থ। আর মসজিদকে, মানে

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৫৭০৭, ৫৭১৭, ৫৭৫৩, ৫৭৫৬, ৫৭৫৭, ৫৭৭০, ৫৭৭২, ৫৭৭৩, ৫৭৭৫, ৫৭৭৬; *সহিহ মুসলিম* : ২২২০, ২২২১, ২২২২, ২২২৩, ২২২৪, ২২২৫; *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৯১১, ৩৯১২, ৩৯১৬; *জামি তিরমিযি* : ১৬১৫, ২১৪৩; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৮৬, ৩৫৩৭, ৩৫৩৯, ৩৫৪০

[২] *সহিহ বুখারি* : ৫৭৭১; *সহিহ মুসলিম* : ২২২১; *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৯১১; *মুসনাদু আহমাদ* : ৯২৬৩; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৬১১৫; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ১৪২৩৪, ১৪২৩৫; *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৩৪৮৫

[৩] আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু এলেন। তিনি এতক্ষণ যাবৎ তার কোনো প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার কাছে একটি তথ্য আছে, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা যখন কোনো এলাকায় (প্লেগের) প্রাদুর্ভাবের কথা শুনবে, তখন সেখানে যেয়ো না। আর যদি এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব নেমে আসে আর তোমরা সেখানে থাকো, তাহলে পলায়ন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না। সুতরাং, (এ হাদিস শুনে) উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং (মদিনা) ফিরে গেলেন। (*সহিহ বুখারি* : ৫৭২৯, *সহিহ মুসলিম* : ৫৯১৫ : ২২১৯) আরো দেখুন—*সহিহ বুখারি* : ৩৪৭৩, ৫৭২৮, ৭৯৭৪; *সহিহ মুসলিম* : ২২১৮; *জামি তিরমিযি* : ১০৬৫; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ২৯৫৪; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৫৩৬, ২১৭৫১, ২১৭৬৩, ২১৭৯৮, ২১৮০৬, ২১৮১১, ২১৮১৮, ২১৮২৭; *মুসনাদুল বাযযার* : ২৫৭৫, ২৫৮৬, ২৬০৫

[৪] আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্লেগরোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাকে বললেন, 'এটা আযাব; আল্লাহ তাআলা যার প্রতি ইচ্ছা করেন এটা প্রেরণ করেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা একে মুমিনদের জন্য রহমত বানিয়ে দিলেন। ফলে (এখন) যে ব্যক্তি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হবে এবং সে নিজ দেশে ধৈর্য সহকারে নেকির নিয়তে অবস্থান করবে, সে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, তার সাথে তাই ঘটবে, যা আল্লাহ তাআলা তার তাকদিরে লিখে রেখেছেন, তাহলে সে ব্যক্তির জন্য শহিদের মতো পুরস্কার রয়েছে। (*সহিহ বুখারি* : ৩৪৭৪, ৫৭৩৪, ৬৬১৯) আরো দেখুন—*সুনানু আবি দাউদ* : ৩১১১; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ১৩০০; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৩১৮৯, ৩১৯০; *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ১৯৮৫; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৩৭৫৩। হাদিসটি সহিহ।

ইসলামকেও আপনি শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব দেননি। আবার দায়ীও করছেন। বেশ। ক্ষমতাহীন দায়িত্ব, নাকি?

মনে রেখো তুমি, বিশ্বকাপের আঙিনায়
শচীন মেরেছিল ছক্কা, লতা মুঙ্গোশকর নয়।

কবিতাটা হয়ে গেছে এরকম আরকি। আমার পয়েন্ট হলো, যদি মসজিদ-মন্দিরকে 'স্পিরিচুয়াল বিল্ডিং' ক্যাটাগরিতে ফেলেন, ইসলাম-হিন্দু ধর্মকে 'ধর্ম' হেডিংয়ে ফেলে বলেন, ইহজাগতিক মহামারিতে ধর্মের কোনো ভূমিকা নেই। গুড, সহমত। **আর যদি ইসলামকে ইসলামের মতো খেলতে দেন, তাহলে করোনাকে ব্যবহার করে যে যত ফায়দা উঠাচ্ছে, সেটা বিগ ফার্মাই হোক, আর চীনা মাস্ক-পিপিই ফ্যাক্টরিই হোক, তা ইসলাম বন্ধ করবে। আর্মি নামিয়ে লকডাউন-সোশ্যাল মানুষকে জোর করে ডিস্টেন্সিং করাতে হবে না, লোকে দ্বীন মনে করে ভালোবেসে করবে। শিক্ষাব্যবস্থায় তাকদির শিখে ফেলেছে বলে মানুষ হবে শান্ত। দলীয় বিদ্বেষের কারণে দেশীয় আবিষ্কৃত টেস্টকিটের লাইসেন্স সরকারি মারপ্যাঁচে আটকে থাকবে না। জনগণকে কোনো আন্তর্জাতিক ব্যবসার শিকার হতে হবে না। কেউ গুজব ছড়িয়ে ফায়দা লুটতে চাইলে পারবে না।**

দিন বদলাবে। করোনার বহুরূপী রঙবদলে দিশেহারা বিজ্ঞান অপেক্ষা করছে একটা 'মিরাকেল'-এর, সব হাল ছেড়ে দিয়ে 'হার্ড ইমিউনিটি'র প্রতীক্ষায় বিজ্ঞানীমহল। WHO জানিয়ে দিয়েছিল, ভ্যাকসিন আবিষ্কার সম্ভব নাও হতে পারে। ভ্যাকসিন এসেছে, তবে সাথে এসেছে অনেক কথাও। ভ্যাকসিন লাগছে ডোজের পর ডোজ। নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা হাতছানি দিচ্ছে। কী সেটা, সেটা নিয়ে আপনারা অনিশ্চিত, অস্থির। **আমরা নিশ্চিত, কী হবে তা আমরা জানিই, আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।**

বিশ্বাস এমন একটা ইন্দ্রিয়, এটা যার আছে, সে চিরটাকালই স্থির-শান্ত-নিশ্চিন্ত।

চিনলি না রে পাগলা

এক প্রবাসী নাস্তিক নারী এই কদিন আগে স্ট্যাটাস দিয়েছিল—আল্লাহতে বিশ্বাস না করলেও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ তিনি বিশ্বাস করেন। হ্যাঁ, নতুন কিছু না। **প্রকৃতিপূজা, মাদার নেচার, প্রেতাত্মাপূজা, ভূত, এলিয়েন ইত্যাদি অদৃশ্য কাল্পনিক সব সত্তাই ওনারা বিশ্বাস করেন। শুধু স্রষ্টা ছাড়া। কারণ স্রষ্টা যে কিছু নিয়ম-কানুন বেঁধে দেন।** প্রকৃতি-প্রেত-এলিয়েনদের মানলে আত্মপূজায় বাদ সাধে না। স্রষ্টা আবার যে ধর্মেই মানেন, কিছুটা কৃচ্ছ্রতা, কিছুটা আত্মসংযম, কিছুটা নৈতিকতা আরোপ করেন যে। ওখানেই সমস্যা। সে যাকগে, আমার আলোচনা মুসলিমদের উদ্দেশে যেহেতু, ওদিক পানে আজ গেলাম না।

ফেসবুকে ঢুকে সাধারণত করোনা আপডেট নিই। নতুন কোনো রিসার্চ এলো কি না। কে কী বলল, কর্তৃপক্ষ কী বলল, ডাক্তারদের গ্রুপে তাদের প্রতিক্রিয়া কী হচ্ছে। পুরো টকশো দেখি না, নেট কিনে কিনে চালাচ্ছি তো, টকশোর ছোট ক্লিপ সামনে পেলে দেখি। **কোনোখানে কেউ ভুলেও উচ্চারণ করছে না—এটা আল্লাহর গযব। সেক্যুলারিজমের পবিত্রতা নষ্ট হয়। নেহায়েত ধার্মিক কেউ খুব সাবধানে ধর্মনিরপেক্ষ কিছু শব্দ ব্যবহার করছেন : সৃষ্টিকর্তা, প্রার্থনা, পরম করুণাময়, কৃপা। যাতে ধর্মনিরপেক্ষতার মাবুদেরা (অমুসলিমদের সন্তুষ্টি, গ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা) নারাজ না হয়।** তাও মানলাম, কিন্তু মুসলিমরা যে 'আল্লাহর গযব' কী-কেমন-কেন তা সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখে না, এটা দুঃখজনক। যারা রাখে তারাও মুখ ফুটে স্বীকার করছে না সেক্যুলারিতা অপবিত্র হবে বলে। বস্তুবাদী পাশ্চাত্য মনোবৃত্তি আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে এতটাই। আল্লাহর ক্রোধ যদি আপনি টেরই না

পান, তা থেকে পরিত্রাণ পেতে কী করণীয় তা বুঝবেন কীভাবে। কী আশ্চর্য অবস্থা আমাদের ঈমানের? **একজন নাস্তিক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ যতটুকু ঈমান রাখে, আমার কি 'আল্লাহর গযব'-এ অতটুকু ঈমানও নেই?**

অথচ একজন মুসলিম (আত্মসমর্পিত) হিসেবে আল্লাহর গযব চেনার কথা ছিল আমাদের। চিনতে পারাটা ছিল ঈমানের একটা আলামত।

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

> *আর যখন তারা রাসুলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়গুলো শ্রবণ করে, তখন আপনি দেখতে পাবেন, তাদের চক্ষু অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে; কারণ, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা বলে, হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি; কাজেই আপনি আমাদের (সত্যের) সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।*[১]

কথা ছিল, এই মহামারির ভেতর দিয়ে আমরা আমাদের রবকে চিনে নেব, নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হব। তাহলে কি পবিত্র রাসুলের কথার বিপরীতে পশ্চিমের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকেই (বিজ্ঞান) আমরা দ্বীন হিসেবে নিলাম? মহামারি থেকে বাঁচার জন্য পশ্চিমের বস্তুবাদী রিসার্চের অপেক্ষাতেই আমরা থাকব, সেগুলোর কথাই আলোচনা করব, সেগুলোর মধ্যেই মুক্তি খুঁজব। তাহলে আমার ঈমান কোনটা? সেই ঈমানের চোখে কী দেখার কথা ছিল? মহামারি থেকে মুক্তির জন্য কী করার কথা ছিল?

এখানে খুব সূক্ষ্ম একটা ডিমার্কেশন আছে। বর্তমান 'আধুনিক' বস্তুবাদী বিশ্বে এই সীমাটা প্রত্যেক মুসলিমের বোঝা দরকার। **বিজ্ঞান একটা টুল (tool)। এই টুলটা এখন ব্যবহার করছে পুঁজিবাদী বস্তুবাদী পশ্চিমা সভ্যতা। একটা সময় আকরিক (ore) থেকে এই টুলটা ইসলাম বানিয়েছিল, শান দিয়েছে, ধারালো করেছে। সেটা দিয়ে সবজি কেটেছে, গোশত কেটেছে। নিজে খেয়েছে, অন্যকে খাইয়েছে। আজ সেই টুলটা পশ্চিমা সভ্যতা নিয়েছে। সেটা দিয়ে ইসলামকে কাটছে, মুসলিমদের কাটছে, তৃতীয় বিশ্বকে কাটছে, পুঁজিবাদের জিভ দিয়ে রক্ত চুষে ফুলছে ফাঁপছে। যখন ইসলাম টুলটা ইউজ করেছিল, পরতে পরতে স্রষ্টাকে চিনেছে। আর ইউরোপ**

---

[১] সুরা মায়িদা, আয়াত : ৮৩

যখন ইউজ করছে, তখন স্রষ্টাকে অস্বীকার করছে। তাই টুলটার সাথে ইসলামের বিরোধ নেই। বিরোধ হলো—টুলটা যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, ওইভাবে ব্যবহার করে 'যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে'—তার সাথে।

পশ্চিমা সভ্যতা বিজ্ঞানের ঘোড়ার ওপর সওয়ার। আর বিজ্ঞানের ঘোড়াটার চোখে পরানো ঠুলি (blinders), ঠুলির নাম 'প্রকৃতিবাদ'। জগতের প্রতিটি ঘটনাকে জাগতিক ব্যাখ্যা করা। বস্তু দিয়ে ব্যাখ্যা করা। যেমন ধরেন, মন কী? বিজ্ঞানের চোখে মন জাস্ট কিছু কেমিক্যাল ক্রিয়াবিক্রিয়া। কারণ ওটুকুই বিজ্ঞান মাপতে পারে। **যা মাপা যায় না, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান যতটুকু পারে বস্তুগত সম্ভাবনার কথা বলবে, নয়তো চুপ হয়ে যাবে। এজন্য আত্মা, স্রষ্টা এসব বিষয়ে বিজ্ঞানের চুপ থাকার কথা। কিন্তু বাড়াবাড়িটা যে করে তার নাম 'বিজ্ঞানবাদ' (scientism)।** বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানবাদের মধ্যে পার্থক্য কী তাহলে?

বিজ্ঞানবাদ

বিজ্ঞানের কাছেই সবকিছুর জবাব। **বিজ্ঞান সবকিছু আমাদের জানিয়ে দেবে। সব সমাধান করে দেবে। যা বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে না তার অস্তিত্বই নেই। যার জবাব বিজ্ঞানের কাছে নেই, তা কুসংস্কার। এই অগাধ অতিবিশ্বাসকে বলে বিজ্ঞানবাদ।** বিজ্ঞান একটা টুল, আর **বিজ্ঞানবাদ একটা ধর্মবিশ্বাস** : বিজ্ঞান পারবেই। বিজ্ঞান যেখানে চুপ, বিজ্ঞানবাদ সেখানেও সরব। যেমন পীর চুপ, কিন্তু মুরিদ লাফায়, সেরকম। যার বস্তুগত ব্যাখ্যা করা যায় না, সেখানে বিজ্ঞান বলছে, এটা আমার ফিল্ড নয়। আর বিজ্ঞানবাদ বলছে, বিজ্ঞানের নীরবতা মানে ওটা আসলে নেই-ই, ওটা কুসংস্কার। এই জায়গাটা মুসলিম বিজ্ঞানপড়ুয়াদের বুঝতে হবে। King's University College-এর মনোবিজ্ঞানের প্রফেসর Imants Barušs-এর মতে—

বিজ্ঞান	বিজ্ঞানবাদ
open-ended exploration of reality, based on logical thinking about empirical observations. বাস্তবতার অনুসন্ধানে অন্তহীন যাত্রা, যার ভিত্তি হলো পর্যবেক্ষণ-লব্ধ জ্ঞানের ওপর যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তাভাবনা।	বাস্তবতার 'বস্তুবাদী ভার্সন'টার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকা, যা অনুসন্ধানকে আটকে দেয় কেবল ওই সকল বিষয়ের ভেতরেই, যেগুলো বস্তুবাদ অনুমোদন করে।

বিজ্ঞান হলো একটা চলমান অনুসন্ধানী কার্যক্রম, বিজ্ঞানবাদ হলো একটা দার্শনিক অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি (worldview)।

কখনোই বিজ্ঞান বলবে না, আল্লাহ আছেন কিংবা করোনা আল্লাহর গযব। আধুনিক বিজ্ঞান সবকিছুর একটা বস্তুগত ব্যাখ্যা দাঁড় করাবে। যেমন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার ঘটনা। কুরআনে সুরা ক্বমারে রয়েছে।[১] সুতরাং, ধর্মীয়ভাবে অকাট্য আমাদের কাছে। প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা আছে যিনি ওই সময় নবিজির সাথেই বসা ছিলেন।[২] সে হাদিস শুদ্ধতার ফিল্টারে উত্তীর্ণ। (এই শুদ্ধতার ফিল্টার সম্পর্কেও আমাদের আইডিয়া ভয়ংকর-রকম হতাশাজনক।) আবার সেসময় কাফিররা বহিরাগত নন-আরবদের থেকে যাচাইও করে নিয়েছিল যে, তারাও দেখেছে কি না।

সেসময় বিজ্ঞান থাকলে কী বলত? চন্দ্রে ভূমিকম্প হয়েছে, প্লেট সরে গেছে বা কোনো বড় গ্রহাণুর আকর্ষণে এমনটা হয়েছে। পরে আবার মহাকর্ষের কারণে জোড়া লেগে গেছে। এরকমই একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হতো। ব্যাখ্যা দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব, রাসুলের আগমন, মুজিযা এগুলো বাইপাস করে ফেলা হতো। এমন একটা ব্যাখ্যা দেয়া হত, যেন এটা এমনিতেই হতে পারে, স্রষ্টার প্রয়োজন নেই। যেমন সরাসরি স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার না করে স্টিফেন হকিং বলেছেন: (মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য) স্রষ্টার দরকার নেই। যাদের বাইপাস করার, সেই যাদুবিদ্যা তুকতাকের যুগে 'যাদুকর' বলে বাইপাস করেছিল। এই বিজ্ঞানের যুগে হলে আমরা বিজ্ঞানের নামে বাইপাস করতাম। একই হলো। **আজকের এই করোনা যে 'আল্লাহর গযব' এটা একজন মুসলিম হিসেবে আপনাকে চিনে নিতে হবে এবং সেটা 'পশ্চিমা বস্তুবাদী বিজ্ঞান' (নট বিজ্ঞান টুল) আপনাকে চেনাবে না। চেনাবে আপনার ঈমানের 'ইন্দ্রিয়'।** ঈমানের ইন্দ্রিয় আপনাকে বিজ্ঞানের ফাইন্ডিং টুল আর ওহিকে (কুরআন-হাদিস) কো-রিলেট করিয়ে দেবে। আর যদি কো-রিলেট না করতে পারেন; ডাক্তারদের গ্রুপে কেন মধু-কালোজিরার পোস্ট দেওয়া হলো, সেজন্য হা হা রিয়্যাক্ট দিতে মনে চায়। তাহলে ধরে নেবেন কেবল নামটাই আরবি, ঈমানের ইন্দ্রিয় অন্ধ। 'তাদের অন্তরে মোহর পড়ে গেছে'... 'দেখেও তারা দেখে না, শুনেও তারা শোনে না'... 'অন্ধ, বধির, মূক... তারা ফিরবে না।' মুসলিমের সন্তান হলেও আল্লাহর খাতায় হয়তো মুসলিমের তালিকায় আপনি নেই। অবশ্য না থাকলেই কী আসে যায়, এমনটা মনে হলে, নিশ্চিত থাকতে পারেন আপনি আসলেই নেই।

---

[১] সুরা কমার, আয়াত : ১

[২] *সহিহ বুখারি* : ৩৮৬৯; *সহিহ মুসলিম* : ২৮০০; *জামি তিরিমিযি* : ৩২৮৫; *মুসনাদু আহমাদ* : ৪৩৬০

এগুলো সব রিসার্চ রেজাল্ট। প্যারাডক্সগুলো দেখেন। কীভাবে গত ৫ মাসে তথ্যগুলো বদলে গেছে খেয়াল করেন। হাবুডুবু নাকানি-চোবানিটা লক্ষ্য করতে হবে।

১ক	ফ্লু ভাইরাসগুলো এনভেলপড (আবরণযুক্ত)। উচ্চতাপমাত্রায় আবরণ নষ্ট হয়ে ভাইরাস অকেজো হয়। ফ্লু-ভাইরাসেরই জাত করোনা। ফলে গরম পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে। ভৌগোলিকভাবে এত থেকে এত অক্ষাংশের শীতপ্রধান দেশগুলোই আক্রান্ত।
১খ	কয়েকদিন পর সৌদি-ইরান-মালয়-ইন্ডিয়া সব গরমের দেশগুলো আক্রান্ত। ল্যাবে ৯২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তক গরমে ভাইরাসটা কর্মক্ষম।

২ক	শুধু ম্যান-টু-ম্যান কনটাক্টে ছড়ায়।
২খ	বাতাসে ৩ ফুট পর্যন্ত যায়, এরপর মাটিতে পড়ে যায়।
২গ	বাতাসে ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত ভাসে।

৩ক	সার্ফেসে (বস্তুর ওপর) ৭২ ঘন্টা বাঁচে। এর মধ্যে মানবদেহে ঢুকতে না পারলে অকেজো হয়
৩খ	সার্ফেসে ৭-১০ দিন পর্যন্ত বাঁচে।

৪ক	শুধু বয়স্করা মরছে। যুবকরা লক্ষণই প্রকাশ করে না। করলেও সামান্য, ঠিক হয়ে যায়। শিশুরা তো একেবারেই সেফ।
৪খ	আমেরিকা হাসপাতাল ভর্তি ২৯%-এর বয়স ১৮-৪৪। নিউইয়র্কে ৫০%। আইসিইউ লেগেছে যাদের, তাদের ১২%-এর বয়স ১৯-৪৪। বাংলাদেশে ২১-৪৬ রোগী ৪৬%।

৫ক	হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন (HCQ) আমাদের আশা। সব মার্কেট আউট।
৫খ	HCQ এর খুব একটা উপকার নেই; বরং আইসিইউতে মরেছে বেশি।

৬	ভ্যাকসিন তৈরি করতে ১-২ বছর সময় তো লাগবে।
৭	ভ্যাকসিন তৈরি না-ও হতে পারে। (WHO)। বহু ভাইরাসের ভ্যাকসিন হয়নি (ইবোলা, এইডস)

৮	জাপানি ওষুধটা কার্যকর। দাম ফুল কোর্স ৬ লাখ টাকা।
৯	যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ Remdesivir মানব পরীক্ষায় ব্যর্থ।
১০	ভাইরাসটা নতুন, আমরা এখনো এটা সম্পর্কে সব জানি না, জানছি।
১১	ভাইরাস বারবার জিন মিউটেশন করছে। চরিত্র বদলাচ্ছে।

এ তো গেল প্রথম ৬ মাসে। আর গত দেড় বছরে কত পরস্পরবিরোধী কথা আমরা শুনেছি। ভ্যাকসিন নিয়ে কত মতামত-কাউন্টার, কত জল্পনা কল্পনা। বিজ্ঞানের এই হাবুডুবু-র সিরিয়ালটা আর কতদূর গেলে আমার সোকল্ড আত্মসমর্পিত 'মুসলিম মন' স্বীকার করবে এটা 'আল্লাহর গযব'। **মানবজাতির অহংকার, দ্য গ্রেট 'সায়েন্স' বিগত দিনগুলোতে এটা-ওটা-সেটা বলছে। আশায় বুক বেঁধে সামনে যা পাচ্ছে আঁকড়ে ধরছে। কখনো বয়স, কখনো তাপমাত্রা, কখনো ভূগোল, কখনো বিসিজি ভ্যাকসিন, কখনো হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন।** 'ফী নারি জাহান্নামা খলিদীনা ফীহা' মিস্টার অভিজিৎ রায় লিখেছিল, 'বিজ্ঞান এতদূর এগিয়েছে, এতদূর এগিয়েছে, যদি স্রষ্টা থাকতই, তাহলে এতদিনে আবিষ্কার হয়ে যেত।' আর এদিকে পিকোমিটার, ফেমটোমিটারের ক্ষুদ্র একটা ভাইরাস এখনো বিজ্ঞানের কাছে অচেনা রয়ে গেল। উনি বেঁচে থেকে দেখে গেলে ভালো হতো। **বস্তুবাদী সভ্যতা বস্তুর বাইরে কিছু ভাবতে পারে না। আমি আপনিও কি তাই? তাহলে যা পার্থক্য গড়ে দেবে সেটা কই? ঈমান কোথায়? ঈমানের অস্তিত্ব, উপযোগিতা, ব্যবহার, কার্যক্ষমতা কোথায়?** নাকি শুধু মুখে, শুধু নামে, শুধু দাবিতে। একটা রূপকথার মতো, যার কোনো অস্তিত্ব নেই। **'অস্তিত্বহীন ঈমান'কে কী বলে?** এত অস্পষ্ট কেন আমার পরিচয়? কে আমি?

আল্লাহ কে?

গযব বা গদ্বব শব্দের অর্থ ক্রোধ, রাগ, Wrath, Anger. আল্লাহ আবার রাগেন? জি। **ক্রোধ আল্লাহর সিফাত। আল্লাহ স্বয়ং নিজের জন্য যেসব সিফাত বা গুণ সাব্যস্ত করেছেন। আমরাও সেগুলো সাব্যস্ত করি, কিন্তু এগুলোর ধরন জানি না এবং এগুলো আমাদের সদৃশ নয়।** যেমন কালাম, আল্লাহ কথা বলেন। তিনি জানিয়েছেন তিনি কথা বলেন, আমরাও মেনে নেব, তিনি কথা বলেন, কিন্তু কীভাবে বলেন তা জানি না, সেটা সৃষ্টির ধরনের নয়। আমাদের যেমন ফুসফুসের বাতাস বেরোতে থাকে আর দাঁত জিহ্বা ঠোঁটে ধ্বনি উচ্চারণ করে কথা বলি, তাঁর কথা এমন নয়। কেমন, আমরা জানি না। তবে আমাদের সদৃশ যে নয়, এটা নিশ্চিত। لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (লাইসা কামিসলিহি শাইয়ুন)—কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়।[১] সৃষ্টিজগতে তাঁর কোনো সদৃশ নেই, তাঁর কোনো দৃষ্টান্ত নেই।। তিনি অমুখাপেক্ষী, কথা বলার জন্য তিনি ফুসফুস-জিহ্বা এগুলোর মুখাপেক্ষী নন। এগুলো সৃষ্টির লাগে, স্রষ্টার লাগে না।

» **আমাদের আল্লাহ জড়বস্তু নন। তিনি জীবিত, চিরঞ্জীব (আল হাইয়্যু)।**

» **তিনি সৃষ্টিজগতের প্রতি উদাসীন নন। তিনি কেয়ারিং। তিনি সব দেখছেন (বাছীর), সব শুনছেন (সামিউ), সব খবর রাখছেন (খাবীর)।**

» **তিনি সৃষ্টিকে ভালোবাসেন (রউফ), স্নেহ করেন (ওয়াদুদ) মাতৃপেক্ষা বেশি।**

---

[১]সুরা শুরা, আয়াত : ১১

» তিনি রহম করেন জালিম-মাজলুম সবাইকে (রাহমান), জালিমের ওপর ধৈর্য ধারণ করতেই থাকেন (হালীম/সবুর)।

» মাফ করেন (গফুর), সর্বোচ্চ পর্যায় অব্দি মাফ করতে থাকেন (গাফফার)।

» আবার তিনি প্রতিশোধ নেন (যুনতিক্বাম), ক্রোধান্বিত হন (কাহহার)। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে জালিমের ওপর তিনি প্রতিশোধ নেন। মাজলুমের পক্ষে।

» তবে তাঁর রহম তাঁর ক্রোধের ওপর বিজয়ী।

» তিনি ইনসাফ করেন (আদিল), ক্রোধে তিনি সৃষ্টির মতো ন্যায়হরণ করে বসেন না।

» তিনি চান আমরা ভালো থাকি, সুখে থাকি। ন্যায় করি। অন্যায় করে তাঁর গযব ডেকে না আনি। এজন্য তিনি আমাদের সাথে কমিউনিকেট করেন। নবিদের মাধ্যমে কিতাব পাঠিয়ে সতর্ক করেন। কীভাবে চলতে হবে জানান। আমার জমিনে আমার দেখানো নিয়মে চলো, তোমরাও ভালো থাকো, আমার সৃষ্টিকেও ভালো থাকতে দাও। আমার অবাধ্য হয়ো না। 'আমার ক্রোধ তোমরা সহ্য করতে পারবে না, তারপরও তোমরা অবাধ্য হচ্ছো?'

» তিনি স্বত্বাধিকারী (মালিক), শাসক (হাকাম), প্রতিপালক (রব)।

সুতরাং, **ক্রোধ আল্লাহর সিফত বা গুণ। তিনি জড় নন, নির্জীব নন,** বেখেয়াল নন। **বান্দারা সীমা অতিক্রম করে ফেললে তিনি গযব পাঠান।** কেন? وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 'বড় আযাব (পরকালে)-এর আগে আমি অবশ্যই তাদেরকে ছোট কিঞ্চিৎ শাস্তি (দুনিয়াতে) আস্বাদন করাই, যাতে তারা ফিরে আসে।'[১] ফেরানোর জন্য। **মুমিনদের আল্লাহ আযাব পাঠান ফেরানোর জন্য। আর কাফিরদের পাঠান ধ্বংসের জন্য।** কাফিরদের জন্য কখন পাঠান? তাদেরকে সুযোগের পর সুযোগ দেন। দুনিয়াতে কাফিরদেরকে আল্লাহ তাদের কুফরের জন্যও আযাব দেন না। শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ, এজন্যও আযাব পাঠান না। **কাফিরের কুফর, মুশরিকের শিরকের শাস্তি জাহান্নামে অনন্তকাল চলবে। দুনিয়ায় আল্লাহ তাদের আরাম-আয়েশের সুযোগ দেন।** বেশি করে দেন। তাহলে দুনিয়ায় গযব কখন আসে? দেখুন—

[১] সুরা সাজদা, আয়াত : ২১

» নুহ আলাইহিস সালামের জাতিকে সাড়ে ৯০০ বছর সুযোগ দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তারা নুহ আলাইহিস সালামকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে। **চূড়ান্ত স্পর্ধা। বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহর দূতকে হত্যার হুমকি?**

» আদ জাতিকে ধরেছেন যখন তারা **স্পর্ধা দেখিয়েছে, 'আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আবার কেডায়?'**

» সামুদ জাতির দাবিমতো পাথরের ভেতর থেকে উট বের করে দেখিয়েছেন আল্লাহ। সেই উটের স্পেশাল নাম দিয়েছেন 'নাক্বতুল্লাহ' (আল্লাহর উট)। **এতকিছু চোখের সামনে দেখেও সেই উটকে তারা হত্যা করেছে। কত বড় স্পর্ধা!**

» ফিরআউন কতশত বছর বনি ইসরাইলের ওপর জুলুম করেছে। মায়ের কোল থেকে ছেলে বাচ্চাকে কেড়ে নিয়ে হত্যা করার মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ করেছে। আল্লাহ শাস্তি দেননি। অবশেষে **চূড়ান্ত স্পর্ধা দেখিয়েছে ফিরাউন, 'আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় রব?'**[১]

» কওমে লুত শিরক করেছে, সমকাম করেছে শত শত বছর। আল্লাহ ধরেননি। কখন ধরেছেন? **যখন তারা স্পর্ধা দেখিয়েছে, 'লুত, তোমাকে আমরা বের করে দেবো, বেশি সুশীল হয়েছো, খুব পবিত্র হয়েছ, না?'** তারা জানত তারা নাপাক কুৎসিত একটা কাজ করছে। সেটা জেনেই তারা করছে ও করবে। পারলে লুত কিছু কইরো।

» কারুন তো বনি ইসরাইলেরই ছিল।[২] যাকাতের হুকুম হয়েছে। সে দিলো তো

---

[১] সুরা নাযিয়াত, আয়াত : ২৪

[২] 'নিশ্চয় কারুন ছিল মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল।' [সুরা কাসাস, আয়াত :৭৬]

বাহ্যত এখান থেকে এ ধারণার উদ্রেক হতে পারে, সে সম্ভবত বনি ইসরাইলের অন্য লোকদের মতো মুমিন ছিল। কারণ, আয়াতে তাকে 'মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত' বলা হয়েছে, কিন্তু এ ধারণাটি সঠিক নয়। কারণ, এখানে 'মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত' বলতে শুধু এটা বোঝানো হয়েছে যে, সে ছিল মুসা আলাইহিস সালামের বংশীয় লোক। অর্থাৎ সে মুসা আলাইহিস সালামের চাচাতো ভাই ছিল। এটাই অধিকাংশ মুফাসসিরদের মত; যেমনটি ইমাম ইবনু জারির তাবারি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন। [*তাফসিরুত তাবারি, খণ্ড* : ১৯; পৃষ্ঠা : ৬১৫-৬১৬]

আয়াতে 'মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত' বলে এ বংশীয় সম্পর্ক ও আত্মীয়তার কথাই বোঝানো হয়েছে। এটা বোঝানো হয়নি যে, সে মুসা আলাইহিস সালামের কওমের অন্য লোকদের মতো মুমিন ছিল। তার অন্যান্য কর্মকাণ্ডও প্রমাণ করে, সে মুমিন ছিল না; বরং সে ছিল একজন কাট্টা কাফির।—শারয়ি সম্পাদক

না-ই, স্পর্ধা দেখাল, 'এগুলো আল্লাহ দিয়েছেন নাকি? এগুলো তো আমি নিজ যোগ্যতায় কামিয়েছি।'

আল্লাহর গযবের একটা কমন প্যাটার্ন দেখুন : স্পর্ধা, অহংকার। **শিরক-কুফর-জুলুম সব আল্লাহ ছাড় দিয়েছেন দুনিয়াতে। গযবের এপিসেন্টার হলো এই ঔদ্ধত্য, স্পর্ধা, অহংকার, বড়াই।** সভ্যতার চূড়ায় থাকা জাতিগুলো যখন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর সাথে স্পর্ধা দেখিয়েছে, আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হয়েছে। আমি জানি আপনাদের মনে অনেক প্রশ্ন জাগছে। যদি আল্লাহর গযবই হয়, তাহলে মুসলিম মরে কেন রে ব্যাটা?

আল্লাহর আযাবে মুসলিম কেন মরে?

তিনটা পয়েন্টে আলোচনাটা শেষ করব, ইনশাআল্লাহ।

প্রথমত, আমরা দেখলাম আল্লাহর আযাব-গযবের এপিসেন্টার হলো স্পর্ধা। কাফির চিরকালই স্পর্ধা দেখিয়েছে, দেখাবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ সে আল্লাহকে চেনে না। **কিন্তু কাফিরদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা মুসলিমরা সমষ্টিগতভাবে গত এক শতকে যে স্পর্ধা দেখিয়েছি, আগের ১৩০০ বছরে এতখানি ঔদ্ধত্য মুসলিমরা দেখায়নি। আমি তো মনে করি, এ দিক বিবেচনায় কাফিরদের তুলনায় আমরাই আল্লাহর গযবের বেশি উপযুক্ত**। কী সে স্পর্ধা, সেটা একটু পরে একসাথে আলোচনা করছি।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর আযাবের কিছু নিয়ম আছে। **যখন দুনিয়ায় আযাব আসে, সেটা সবার জন্যই আসে**। ইমাম মাহদির বিরুদ্ধে প্রেরিত বাহিনীকে বাইদা নামক জায়গায় ধসিয়ে দেওয়া হবে, শুনে আম্মাজান আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করেন, বাইদা এলাকায় এমন অনেক লোকও তো থাকতে পারে, যারা ওই বাহিনীর লোক নয়। বাজার এলাকার আম পাবলিক। তারাও এই আযাব ভোগ করবে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

> *হ্যাঁ, যখন কোনো এলাকায় আল্লাহর আযাব আসে, তখন সবার ওপরই আসে। পরে হাশরের মাঠে যার যার নিয়ত অনুসারে আলাদা হয়ে যাবে।*[১]

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ২১১৮; *সহিহ মুসলিম* : ২৮৮২, ২৮৮৩; *সুনানু নাসায়ি* : ২৮৭৯; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪০৬৪, ৪০৬৫; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৬৭৫৫, ৬৭৫৬; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৮৩২১; *মুসনাদু*

বিশেষ করে মহামারি সম্পর্কে নবিজি স্পষ্ট করেই বলেছেন—

> *মহামারি হলো রিজয (গযব বা শাস্তি) বা আযাব, যা আল্লাহ বনি ইসরাইল বা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেদের ওপর দিয়েছিলেন। কতক জাতিকে এর দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়েছে। **কিছু এখনো বাকি রয়ে গেছে, তাই কখনো তা আসে, কখনো চলে যায়।**[১] **তবে মুমিনদের জন্য আল্লাহ একে রহমত বানিয়েছেন।** যদি মুমিন ধৈর্য সহকারে নিজ শহরে অবস্থান করে, মৃত্যু হলে সে শহিদের সমান সাওয়াব পাবে।*[২]

তৃতীয়ত, মুসলিমদের ওপর একটা বিশেষ দায়িত্ব ছিল। মানুষকে আল্লাহ জমিনে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতাদের কাছে এভাবেই তিনি ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন, 'আমি জমিনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।'[৩] **মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। তার দায়িত্ব আল্লাহর ক্যানভাস করা (যেভাবে রাষ্ট্রদূত তার দেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরেন) এবং আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর বিধানমাফিক দুনিয়া শাসন করা।** মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহর পরিচয় ভুলে 'ভুল উপাস্য' বেছে নিয়েছে তারা তাদের দায়িত্ব জানে না, সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানে না। আর যারা আল্লাহকে তাঁর প্রকৃত পরিচয়ে চিনেছে তারা হলাম আমরা—মুসলিম। সুতরাং, প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব এককভাবে আমাদের। **দায়িত্ব কী ছিল? আল্লাহর পথে দাওয়াহ এবং আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা। সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ। আল্লাহর বিধানের দিকে আহ্বান এবং আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনকারীদের রোধ।** যার স্তর তিনটি—

- হাত দ্বারা।[৪] এটা না পারলে...

আহমাদ : ২৬৪৮৭, ২৬৭০২, ২৬৮৬০

[১] *সহিহ বুখারি* : ৩৪৭৩, ৬৯৭৪; *সহিহ মুসলিম* : ২২১৮; *জামি তিরমিযি* : ১০৬৫; *আস- সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ৭৪৮১; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ২৯৫২, ২৯৫৪; *মুসনাদু আহমাদ* : ২১৭৫১, ২১৭৬৩, ২১৮০৬, ২১৮১৮; *মুসনাদুল হুমাইদি* : ৫৫৪

[২] *সহিহ বুখারি* : ৩৪৭৩ ৩৪৭৪, ৫৭৩৪, ৬৬১৯; *সহিহ মুসলিম* : ২২১৮ *মুসনাদু আহমাদ* : ২৪৩৫৮, ২৫২১২, ২৬১৩৯; *মুসনাদু ইসহাক ইবনি রাহওয়াই* : ১৩৫৩, ১৭৬১; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ৬৫৬০; *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ৭৪৮৫

[৩] সুরা বাকারা, আয়াত : ৩০

[৪] যদি কোথাও গান-বাজনা-বাদ্য বাজতে থাকে তাহলে সামর্থ্য থাকলে তা বন্ধ করে দেওয়া; এমনকি

- জবান দ্বারা (দাওয়াহ/সৎকাজে আদেশ অসৎকাজে নিষেধ)। তাও না পারলে...
- অন্তর দ্বারা (বুগদ ফিল্লাহ বা আল্লাহর জন্য ঘৃণা রাখা)। নবিজি বলেছেন, এটা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর[১]। জোর করে বা মৌখিক বাধা দিচ্ছেন না, ওকে ফাইন। **আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন যদি কমপক্ষে ঘৃণাও করতে না পারেন, তাহলে খুব সম্ভবত আল্লাহর খাতায় মুসলিম তালিকায় আপনার নাম নাও থাকতে পারে।** এই 'আদি দায়িত্ব'-এ অবহেলার কারণে মুমিনদের প্রতিও আল্লাহর আযাব আসে।

আল্লাহ এক ফেরেশতাকে আদেশ করলেন, অমুক অমুক শহরকে তার অধিবাসীদের ওপর উল্টে দাও। ফেরেশতা সবিনয়ে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহ, সেখানে তো আপনার অমুক বান্দা আছে, যে এক পলকের জন্যও আপনার অবাধ্য হয়নি।' আল্লাহ বললেন, 'তাকে-সহই পুরো জনপদ উল্টে দাও। কেননা তার চেহারা আমার তরে এক মুহূর্তের জন্যও মলিন হয়নি।[২] অর্থাৎ তার চারপাশে পাপ-জুলুমে সয়লাব, সমাজ অন্যায়-পাপাচারে পরিপূর্ণ, তবু সে আপন অবস্থায় ইবাদতে মগ্ন

বাদ্যযন্ত্র ও ঢোল-তবলা ভেঙে ফেলাও 'হাত দ্বারা অন্যায় প্রতিরোধ করা'-এর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ কোথাও মদ্যপানের আসর বসলে সেখানে গিয়ে মদের পানপাত্র ভেঙে ফেলা কিংবা কোথাও কারো ধনসম্পদ জবরদখল হতে দেখলে তা উদ্ধার করে মূল মালিককে পৌঁছে দেওয়া এসবই 'হাত দ্বারা অন্যায় প্রতিরোধ করা' এর অন্তর্ভুক্ত। চাই এসব প্রতিরোধ সে সরাসরি নিজেই করুক কিংবা অন্য কারো মাধ্যমে করাক, উভয় ক্ষেত্রেই সে হাত দ্বারা অন্যায় প্রতিরোধকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে এটা তখনই করা যাবে, যখন তা করার পরিপূর্ণ সামর্থ্য থাকবে এবং এতে বড় ধরনের কোনো বিপর্যয় বা এমন ফিতনা সৃষ্টি হবে না, যার কারণে সমাজে আরো অধিক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে কিংবা মানুষের জানমালের ক্ষতি সাধন হয়। এমন আশঙ্কা থাকলে সেক্ষেত্রে শুধু মৌখিকভাবে বাধাদান করবে এবং ওয়াজ-নসিহত করবে। আর এটার সামর্থ্যও না থাকলে সেক্ষেত্রে অন্তরে অন্যায় কাজের প্রতি ঘৃণা রাখবে, যেটা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর। ইমাম নাওয়াওয়ি রাহিমাহুল্লাহ-সহ আরো অনেক হাদিসবিশারদ এমনটাই বলেছেন। দেখুন—*শারহু মুসলিম*, নাওয়াওয়ি, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ২৫

সরাসরি হাত দ্বারা অন্যায় প্রতিরোধ করার বিষয়টি মুসলিমদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, আবার কাফিরদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যখন তারা মুসলিম সমাজে অন্যায় কাজে লিপ্ত হবে। এক্ষেত্রে জিম্মি অমুসলিমরাও অন্তর্ভুক্ত। আর কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যখন পৃথিবী থেকে কুফর-শিরক মূলোৎপাটন করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালিমা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ময়দানে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে। বোঝা গেল, 'হাত দ্বারা অন্যায় প্রতিরোধ' কেবল কাফিরদের ক্ষেত্রেই নয়; বরং কাফির-মুসলিম সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।—শারয়ি সম্পাদক

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৪৯

[২] *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৭৬৬১; *শুআবুল ঈমান* : ৭১৮৯; *মুজামু ইবনিল আরাবি* : ২০১৬—হাদিসটির সনদ যইফ

থেকেছে। সমাজে চলমান এতসব পাপ-অন্যায়-জুলুম দেখে তার মুখ মলিন হয়নি। তার ভ্রূও কুঞ্চিত হয়নি। তার অন্তরে খারাপও লাগেনি। ঈমানের সর্বনিম্ন স্তরের দায়িত্বও সে পালন করেনি।

আমাদের দায়িত্ব ছিল ইসলামের এই বার্তা, ইসলামের এই সুশাসনের আওতায় সকল মাজলুমকে নিয়ে আসা। যাতে মানবতার মুক্তি ঘটে। **সব সামাজিক (দলিত, নিগ্রো, হিজড়া, হিন্দু, বিধবা, প্রথা, পেশাগত হীনম্মন্যতা) মাজলুম, সব অর্থনৈতিক মাজলুম, রাষ্ট্রীয় সিস্টেমের মাজলুম, পুঁজিবাদের মাজলুম, ক্যারিয়ারিজমের মাজলুম সবার কাছে ইসলামের সমাধান পৌঁছে দেওয়া এবং ইসলামের সিস্টেমের ভেতর এনে এই নিগৃহীত মানবতাকে স্বস্তি দেওয়া ছিল আমাদের কাজ।** বস্তুত জালিম জুলুমের মধ্য দিয়ে নিজের ওপরও জুলুম করে, যা থেকে তাকে বিরত রাখা আমাদের দায়িত্ব।[১] জালিমকে জুলুম থেকে ফেরানো মানে খোদ তার ওপরও ইহসান বা দয়া করা। **আমরা পুরো উম্মাহ একসাথে সেই 'আদি দায়িত্ব' ছেড়ে দিয়েছি।**

গুনাহকে ঘৃণা করা তো দূর কি বাত। ঘৃণা করবার আগে সেটাকে গুনাহ তো মনে করতে হবে। **গুনাহকে গুনাহ মনে করাই ছেড়ে দিয়েছি আমরা মুসলিমরা।** আমরা অনেকেই মিউজিককে গুনাহ মনে করি না, অথচ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিউজিক শুনলে কানে আঙুল দিয়ে সে জায়গা পার হতেন।[২] বলেও গেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন দল বের হবে যারা ব্যভিচার-রেশম-মদ-বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।[৩] বলেছেন, আল্লাহ আমার উম্মতের ওপর মদ-জুয়া-বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন।[৪] অথচ বহু মুসলিমকে আপনি বোঝাতে পারবেন না। তারা

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ২৪৪৪, ৬৯৫২; *জামি তিরমিযি* : ২২৫৫; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৫১৬৭, ৫১৬৮; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৩০৭৯; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ১১৫০৯, ১১৫১০, ২০১৭৭

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ৪৫৩৫, ৪৯৬৫; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৯২৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৯০১; *শুআবুল ঈমান* : ৪৭৬০; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ২০৯৯৭; *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ১১৭৩, ৬৭৬৭—হাদিসটির সনদ সহিহ

[৩] *সহিহ বুখারি* : ৫৫৯০; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৬৭৫৪; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি : ৩৪১৭; *শুআবুল ঈমান* : খণ্ড :৭; পৃষ্ঠা :১১৮; *মুসনাদুশ শামিয়্যিন* : ৫৮৮; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ২০৯৮৮; *আস-সুনানুস সগির*, বাইহাকি : ৩৩৫৩

[৪] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৪৭৬, ৬৫৯১, ৬৫৯৯; *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৬৯৬; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৫৩৬৫; *আল-আহাদিসুল মুখতারা* : ৫৭, ৬০; *মুসনাদু আবি ইয়ালা* : ২৭২৯; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ২০৯৯১—হাদিসটির সনদ সহিহ

একে ঘৃণা তো দূরের কথা, হারামই মনে করবে না। নিষেধ করাকে উগ্রতা মনে করবে। তার মানে নবিজি 'উগ্র' ছিলেন? নাউযুবিল্লাহ। বহু মুসলিম ঘুষ-সুদকে 'ও-কিছু-না' মনে করে। বহু মুসলিমা পর্দা করাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে, মাহরাম ও নন-মাহরাম মেনে চলাকে বাড়াবাড়ি মনে করে। ছেলেরা মেয়েদের দিকে তাকানোকে গুনাহ মনে করে না, অথচ সুরা নুরে আল্লাহ নিজে এ থেকে বিরত থাকতে আদেশ করেছেন।[১] বহু দ্বীনদার পর্দানশিন মুসলিমা গুনাহে লিপ্ত হবার প্রবল আশঙ্কা থাকাবস্থায় পুরুষের দিকে তাকানোকে তেমন কিছু গণ্য করে না, অথচ এ থেকে বিরত থাকা আল্লাহর আদেশ ছিল।[২]

আল্লাহর শপথ, **ইসলামের ইতিহাসে এমন সময় কোনোদিন আসেনি যে, এত বেশিসংখ্যক মুসলিম কুরআন-হাদিসে বর্ণিত স্পষ্ট অকাট্য সব হুকুমকে অস্বীকার করেছে। আল্লাহর আদেশকে অদরকারি মনে করেছে। আল্লাহর আদেশকে ইনিয়ে-বিনিয়ে অজুহাত-সহ বা স্পষ্টভাবে মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এমন ঔদ্ধত্য সামষ্টিকভাবে মুসলিমরা আগে কোনোদিন দেখায়নি। ক্যারিয়ার, আধুনিকতা, সামাজিকতা, মধ্যপন্থা ইত্যাদির অজুহাতে মহান আর-রাজ্জাক আল-মালিকের আদেশের প্রতি এতটা তাচ্ছিল্য আমরা আগে কখনো দেখাইনি।** এমনকি এই লেখা পড়তে পড়তেও অনেক মুসলিম ভাইয়ের মনে নেগেটিভ অনুভূতি হচ্ছে। কী ভয়ংকর স্পর্ধা আমরা দেখাচ্ছি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সাথে। সামনে আরো বিস্তারিত আসবে বিষয়গুলো। মোদ্দা কথা, সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধ করার 'আদি-কর্তব্য'তে অবহেলা আল্লাহর গযবের আরেকটি কারণ।

> *বলে দিন, তোমাদের কাছে যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান—যা তোমরা পছন্দ করো, যদি (এসব কিছু) তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা করো, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।*[৩]

---

[১] (হে নবি) আপনি মুমিন পুরুষদেরকে তাদের দৃষ্টি অবনত করতে বলুন... [সুরা নুর, আয়াত : ৩০]
[২] আর (হে নবি,) আপনি মুমিন নারীদেরকে তাদের দৃষ্টি অবনত করতে বলুন... [সুরা নুর, আয়াত : ৩১]
[৩] সুরা তাওবা, আয়াত : ২৪

যদি ৮টা জিনিস বেশি প্রিয় হয় ৩টা জিনিসের চেয়ে, তাহলে অপেক্ষা করো আযাবের। আয়াতটি আমাদের মুসলিমদেরই উদ্দেশে। সমঝদারোঁ কে লিয়ে ইশারা হি কাফি হ্যায়।

আযাব আসার যে কারণগুলো—ঔদ্ধত্য, স্পর্ধা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের আদি দায়িত্বে অবহেলা সবই আমরা মুসলিমরা পূর্ণ করেছি। আর কাফিরদের জন্য হোক বা মুসলিমদের জন্য, আযাব যখন কোনো জনপদে আসে, সেটা ব্যাপকভাবে আসে। সবার জন্য আসে। কারো (কাফির) জন্য পাকড়াও, আর কারো (মুমিন) জন্য সতর্কবাণী। **আশ্চর্য, আমরা আযাবকে আযাব বলতেই লজ্জা পাই, তাহলে সতর্ক হব কীভাবে? আর ছোট আযাবে যদি সতর্ক না হতে পারি তাহলে?** 'বড় আযাবের আগে আমি তাদের ছোট আযাব আস্বাদন করাই, যাতে তারা ফিরে আসে।'[১] ছোট আযাব টের পেতে ব্যর্থ হলে, আমার জন্য এর পরের আপ্যায়ন কেমন হবে? বড় আযাব। জাহান্নাম।

আফসোস, মুসলিম সন্তানের কাছে আজ জাহান্নামও মামুলি ব্যাপার। মুসলিম হয়ে যেহেতু জন্মেছি, সাজা খেটে একদিন তো জান্নাতে যাবই। আল্লাহর খাতায় আমি এখনো মুসলিম আছি, শিওর? শরিয়তের অকাট্য বিধান অস্বীকার করলে ঈমান থাকে না। আমল করতে পারছি না, সেটা ভিন্ন বিষয়। সেটা আমার ঈমানের দুর্বলতা। কিন্তু অস্বীকার করলে তো ঈমানটাই থাকবে না। **দেখেন তো ভেবে, আল্লাহর কী কী হুকুম আমার পছন্দ হয় না। মনে হয়, কী দরকার ছিল এই বিধানের। কোনো কোনো বিধান শুনে মনে হয়—'এ যুগে কী আর ওসব চলে' কিংবা 'এমন না হয়ে ওমন হলে ভালো হতো।'** ওযুভঙ্গের কারণ যেমন আছে, ঈমানভঙ্গেরও কারণ আছে (শেষের দিকে আলোচনা আছে)। ক'জন জানি? আমার অজান্তেই ঈমান হারিয়ে বসে নেই তো আমি? ইয়া আল্লাহ, আমি জানতাম না, তাই অমন বলে ফেলেছি। **'না জানা'-কে আল্লাহ কাল-হাশরে কোনো ওজর হিসেবে গ্রহণ করবেন না। আমার কাছে আলিম ছিল, মসজিদে ইমাম ছিল, নেট ছিল, অসংখ্য ইসলামি বই ছিল, হাজারো পিডিএফ ছিল, দ্বীনি বন্ধু ছিল। আমার জানতে ইচ্ছে হয়নি, তাই জানিনি। জানার প্রয়োজন মনে করিনি, তাই জানিনি। জানাও ফরজ ছিল আমার ওপর। না জানাটা মানে আরেকটা ফরজ হুকুমের তোয়াক্কা না করা।** সেদিন আর কাকে দোষ দেবো, যেদিন খোদ শয়তানও বলবে : 'খবরদার আমাকে দুষবে

[১] সুরা সাজদা, আয়াত : ২১

না, কেননা তোমাদের ওপর আমার কোনো আধিপত্য নেই। আমি কেবল রাস্তা দেখিয়েছি। গুনাহের রাস্তায় তুমি নিজেই হেঁটেছ।'[১]

আল্লাহর এই গযব আমি তো মনে করি আমাদেরই উদ্দেশে। আমাদেরকে সতর্ক করতে। আমাদের পাপের ভারা পূর্ণ। **আমাদের উদাসীনতা, দায়িত্বহীনতা, স্পর্ধা আর কাফিরপ্রেম চূড়ায় পৌঁছে গেছে। ইতিহাসের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছি আমরা।**

[১] যখন সবকিছুর ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, 'আল্লাহ তোমাদের সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা ভঙ্গ করেছি। আমার তো তোমাদের ওপর কোনো আধিপত্য ছিল না। আমি শুধু তোমাদের আহ্বান করেছিলাম আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। কাজেই তোমরা আমায় দোষারোপ কোরো না, তোমরা বরং তোমাদের নিজেদেরই দোষারোপ করো। আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নই, তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও। ইতঃপূর্বে তোমরা যে আমাকে (আল্লাহর সাথে) শরিক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করছি। আর জালিমদের জন্য তো আছে ভয়াবহ শাস্তি। [সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ২২]

আযাব, না ভাইরাস?

আল্লাহর গযব বা আযাব প্রাথমিকভাবে সতর্ক করার জন্য আসে। কী কী দিয়ে দুনিয়াতে আযাব দেওয়া হয়। আযাবের জন্য আল্লাহ কী কী ব্যবহার করেন?

- **আদ জাতিকে প্রবল ঝড় দিয়ে।** আজকের যুগে একে 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ' বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। বায়ুচাপের তারতম্যের কারণে উচ্চচাপের এলাকা থেকে নিম্নচাপের এলাকায় বায়ু প্রবাহিত হয়ে ঝড় হয়। এটুকু বিজ্ঞান আপনাকে বলবে। বস্তুজগতের বাইরে কোনো ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে পারে না। **কোনো পিয়ার রিভিউ জার্নাল কখনোই বলবে না, 'আমরা এর কারণ খুঁজে পেতে ব্যর্থ, অতএব এটা একটা অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা।' বরং প্রতিটি ঘটনার কোনো না কোনো বস্তুগত ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে চেষ্টা করে।** কারণ এটাই তার কাজ। 'প্রকৃতিবাদ'কে নিজের চালকের আসনে বসিয়ে বিজ্ঞান অতিপ্রাকৃত কিছুকে কীভাবে মেনে নিতে পারে? বিজ্ঞান নামক tool-টার সাথে ইসলামের বিরোধ নেই। প্রকৃতিবাদের নামে বিজ্ঞানবাদ স্রষ্টাকেই 'অপ্রয়োজনীয়' বলে বাতিল করে, তখন ইসলামের সাথে ১৮০ ডিগ্রি বিরোধ।

ইসলামের দর্শন হলো, আল্লাহ সৃষ্টিজগতে কারণ (cause) ও ঘটনা (effect)-কে ওতপ্রোতভাবে রেখেছেন। 'কারণ'-এর পর্দা না থাকলে সবাই আল্লাহর কুদরত (শক্তি-রহস্য) জেনে ঈমান এনে ফেলত। তখন দুনিয়া যে 'পরীক্ষাগার', সেই বিষয়টা আর থাকত না। সবাই অটোপাশ হয়ে যেত। **বাহ্যদর্শী মানুষ (সেক্যুলার-বিজ্ঞানান্ধ) আটকে যায় শুধু 'কারণ'-এর বেড়াজালে।** 'ঘটনা'র পেছনে 'কারণ'কেই দায়ী

মনে করতে থাকে। ফলে 'কারণ'-এর আড়ালে যে আসল শক্তি (আল্লাহ) কারণ ও ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তার দিকে তার দৃষ্টি যায় না। 'পশ্চিমা বিজ্ঞান' এই কারণ পর্যন্ত যায় এবং কারণের পরে আর যাবে না, সেই সংকল্প করেই সে রাস্তায় নামে। 'পশ্চিমা বিজ্ঞান' কেন বললাম, কারণ **বিজ্ঞান একসময় মুসলিমদের tool ছিল। কুরআন থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঈমানের ইন্দ্রিয় সাথে নিয়ে তারা বিজ্ঞানচর্চা করত। 'কারণ' তো বের করতেনই, কারণের পেছনে 'আল্লাহর শক্তি'কেও তারা বুঝতে পারতেন।** আমার *কাঠগড়া* বইটাতে বিস্তারিত পাবেন। ফলে **বিজ্ঞানকে কে চালাচ্ছে তার ওপর নির্ভর করবে 'ফল কী পাচ্ছেন'—আল্লাহর পরিচয়? নাকি আল্লাহকে অস্বীকার?**

- **সামুদ জাতিকে ফেরেশতার প্রচণ্ড আওয়াজের দ্বারা** ধ্বংস করা হয়েছে। এখানেও কোনো বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। কোনো ম্যাগনেটিক ইভেন্ট বা কসমিক ইভেন্ট বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।
- ফিরআউনের **কিবতি সম্প্রদায়কে কয়েকটা আযাব দেওয়া হয়েছিল পরপর,** যাতে তারা ফিরে আসে। প্রথমে দেওয়া হলো অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ।

> *তারপর আমি পাকড়াও করেছি-ফিরআউনের অনুসারীদেরকে **দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে** যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। অতঃপর যখন কল্যাণ হতো, তখন তারা বলতে আরম্ভ করত যে, এটাই আমাদের প্রাপ্য।*[১]

অর্থাৎ **ছোট যে সতর্কীকরণ আযাব আসে তা এজন্য আসে না যে, সবাইকে শেষ করে না** দেওয়া **অব্দি চলবে; বরং সেটা এসে আবার চলে যায়। শুভদিন ফিরে আসে। এই করোনাও একদিন চলে যাবে ইনশাআল্লাহ।** শুধু পার্থক্য হবে: কেউ একে আল্লাহর আযাব জেনে জীবনযাপনে সংযত হবে। ফিরে আসবে আল্লাহর দিকে। আর **কেউ বলবে : 'করোনা চলে গেছে, এটাই তো আমাদের প্রাপ্য ছিল। কারণ আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞান যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে করোনাকে আমরা পরাজিত**

---

[১] 'তারপর আমি পাকড়াও করেছি—ফিরআউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। যখন তাদের কোনো কল্যাণ হতো, তারা বলত, 'এটাই তো আমাদের প্রাপ্য।' আর যখন তাদের কোনো অকল্যাণ হতো, তখন তারা মুসা ও তার সঙ্গীদেরকে অলক্ষুণে মনে করত। সাবধান! তাদের অকল্যাণ তো কেবল আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। [সুরা আরাফ, আয়াত : ১৩০-১৩১]

করব, এটাই স্বাভাবিক।' দেখবেন, আজকেও অনেক মুসলিম এটাই বলবে যা ফিরআউনের সম্প্রদায় বলেছিল। তাদের আদর্শিক অনুসারীরা বলবে, 'এটাই তো হবার কথা যে আমরা নিজেরা এর মোকাবেলা করলাম, আর এমনটাই হওয়ার ছিল, 'মনে রেখো বিজ্ঞান লড়েছিল একা' — এই স্পর্ধার কারণে আযাবকে চিনতে ব্যর্থ হলো তারা। এরপর...

> *সুতরাং, আমি তাদের ওপর পাঠিয়ে দিলাম* ***প্লাবন****, পঙ্গপাল,* ***উকুন****, ব্যাঙ ও* ***রক্তের আযাব****, বিস্তারিত নিদর্শন হিসেবে। কিন্তু তারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল। বস্তুত তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।*[১]

আপনি চাইলে এই সবগুলোরই জাগতিক ব্যাখ্যা দিয়ে আল্লাহ, তাঁর সতর্কীকরণ এসবকিছুকে বাইপাস করতে পারবেন। **ফিরআউনের জাতি এগুলোকে মুসা আলাইহিস সালামের জাদু-ভেলকিবাজি বলে বাইপাস করেছিল। আপনি বিজ্ঞানের যুগে প্রাকৃতিক ঘটনা, স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, টেকটোনিক প্লেট নড়ে গেছে বলে সুনামি হয়ে গিয়েছিল, মাটিতে আয়রন বেশি হয়েছিল বলে পানি রক্তবর্ণ হয়ে গিয়েছিল—ইত্যাদি বলে অস্বীকার করবেন।** এই যা। পরপর সতর্কবার্তা বুঝতে ব্যর্থ হওয়া, বারবার আল্লাহকে অস্বীকার করা, মুসলিমদের ওপর অত্যাচার অব্যাহত রাখা, ফিরআউনের নিজেকে 'আল্লাহ' বলে দাবি করা এবং তার সম্প্রদায়ের মেনে নেওয়া। এরপর ফাইনাল পাকড়াও এলো। **তাহলে যেহেতু পিয়ার রিভিউড রিসার্চ জার্নাল করোনাকে অতিপ্রাকৃত কিছু বলছে না, তাহলে আমরাও অপেক্ষা করি ফাইনাল খেলার জন্য। নাকি?**

হয়তো এটুকু বুঝতে পারলাম, **সকল আসমানি বা জমিনি আযাব কিংবা আল্লাহর ক্রোধ 'বস্তু' দিয়েই দেওয়া হয়। ফলে চাইলেই এর বস্তুগত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, 'কারণ' অব্দি গিয়ে আটকে থাকা যায়। যা বিজ্ঞান করে থাকে।** কিন্তু বস্তুগত পর্দার আড়ালে বা বস্তুগত কারণের আড়ালে এর মূল উৎস যে আল্লাহর শক্তি এবং মূল কারণ যে আমাদের আমল, সেটা কেবল গায়েবে বিশ্বাসীর ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়ার কথা, যদি সেটা থাকে আর কি।

> *জলে-স্থলে যে বিপর্যয়, তা মানুষের দুহাতের কামাই...*[২]

---

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৩৩

[২] সুরা রুম, আয়াত : ৪১

কোনো পিয়ার রিভিউয়ে ঈমানদার এটা বুঝবে না। এখন আমি কোন ঈমানদার এটা আমাকে স্পষ্ট অবস্থানে যেতে হবে। ঈমান আর কুফরের মাঝে আর কোনো অবস্থান নেই। **হয় আপনাকে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর সত্যবাদিতার ওপর ঈমান আনতে হবে—পূর্ণ আত্মসমর্পণ। নয়তো পিয়ার রিভিউয়ের কাছে কুরআন-হাদিস-ঈমানকে সেকেন্ডারি রাখতে হবে।**

১৪০০ বছর আগের শ্রেষ্ঠ বংশে জন্ম নেওয়া একজন মানুষ, যে তার নবুওয়াতপূর্ব ৪০ বছরের কখনো মিথ্যা বলেছেন এমন রেকর্ড নেই, রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াসের সামনে তৎকালীন শত্রু আবু সুফইয়ান তার নামে মিথ্যাবাদিতার অভিযোগ করতে পারেনি বাকিদের সামনে নিজে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবার ভয়ে। মিথ্যা যে যে কারণে আমরা বলে থাকি, তার সবগুলো তাকে অফার করা হয়েছিল শুরুতেই। কুরাইশরা উতবা ইবনু রবিআকে পাঠাল নবিজির দাওয়াতি কার্যক্রম বন্ধ করার একটা চেষ্টা করতে। উতবার প্রস্তাব ছিল—

“

হে পুরুষ! তোমার যদি আর্থিক চাহিদা থাকে তাহলে বলো। আমাদের সকলের সম্পদ থেকে অংশবিশেষ জমা করে তোমাকে দেবো। তাতে তুমি বনে যাবে কুরাইশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। (সম্পদ) [১]

যদি বিয়ের প্রয়োজন বোধ করেন, বলেন। কুরাইশ নারীদের মাঝে যাকে ইচ্ছা বেছে নেন। আমরা আপনার কাছে ১০ জনাকে বিয়ে দেবো। (নারী) [২]

যদি রাজত্ব চান বলুন, আপনাকে বাদশাহ বানিয়ে দেবো। (ক্ষমতা) [৩]

আপনার উদ্দেশ্য যদি হয় সম্মান-গৌরব হাসিল করা, তবে আমরা আপনাকে সসম্মানে আমাদের সরদার বানিয়ে দেবো, আপনার কথার বাইরে আমরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব না। (সম্মান) [৪]

---

[১] *মুসনাদু আবি ইয়ালা* : ১৮১৮; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩৬৫৬০; *দালায়িলুন নুবুওয়াহ*, বাইহাকি : খণ্ড : ২ পৃষ্ঠা : ২০২; *দালায়িলুন নুবুওয়াহ*, আবু নুআইম : ১৮২। -হাদিসটির সনদ হাসান

[২] প্রাগুক্ত

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম* : খণ্ড :১, পৃষ্ঠা : ২৯৩; *সিরাতু ইবনি ইসহাক* : খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯৭; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা*, ইবনু কাসির : খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪৭৯; *আর-রাহিকুল মাখতুম* : খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৯৪

[৪] প্রাগুক্ত

আর আপনার মনে যদি নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে আমরা আমাদের সকল গোত্রের ঝান্ডা আপনার সামনে গেড়ে দেব। এরপর আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন আপনিই হবেন আমাদের নেতা। (নিরঙ্কুশ আমৃত্যু নেতৃত্ব) [১]

আমরা তো সাধারণত অর্থ-সম্মান-নারী-ক্ষমতার জন্যই মিথ্যা বলি। কিন্তু দেখুন, সকল প্রলোভন আর হুমকির মুখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবাব ছিল একটাই—

> তোমরা কী বলছ তা আমি জানি না। **আমি তোমাদের কাছে যে ঐশী বার্তা নিয়ে এসেছি তা তোমাদের সম্পদের লোভে নয়, তোমাদের নেতৃত্ব সম্মানলাভের উদ্দেশে নয় এবং তোমাদের ওপর রাজত্ব করার খায়েশেও নয়। বস্তুত আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন, আমার ওপর তিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং আমাকে আদেশ করেছেন, যেন আমি তোমাদের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হই।** সুতরাং, আমি আমার রবের বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। অতএব যদি তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দাও তাহলে সেটা তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য। আর যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে আমি আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ করব; যতক্ষণ না আল্লাহ আমার ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন।[২]

> আপনারা যদি সূর্যের আগুন দিয়ে একটা মশাল জ্বালিয়ে এনে দেন, তাতেও আমি আমার কার্যক্রম ছাড়তে পারব না। **আমাকে যে কাজ দিয়ে পাঠানো হয়েছে, তা ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।**[৩]

কুরাইশদের অব্যাহত হুমকির মুখে চাচা আবু তালিব যখন বাধ্য হয়ে ভাতিজা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার দাওয়াতি কাজ বন্ধ করার কথা

---

[১] *দালায়িলুন নুবুওয়াহ*, বাইহাকি : খণ্ড : ২পৃষ্ঠা : ২০২। -হাদিসটির সনদ হাসান

[২] *সিরাতু ইবনি ইসহাক* : খণ্ড : ১পৃষ্ঠা : ১৯৮

[৩] *মুসনাদু আবি ইয়ালা*, তাবারানি আওসাত ও তাবারানি কাবিরে বিশুদ্ধ সনদে। *সিরাতুন নবি সা.*, শাইখ ইবরাহিম আলি, মাকতাবাতুল বায়ান

বললেন, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তার চাচাকে জবাব দিয়েছিলেন :

“

*‘চাচাজান, আল্লাহর শপথ! তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয়, তবু **আমি এ কাজ (তাওহিদের দাওয়াহ) ছেড়ে দিতে পারব না; যতক্ষণ না আল্লাহ এ দ্বীনকে বিজয়ী করেন কিংবা এতে আমার মৃত্যু হয়ে যায়।**’*[১]

অথচ তিনি তখন অভাবী, সংসার করছেন ৫৫ বছর বয়েসী এক নারীর সাথে। যদি মিথ্যাবাদীই হন, কুরাইশদের দেওয়া সেসব লোভনীয় অফার কেন ছাড়লেন? কী তার সেই বাধ্যবাধকতা?

যাদের চোখের সামনে তিনি চন্দ্রকলার মতো বড় হয়েছেন ৪০টা বছর যারা তার কাছে সম্পদ গচ্ছিত রেখেছে, আল-আমিন (বিশ্বস্ত) নামে ডেকেছে, বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আস্থা রেখেছে। সেই লোকগুলোকেই যখন আহ্বান করলেন : তোমাদের ‘মনচাহি’ জীবন থেকে ফিরে এসো দ্বীন ইসলামের দিকে। মিথ্যা উপাস্য থেকে ফিরে এসো সত্য মাবুদ আল্লাহর দিকে। তখন এতকালের সত্যবাদিতার সাক্ষী সেই লোকগুলোই তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে দিলো, যদিও তারা জানত তাদের সাথে কাটানো ৪০টা বছর আল-আমিন কখনো মিথ্যা বলেননি। তারা জানত তাঁর কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যও নেই। তারপরও তারা তাঁকে অস্বীকার করল কী কারণে?

মিলিয়ে দেখি তো। আমরাও কি সেই একই কারণে তাঁর আনীত দ্বীনকে নিজের জীবনে আনতে চাচ্ছি না? তাঁর আনীত শরিয়তের কাছে নিজের খেয়ালখুশিকে সমর্পণ করতে অনিচ্ছুক কি আমরাও সেই একই কারণে? ১৪০০ বছর পরেও কারণগুলো সেই একই। বংশগৌরব, লাইফস্টাইল, নেতৃত্ব, জীবিকা, খাহেশাত...

---

[১] *তাফসিরু ইবনি কাসির*, খণ্ড : ৭; পৃষ্ঠা : ১৪৮, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের বর্ণনা। *সিরাতু ইবনি হিশাম* : খণ্ড, ১ ; পৃষ্ঠা, ২৬৬

গযবের সাথে যুদ্ধ

এই করোনা আল্লাহর গযব এবং 'আল-আযাবুল আদনা' (ছোট আযাব)। আল্লাহর সমস্ত গযবই বস্তু দিয়ে হয়, যার ফলে সবকিছুরই বস্তুবাদী ব্যাখ্যা হয়। কোনো **কিছুর বস্তুবাদী ব্যাখ্যা জানি বলে তা আল্লাহর আযাব নয়, এই ধারণা ঠিক নয়। করোনা তো একটা জীবাণু, একটা ভাইরাস। এটা আল্লাহর আযাব হবে কেন?** এটা **অজ্ঞতাপ্রসূত প্রশ্ন। আল্লাহ তাঁর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে যেকোনো কিছুকেই ব্যবহার করতে পারেন। মশা, পঙ্গপাল, উকুন, দাবানল, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প যেকোনো কিছু।** যেমন এক হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> *যে জাতির মাঝে (ব্যাপকভাবে) অশ্লীলতা-কুকর্ম দেখা যাবে এবং তা প্রকাশ্যেই করা হবে, সে জাতির মাঝে মহামারি ও এমন সব রোগ-ব্যধির আবির্ভাব ঘটবে, যা পূর্বের জাতিসমূহের মাঝে কখনো দেখা যায়নি। রোগ আপতিত করবেন, যা তোমাদের পূর্বে হতো না।*[১]

অর্থাৎ এই যে নতুন নতুন রোগ, এগুলো আমাদের কৃতকর্মের দরুন আল্লাহর ক্রোধের প্রকাশ। আমরা আরো দেখলাম, আল্লাহর গযব একটা ব্যাপক বিষয়। তাঁর রহমত যেমন একটা ব্যাপক বিষয়। আল্লাহকে যে গালি দেয়, তাকেও আল্লাহ একটা

---

[১] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪০১৯; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৮৬২৩; *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৪৬৭১; *শুআবুল ঈমান*, বাইহাকি : ৩০৪২, ৩০৪৩; ১০০৬৬; *মুসনাদুশ শামিয়িন* : ১৫৫৮; *আল-উকুবাত*, ইবনু আবিদ দুনইয়া : ১১; *হিলইয়াতুল আউলিয়া* : খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৩৩৩—হাদিসটি হাসান

নির্দিষ্ট সময় অব্দি অবকাশ দেন। তাকেও রিজিক দেন, প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা আটকে দেন না, সন্তান দেন। তেমনি **তাঁর গযবও ব্যাপক। যে এলাকায় আসে সে এলাকায় কাফির-মুমিন সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আযাবে গ্রেপ্তার হয়। এই কমন আযাবটাই কাফিরের জন্য 'ফাইনাল ধরা' হয়, মুমিনের জন্য আশীর্বাদ হয়ে যায়। মহামারিতে দুজন মরল, কাফিরের জাহান্নামের জীবন শুরু হলো। ধৈর্যধারণকারী ও সাওয়াবপ্রত্যাশী মুমিনের শহিদের মর্যাদা শুরু হলো।** দুনিয়ার আযাবটা মুমিনের জন্য আখিরাতের পুরস্কার হয়ে ধরা দিলো।

» **আর জীবিত উদাসীন মুমিনদের জন্য ওয়ার্নিং। এ ওয়ার্নিংয়ের পর কেউ কেউ শুদ্ধ হয়ে গেল।**

» **আর কেউ কেউ গুনাহে হঠকারিতা করতেই থাকল। ক্রমাগত গুনাহ করতে থাকা বা গুনাহের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে যাওয়া এই মুমিনটির ঈমান চলে যাওয়ার কারণ হবে।** যেমন : 'সালাত হলো ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্যসৃষ্টিকারী'—এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যে ইচ্ছাকৃত সালাত ছেড়ে দেয় সে কাফির। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ ও ইসহাক ইবনু রাহওয়াই রাহিমাহুমাল্লাহও একই মত পোষণ করেছেন। আর অধিকাংশ আলিম বলেন, বেনামাযি নগদে কাফির হবে না, তবে তার ক্রমাগত সালাত ত্যাগ তাকে কুফুরির দিকে ধাবিত করবে।[১]

ভ্যাকসিন বা ওষুধ তৈরি হলো, করোনা চলে গেল; তবু এটা প্রমাণ হয় না যে, এটা আযাব নয়। কারণ—

> *...কতক জাতিকে এর দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কিছু এখনো বাকি রয়ে গেছে, তাই কখনো তা আসে, কখনো চলে যায়।[২] তবে মুমিনদের জন্য আল্লাহ একে রহমত বানিয়েছেন...[৩]*

---

[১] *শারহু মুসলিম*, নাওয়াওয়ি : খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৯৪

[২] *সহিহ বুখারি* : ৩৪৭৩, ৬৯৭৪; *সহিহ মুসলিম* : ২২১৮; *জামি তিরমিযি* : ১০৬৫; *আস- সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ৭৪৮১; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ২৯৫২, ২৯৫৪; *মুসনাদু আহমাদ* : ২১৭৫১, ২১৭৬৩, ২১৮০৬, ২১৮১৮; *মুসনাদুল হুমাইদি* : ৫৫৪

[৩] *সহিহ বুখারি*: ৩৪৭৪, ৫৭৩৪, ৬৬১৯; *মুসনাদু আহমাদ*: ২৪৩৫৮, ২৫২১২, ২৬১৩৯; *মুসনাদু ইসহাক*

হাদিস বলছে : **মহামারি আসবে এবং চলেও যাবে।** গযব যেমন আসে বস্তুগত **মাধ্যম দিয়ে। গযব চলেও যেতে পারে** বস্তুগত মাধ্যম দিয়ে (ভ্যাকসিন/ওষুধ)। মাধ্যমের পর্দার আড়ালে আল্লাহর একচ্ছত্র রাজত্ব ও ক্ষমতার প্রকাশ বিশ্বাসীর বিশ্বাসের ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে। গাছপালা, আকাশ, ফুল, বৃষ্টি সবকিছুর অন্তরালে সে মহাশিল্পীর নিপুণ কারিগরি দেখে, ফিজিক্সের সূত্রের খটমটে ধ্রুবকগুলোর মাঝে মহাপরিকল্পনা-প্রসূত হিসেবি টিউনিং অনুভব করে। জীবকোষের ভেতর এই মুহূর্তে হাজারো বিক্রিয়া একই সাথে আনইন্টেরাপ্টেড চলতে দেখে সে এক মহানিয়ন্ত্রকের অমোঘ নিয়মকে উপলব্ধি করে। **করোনার ভ্যাকসিন আবিষ্কারের পেছনে বিশ্বাসী দেখে করুণাময়ের করুণা, নগণ্য মানুষকে দেওয়া যোগ্যতার জন্য সে মহান দাতার বদান্যতার শোকর করে। আর বস্তুবাদী কেবল বস্তুর উপাসনা করে। বস্তুর সাফল্যে অহংকারী হয়ে ওঠে। বস্তুর ব্যর্থতায় আশাহত হয়। অন্ধ সূর্য দেখে না, তাই বলে কি সূর্য নেই?**

আমরা প্রত্যেকে মৃত্যুকালে শয়তানের চূড়ান্ত প্রচেষ্টার সম্মুখীন হব, ফিতনাতুল মামাত (মৃত্যুকালীন পরীক্ষা)। শয়তান তার সর্বশক্তি দিয়ে শেষ চেষ্টা করবে ঈমানহরণের। যে জীবিতকালে শয়তানের সামান্য ইন্ধনেই কাত হতো, সে শয়তানের সর্বশক্তি নিয়োগে ঈমান ছেড়ে দেবে। হয়তো সে মারা গেল, দাফন হলো, জানাযা হলো, কুরআন খতম হলো। কিন্তু সে কাফির হয়ে মরেছে। মৃত্যুর মুহূর্তে সে ঈমান ত্যাগ করে মরেছে। সুতরাং, **'মুসলিম পরিবারে জন্ম নেওয়া'টা আপনাকে জান্নাতের গ্যারান্টি দেয় না। বরং 'ঈমান নিয়ে মৃত্যু' আপনাকে জান্নাতে পৌঁছাবে। আর ঈমান নিয়ে মৃত্যু তখনই গ্যারান্টেড যখন আপনি পুরোটা জীবন ঈমানের ওপর চলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করবেন, তাওবার মাধ্যমে ফিরে আসবেন আল্লাহর দিকে।** আল্লাহ বলছেন—

> *নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের রব (প্রতিপালক+অধিকারী Master) আল্লাহ। অতঃপর (এই কথার ওপরেই) অবিচল থাকে। তাদের কাছে (মৃত্যুকালে) নাযিল হয় ফেরেশতা। (এবং বলে) ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না। সেই জান্নাতের সুসংবাদ নাও, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।*[১]

ইবনি রাহওয়াই : ১৩৫৩, ১৭৬১; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ৬৫৬০; আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ি : ৭৪৮৫

[১] সুরা ফুসসিলাত (হা-মীম-সাজদাহ), আয়াত : ৩০

মৃত্যুকালে আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে আপনার ঈমান নিশ্চিত করে, আপনাকে কমফোর্ট করে জান্নাত নিশ্চিত করবেন। **শর্ত হলো আল্লাহকে তাঁর অধিকার দিতে হবে, রব হিসেবে, আপনার মালিক হিসেবে, আপনার পালনকর্তা হিসেবে তাঁর যে স্থান আপনার জীবনযাত্রায় তাঁর প্রাপ্য, সেটা তাঁকে দিতে হবে এবং মৃত্যু তক সেই জীবনের ওপর আপনাকে অটল থাকার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।** এটা আপনারই কাজ। নয়তো আল্লাহর নিজস্ব কোনো ঠেকা নেই, মুসলিম পরিবারে জন্ম বলে আমাকে জান্নাত দিতেই হবে।

তো, করোনা আল্লাহর ক্রোধের প্রকাশ। আপনার ঈমানের এন্টেনায় এটুকু ধরা পড়তে হবে। না হলে প্রবলেম। প্রশ্ন আসতে পারে : তাহলে আল্লাহর গযব ঠেকানোর জন্য এই যে মাস্ক-পিপিই-ভ্যাকসিন এগুলো তো বেয়াদবি হচ্ছে, আল্লাহর রাগকে কাউন্টার দেওয়া কি ঠিক? দেখুন—

» **গযব এসেছে রোগের সুরতে**

» নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার চিকিৎসা-আরোগ্য সৃষ্টি করেননি।[১] এই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে মুসলিম সভ্যতায় চিকিৎসাবিজ্ঞান সাধন করেছিল অভূতপূর্ব উন্নতি। বিভিন্ন সভ্যতার গ্রন্থানুবাদ—বিশ্লেষণ, নতুন ওষুধ সন্ধান, ডোজিং, ফার্মাকোলজি ডেভলপ করেছিল, যার ওপর ভিত্তি করে আধুনিক ইউরোপীয় মেডিসিন গড়ে উঠেছে। সার্জারি যন্ত্রপাতি ডেভলপ, সার্জারি প্রক্রিয়া গঠন হয়েছিল যার অনেক কিছু আজও আমরা ব্যবহার করি। সুতরাং, **রোগ নিয়ে গবেষণা, এটাও ইসলামের বিধান থেকে উৎসারিত ও উৎসাহিত।**

» হাদিসের হুকুম হলো—মহামারি গযব। **মহামারির সময় যথোচিত বস্তুগত ব্যবস্থা নিতে আদেশ দিয়েছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।** নিজেকে দূরে রাখো, ওই স্থানে যেয়ো না, সেখান থেকে বের হয়ো না। সুস্থ উটের সাথে অসুস্থ উট মিশিয়ো না। পবিত্রতা মেইনটেইন করো (তাহারাত)। ক্ষতিকর প্রাণী হত্যা করো।

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৫৬৭৮; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৪৩৯; *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ৭৫১৩; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ২৩৪১৬; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ১৯৫৫৭

সুতরাং, বস্তুবাদ বলছে, মহামারি বস্তুগত কারণে হলো (ভাইরাস ইত্যাদি), বস্তু দিয়ে সমাধান করো (ভ্যাকসিন ইত্যাদি)। আর ইসলাম বলছে, **বস্তুগত মাধ্যমের (ভাইরাস) আড়ালে আসল উৎস আল্লাহর ক্রোধ (তোমাদের গুনাহের কারণে), ফলে আসল উৎস সামলাও (তাওবা-আমল দ্বারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করো)** এবং **মাধ্যম সামলাও (ওষুধ, হাইজিন ইত্যাদি)**। ইসলাম হলিস্টিক সিস্টেম—টোটাল (ইহজগত+পরজগত), উট বেঁধে তাওয়াক্কুল। শুধু বিশ্বাসে ভর করে হাত গুটিয়ে থাকা নয়, আবার বিশ্বাসহীন বস্তুগত গোঁড়ামিও নয়। এটাই ইসলাম আর অন্যান্য ধর্মের পার্থক্য।

স্পর্ধানামা

সুতরাং, **স্প্যানিশ ফ্লু, প্লেগ, ডেঙ্গু, করোনা, পঙ্গপাল, ইসরাইলের দাবানল, অস্ট্রেলিয়ার দাবানল, সুনামি, নান্দনিক নামের সব সাইক্লোন, ভূমিকম্প এমনকি মুসলিমদের অন্তর্কোন্দল, নেতৃত্বহীনতা, কাফির কর্তৃক নির্যাতন এ সবই আল্লাহর গযবের প্রকাশ ও সতর্কবার্তা।**

প্রথমদিকে আলোচনায় আমরা দেখেছি আযাব আসার এপিসেন্টার হলো স্পর্ধা। কাফির স্পর্ধা দেখাবে, স্বাভাবিক। আর **আমরা মুসলিমরা আল্লাহকে চিনি, এরপরও স্পর্ধার সীমা অতিক্রম করেছি। কাফিরদের প্রতিটি ভঙ্গি অনুকরণ করেছি।** যেমনটা বনি ইসরাইল করত। তারা ছিল আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতপ্রাপ্ত জাতি, আল্লাহর অলৌকিক কুদরত তারা স্বচক্ষে দেখত। আল্লাহ বলছেন—

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

> *হে ইসরাইলের বংশধরগণ! আমার সে নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা দ্বারা আমি তোমাদের অনুগ্রহ করেছিলাম। আর নিশ্চয় আমি সমগ্র সৃষ্টিকুলের ওপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।*[১]

আল্লাহ বারবার তাদেরকে সম্মানিত করেছেন, অলৌকিকভাবে সাহায্য করেছেন।

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ৪৭

আল্লাহকে বারবার চেনার পরও আল্লাহর ইহসানের বিপরীতে বারবার তারা কুফরির পথই বেছে নিয়েছে। সুরা বাকারাতে আল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাদের কীর্তিকলাপ।

আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত	তাদের অকৃতজ্ঞতা
ফিরআউনের নৃশংস জুলুম থেকে উদ্ধার করেছেন।	এত কিছু দেখার পরও, আল্লাহর এত পরিচয় দেখার পরও তারা গোবৎসের পূজা করল।
চোখের সামনে সাগর ভাগ হয়ে গেল। তার ভেতর দিয়ে হেঁটে পার হলো।	
ফিরআউনকে দলবল-সহ ডুবিয়ে মেরেছেন। তারা স্বচক্ষে দেখেছে।	
পাথর ফেটে ১২টা ঝরনা বের করেছেন, তা থেকে তারা পানি পান করেছে [সুরা বাকারা, আয়াত : ৬০]	
মুসা আলাইহিস সালামকে চল্লিশ দিনের জন্য তুর পাহাড়ে রেখেছেন তাদের জন্য ইহকাল-পরকালে সুখের একটা গাইডলাইন পাঠাবেন বলে।	
আল্লাহ তাদেরকে সুশৃঙ্খল জীবন পরিচালনার জন্য দিয়েছেন তাওরাতের শরিয়ত।	তারা বলেছে, 'হে মুসা! আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনো বিশ্বাস করব না।' [সুরা বাকারা, আয়াত : ৫৫] অথচ মুসা আলাইহিস সালাম যে আল্লাহর নবি, তারা তা স্বচক্ষে দেখেছে।
তারা ৭০ জন প্রতিনিধি পাঠাল আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার জন্য। তুর পাহাড়ে গিয়ে তারা নিজ কানে আল্লাহর বাণী শুনল।	এরপরও তারা বলল, নিজ চোখে দেখতে চাই।

বজ্র তাদের গ্রাস করল। মুসা আলাইহিস সালামের অনুরোধে আল্লাহ আবার তাদেরকে পুনর্জীবিত করলেন। তারা ফিরে এসে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলো।	এরপরও তারা পরিষ্কারভাবে বলে দিলো, আমাদের দ্বারা এ গ্রন্থের ওপর আমল করা সম্ভব হবে না। ফলে তুর পাহাড় মাথার ওপর ঝুলিয়ে রেখে আনুগত্যের অঙ্গীকার করানো হলো। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৬৩, ৯৩]
খাওয়ার জন্য জান্নাত থেকে মান্না-সালওয়া দেওয়া হয়েছে।	তারা বলেছে, 'হে মুসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনো ধৈর্য ধারণ করব না। সুতরাং, তুমি তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা করো—তিনি যেন আমাদের জন্য ভূমিজাতদ্রব্য শাক-সবজি, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ উৎপাদন করেন'। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৬১]
আল্লাহ বললেন, ঠিক আছে, তাহলে এই জনপদ দখল করো, সেখানে চাষাবাদ করো।	তারা বলল, মুসা, তুমি আর তোমার আল্লাহ গিয়ে যুদ্ধ করোগে। অথচ তারা কিন্তু প্রথম থেকেই দেখে আসছে যে আল্লাহ তাদের সাহায্য করছেন।
শহর দখলে আসার পর আল্লাহ বললেন, ঢোকো। দরজা দিয়ে নতশিরে প্রবেশ করো। আর বলো, 'ক্ষমা চাই।' [সুরা বাকারা, আয়াত: ৫৮]	তারা তা না করে শব্দ বিকৃত করে 'গম চাই' বলতে বলতে ঢুকল।
বারবার তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন।	তারা নবিদেরকে হত্যা করেছে।

পরিশেষে আল্লাহ তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত অভিশপ্ত করলেন। আল্লাহ দুইবার কাফিরদের (পারসিক ও রোমান) ব্যবহার করে তাদেরকে আযাব দিয়েছেন। রাজ্য দুভাগ হয়ে গেছে। ৭২ দলে দলাদলি করেছে।

আর সে সময়টির কথা স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ঘোষণা করলেন যে, নিশ্চয় তিনি তাদের (ইহুদিদের) ওপর কিয়ামত পর্যন্ত এমন লোক (শাসক) প্রেরণ করতে থাকবেন, যারা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে থাকবে। নিশ্চয় আপনার রব শাস্তিদানে খুবই ক্ষিপ্র এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।[১]

মিলিয়ে নিন আজ আমাদের সাথে। কাফিরদেরকে আল্লাহ তাআলা আজ আমাদের ওপর প্রবল করে দিয়েছেন। কতগুলো রাষ্ট্রে কতগুলো দলে উম্মাহ বিভক্ত! কী করেছি আমরা? **কী স্পর্ধা দেখালাম যে, বনি ইসরাইলের মতো হুবহু একই পরিণতি হচ্ছে আমাদের?** চলুন খুলে দেখি হিসেবের খতিয়ান।

১ম স্পর্ধা : ধর্মনিরপেক্ষতা/সেক্যুলারিজম

১.১ রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতা

খুব খারাপ শোনাবে কথাগুলো। দাঁত চেপে শুনবেন আর নিজের জীবনের সাথে মেলাবেন। **কসম আল্লাহর, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে আমাদের জীবন থেকে বের করে দিয়েছি।** আল্লাহ বলছেন—লিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর।[২] মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রব্যবস্থা আমরা সেক্যুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) করে ছেড়েছি। আমি **সকল পর্যায়ের নেতাকর্মী ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাদেরকে দাওয়াহর নিয়তে নসিহত করছি। আপনারা তাওবা করুন, আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করুন। কার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন? কাকে বাদ দিয়ে দেশ চালাচ্ছেন? কাকে বাদ দিয়ে সংবিধান করছেন? ইউরোপীয়দের পাল্লায় পড়ে আল্লাহর সাথে অনেক লড়েছেন, আর নয়। এবার ক্ষান্ত দিন।**

» **'আল্লাহর ওপর বিশ্বাস'-এর কোনো জায়গা আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে নেই। কোনো পলিসিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে রাখা হয় না। আল্লাহ এই পলিসিতে**

---

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৬৭

[২] لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সবকিছুর সার্বভৌমত্ব-রাজত্ব একমাত্র আল্লাহরই। (সুরা মায়িদা, আয়াত : ১২০)

কী করতে বলেছেন, তা বলার মতো লোক আপনাদের পলিসি লেভেলে থাকে না। একজন নামেমাত্র সংবিধানে ঢুকিয়েছিল, সেই নামেমাত্র 'আল্লাহর নামটুকু সংবিধানে থাকবে', তাও আমাদের সহ্য হয়নি। দলাদলি আর দলীয় অন্ধত্ব এই পর্যায়ে গেছে, আল্লাহর নাম... কার নাম? 'আল্লাহর নাম' আমরা বের করে দিয়েছি।

» কাফিরদের সন্তুষ্টি পেতে, কাফিরদের দেওয়া উন্নয়নসূচকে স্থান পেতে আমরা নারীনীতি করি কাফিরদের মতো করে। আল্লাহ ও রাসুল কী বললেন, তার সেখানে জায়গা নেই।

» অসাম্প্রদায়িকতার নামে শিক্ষানীতি করি বিধর্মী-স্তুতি দিয়ে, যা আল্লাহ ও রাসুল থেকে নিয়ে যায় দূরে বহু দূরে। খোদ পশ্চিমা একাডেমিয়ায় যেগুলো এখনো বিতর্কিত, সেগুলোকে (নারীবাদ, মানবতাবাদ, বিবর্তনবাদ প্রভৃতি কুফরকে) ধ্রুবসত্য ও আধুনিকতার স্কেল হিসেবে শেখাই আমাদের সন্তানদের।

» এমনি করে আইনসভায় আইন করার সময় আল্লাহ ও রাসুলের কথার কোনো স্থান নেই। মদ ও পতিতার লাইসেন্স দেবার সময় আল্লাহর সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা নেই।

» অর্থব্যবস্থায় 'আল্লাহ যে সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন' তার কোনো পরোয়া নেই।[১] আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে আমাদের কোনো ভয় নেই।

» পরিবার পরিকল্পনা নামে আমরা একটা মন্ত্রণালয়ই বানিয়ে নিয়েছি যাদের কাজ 'আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করা' (টিউবেকটোমি ও ভ্যাসেকটোমি)।

» দণ্ডবিধিতে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাখিনি। আল্লাহ আর তাঁর রাসূল এ যুগে 'অচল'? কুরআনে নানা জায়গায় বিধান-আইন বলে দিয়ে আল্লাহ বলছেন : 'এগুলো হলো আল্লাহর নির্ধারণ। আর (যারা এটা অস্বীকার করবে, সেই) কাফিরদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'[২] মহারাজাধিরাজ আল্লাহর বেঁধে দেওয়া দণ্ডকে 'অমানবিক' বলেছি, 'এ যুগে অচল' বলেছি। কত বড় সাহস আমাদের! এত বড় সাহস গত ১৪০০ বছর মুসলিমরা কখনো দেখায়নি।

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত :২৭৯

[২] সুরা মুজাদালাহ, আয়াত :৪

নামেমাত্র যেটুকু 'আল্লাহর ওপর বিশ্বাস' রাষ্ট্রনীতিতে কথার কথা হিসেবে ছিল, নাস্তিক-বাম মুরতাদ বুদ্ধিজীবী আর কাফির প্রতিবেশীকে পাশে পেতে সেটুকুও আমরা খেদিয়েছি। **মুখে মুসলিম দাবি করে এত বড় স্পর্ধা আমাদের। আল্লাহকে বের করে দেওয়ার স্পর্ধা। আল্লাহর সিদ্ধান্ত তোয়াক্কা না করার দম্ভ আর ঔদ্ধত্য আমাদের। সীমা বেঁধে দিয়ে আল্লাহ বলেছেন 'খবরদার, এটুকু আমার সীমা, এই সীমা লঙ্ঘন করবে না।' আর আমরা দম্ভের সাথে ঘোষণা করছি 'আল্লাহর সীমা মানি না', 'আমরা ধর্মনিরপেক্ষ', মানে রাষ্ট্র চলবে ইউরোপীয় কায়দায়, এখানে আল্লাহর মতামতের মূল্য নেই।** এগুলো কাফিরদের মুখে মানায়, একেকজন মুসলিম আমরা এই ঘোষণা দিচ্ছি আজ।

১.১.১ খুলে ফেললাম ফুলের মালা

মধ্যযুগে মুসলিম সাম্রাজ্য যখন জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প সংস্কৃতি, আইনের শাসন, নিত্যনতুন ভূখণ্ডে মাজলুমের অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর নিরাপত্তা ও সম্মান ইত্যাদির অনন্য নজির তৈরি করছিল। ঠিক তখন মধ্যযুগে পোপ-যাজকদের সমর্থিত জমিদার ও রাজতন্ত্র ইউরোপের জনজীবন দুঃসহ করে তুলেছিল। অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ধর্মীয় দলাদলি, যুদ্ধ, মানব-রচিত বিকৃত খ্রিষ্টধর্মের কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথায় অতিষ্ঠ ইউরোপ মুক্তি চাইল। ইউরোপের দার্শনিকরা জমিদারতন্ত্রকে উৎখাত করে গণতন্ত্র আর খ্রিষ্টীয় যাজকতন্ত্রকে উৎখাত করে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার কথা বলল। নতুন এই রাষ্ট্রচিন্তায় ধর্ম বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কোনো স্থান নেই। **দুই অঞ্চলে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই প্রেক্ষাপট। একদিকে ওহিভিত্তিক শাসনের ফলে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। আরেকদিকে মানব-রচিত ধর্মের কারণে স্বার্থান্বেষী যাজকশ্রেণি সমর্থিত শাসনের ফলে অন্যায়ের সয়লাব। দুটো দুই জিনিস।** আজ ওরা গলা থেকে শেকল খুলে ফেলেছে বলে দেখাদেখি আমাকেও গলা থেকে ফুলের মালা খুলে ফেলতে হলো? একটু ভাবার ফুরসত হলো না কী করছি? কাকে দেখাতে গিয়ে কাকে রাগাচ্ছি? কাকে সাথে নিয়ে কার সাথে লাগতে আসছি?

ইউরোপ তাদের 'এনলাইটেনমেন্ট'-এ এসে সোকল্ড আলোকিত হয়েছে। আর আমরা তো আলোকিতই ছিলাম। আমাদের হিদায়াতের নুর তো সেই ৭ম শতকেই এসে গেছে।

» ১৭০০ সালে ব্রিটিশ আসার আগে আমরা তো বিশ্বে ১ নম্বর অর্থনীতির দেশই ছিলাম, চীনকে টপকে।[১] আজ ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের পর কেন আমরা বনেবাদাড়ে মলত্যাগ করি,[২] বুঝতে এত কষ্ট কেন?

» ১৭৫৭ সালে পলাশী জয় আর ১৭৬০-এ শিল্পবিপ্লব। এত এত কারখানার পুঁজি কোথা থেকে কোথায় গেল, বুঝতে এত কষ্ট?[৩]

» ব্রিটিশের দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্য কারা গড়ে দিলো, কারা তাদের সব যুদ্ধের ব্যয় মেটাল, তাদের যুদ্ধব্যয় মেটাতে গিয়ে ১ম অর্থনীতির দেশটায় ১০০ বছরে ৫২ বার দুর্ভিক্ষে ৫ কোটি লোক কীভাবে মরে গেল, বুঝতে এত কষ্ট?[৪]

» ইউরোপের তকতকে পাথরের পথঘাট, ঝলমলে শহর-বন্দর, এত এত গবেষণার ফান্ডিং কোথা থেকে গেল?

বোকা আমি এখানে বসে ভাবছি : আরে ওরা বিজ্ঞান করে কত উন্নত হয়েছে, কত নারীবাদ করে কত উন্নত হয়েছে, হিউম্যানিজম করে কত উন্নত হয়েছে। আমরাও

---

[১] সম্রাট আওরঙ্গজেব রাহিমাহুল্লাহর সময়ে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে চীনকে পেছনে ফেলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনীতিতে (World's Largest Economy) পরিণত হয়, যার মূল্যমান ছিল প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলার। এর জিডিপি ছিল সে সময়ের সমগ্র বিশ্বের ৪ ভাগের ১ ভাগ।

Angus Maddison,The World Economy, , OECD Publishing (2003), page : 261

[২] Dean Nelson (25 June 2012), India 'the world's largest open air toilet', The Telegragh

[৩] Prosperous' British India, Sir William Digby, 1901

'পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার সম্পদ স্রোতের মতো এসে জমা হতে থাকে লন্ডনে। ১৭৬০ সালের আগে যেখানে শিল্পকারখানার নাম-গন্ধও ছিল না, সেখানে হাজার হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে'
লর্ড মেকলে লিখেছেন (Lajpat Rai, Unhappy India, 1928) :

'ইংল্যান্ডে সম্পদ আসত সমুদ্রপথে। ওয়াট ও অন্যদের আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ইংল্যান্ডের যেটুকু কমতি ছিল, ইন্ডিয়া সেটুকু সরবরাহ করেছে। ইংল্যান্ডের পুঁজি বহুগুণে বাড়িয়েছে ভারতীয় সম্পদের প্রবেশ।... শিল্পবিপ্লব, যার ওপর ভিত্তি করে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সম্ভব হয়েছিল কেবল ইন্ডিয়ার সম্পদের কারণে। যা লোন ছিল না, এমনিতেই নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তা নাহলে স্টিম ইঞ্জিন ও যন্ত্রশিল্প পড়েই থাকত ইংল্যান্ডের। ইংল্যান্ডের উন্নতি মানে ভারতের লোকসান—এমনই লোকসান, যা ভারতে শিল্পকে ফাঁকা করে দিয়েছিল, কৃষিকে স্থবির করে দিয়েছিল। যেকোনো দেশ যদি এইভাবে পাচার করা হয়, সে ধনী-সম্পদশালী হলেও নিঃস্ব হয়ে যাবে।'

[৪] ১৮০১ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত ১০০ বছরে ৩১টা মন্বন্তরে ৪ কোটি ১০ লাখ মানুষ মরেছে—'না খেয়ে'। 'Prosperous' British India, Sir William Digby, 1901

এগুলো করে মধ্যম আয়ের দেশ হব। মুক্তবাজার অর্থনীতি করে উন্নত বিশ্ব একদিন হবই হব। অথচ তারা উন্নত হয়েছে নিজেদের বাজার বন্ধ করে, আমাদের শিল্প শেষ করে, শিল্পোন্নত ভারতবর্ষকে কৃষির দেশ বানিয়ে, নারী শ্রমিকদের অর্ধেক বেতন দিয়ে। নীলকুঠির সাহেব দাদনের অত্যাচার করে, মসলিন শিল্পীদের আঙুল কেটে, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে ৫ কোটি লোক না খাইয়ে মেরে এখন এসেছে হিউম্যানিজমের কটকটি নিয়ে। আর তাই কিনতে 'আবাল'বৃদ্ধবণিতা মুসলিম ছুটছি তো ছুটছিই। জাতিসংঘ নামের একটা কাকতাড়ুয়া বানিয়ে পেছন থেকে বাধ্য করছে ওদের এসব আইডিয়া দিয়ে পলিসি বানাতে, যাতে সম্পদের সাপ্লাইটা চিরকাল ইউরোপমুখীই থাকে। উপনিবেশ ছাড়লেও আয়টা যেন না ছোটে। গণতন্ত্র নামক লুডুখেলা জিনিস শিখিয়ে দিয়ে গেছে, যে তাদের মনমতো পলিসি করবে না, তাকে যেন বদলে দেওয়া যায় পরের দানে।

১.১.২ যুদ্ধটা কার সাথে

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন ১৪ শ' বছর আগে—

> *আমার উম্মত আহলে কিতাবদের (ইহুদি-খ্রিষ্টান) কদমে কদমে অনুসরণ করবে। তারা গোসাপের গর্তে ঢুকলে এরাও সেধোঁবে।*[১]

আজ ব্রিটিশ আইন আমাদের আইন, ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থা আমাদের বিচারব্যবস্থা, ব্রিটিশ এন্ট্রান্স-এফএ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, ব্রিটিশ অর্গানোগ্রাম আমাদের শাসনব্যবস্থা। ওদের গণতন্ত্র আমাদের কেন নিতে হলো? আমরা তো আওরঙ্গজেবের শাসনেই ১ম অর্থনীতির দেশ ছিলাম, শক্তিশালী শিক্ষাব্যবস্থা ছিল আমাদের।[২] ওদের ব্রিটিশ

---

[১] আবু সাইদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'অবশ্য অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির লোকদের নীতি-পদ্ধতিকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি দবের (গুইসাপ-গিরগিটির) গর্তে ঢুকে, তাহলে তোমরাও তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, (পূর্ববর্তী জাতি বলতে) এরা কি ইহুদি-নাসারা? তিনি বললেন, তাহলে আর কারা?' (*সহিহ বুখারি* : ৭৩২০; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৯৯৪; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৬৭০৩; *মুসনাদু আহমাদ* : ৯৮১৯, ১০৬৪১)

[২] উইলিয়াম হান্টার তার *ইন্ডিয়ান মুসলিমস* গ্রন্থে লেখেন—

'এ দেশটা আমাদের শাসনে আসার আগে মুসলিমরা শুধু শাসন ব্যাপারেই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল। ভারতের যে প্রসিদ্ধ (ইংরেজ) রাষ্ট্রনেতা তাদের ভালোভাবে জানেন, তার কথায় :

কমন 'ল' কেন নিতে হলো? আমাদের শারিয়া আইনেই অপরাধের হার ছিল সর্বনিম্ন।[১] ওদের ধর্মনিরপেক্ষতা আমরা কেন নিলাম? এমনিতেই হিন্দুরা উচ্চ পদে দেদারসে নিয়োগ পেত,[২] যদিও তার ফল মুসলিমদের জন্য ক্ষতিই বয়ে এনেছে বারবার।

ওদের মিথ্যা উপাস্য মনুষ্যপুত্র যীশুকে ওরা বের করেছে। **আমার প্রবল পরাক্রমশালী একক সৃষ্টিকর্তা, স্বত্বাধিকারী, আল-কাহহার, প্রতিশোধ গ্রহণকারী (মুনতাক্বিম) সর্বশক্তিমান আল্লাহকে আমি কেন বের করে দিলাম আমার সংবিধান থেকে, আমার কোর্ট থেকে, আমার টেক্সটবুক থেকে, আমার অর্থনীতি থেকে, আমার পলিসি থেকে। কোন আক্কেলে, কোন কলিজায়? কে দিলো আমাকে এত বড় সাহস?** প্রশ্ন করেন নিজেকে। বুক একটুও কাঁপল না মদের লাইসেন্স দেবার সময়। কলিজা

ভারতীয় মুসলিমদের এমন একটা শিক্ষাপ্রণালি ছিল, যেটা আমাদের আমদানি করা (ব্রিটিশ) প্রণালির চেয়ে নিম্ন হলেও (!) কোনো ক্রমেই ঘৃণার যোগ্য ছিল না। তার দ্বারা উচ্চস্তরের জ্ঞান বিকাশ ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিচ্ছন্ন হতো। সেটা পুরোনো ছাঁচের হলেও তার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় ছিল এবং সেকালের অন্য সব প্রণালির চেয়ে নিঃসন্দেহে উত্কৃষ্ট ছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থায়ই তারা মানসিক ও আর্থিক প্রাধান্য সহজেই অধিকার করেছিল।' [*ইন্ডিয়ান মুসলিমস,* উইলিয়াম হান্টার, পৃষ্ঠা : ১১৬]

[১] বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময় ভারতে এসেছিলেন স্যার থমাস রো (১৫৮১ – ১৬৪৪)। তিনি তাঁর ভ্রমণগাঁথায় উল্লেখ করেন:
সকলের ভিতর আতিথেয়তা ও দানের ঝোঁক, তার চেয়েও বড় কথা দুর্বলকে রক্ষা করা ও তাদের জানমালের নিরাপত্তার প্রতি খেয়াল রাখা— এসব এমন বৈশিষ্ট্য যা দেখে এ জাতিকে অশিক্ষিত বর্বর বলা যায় না। তাদের যেসকল গুণের কথা বললাম, তাতে ভারতীয়দেরকে ইউরোপীয় জাতিসমূহের তুলনায় কোনোভাবেই নীচ বলা যায় না।
[The Embassy of Sir Thomas Roe to India 1615-1619]

[২] আকবরের আমলে ১৪ জন হিন্দুকে 'মনসবদার' উচ্চপদে নিয়োগ দেন। আর আওরঙ্গাজেব ওই পদে ১৪৮ জন হিন্দুকে নিয়োগ দিয়েও দিলেন। [*মোগল গবর্নমেন্ট,* শ্রীশর্মা, পৃষ্ঠা : ১১১] গভর্নর পদেও হিন্দুদের নিয়োগ দেওয়া হতো। যশোবন্ত সিংকে মুসলিম এলাকা কাবুলের গভর্নর বানিয়েছিলেন আওরঙ্গাজেব। এমনকি শত্রু শিবাজির আপন জামাই অচলাজি ৫ হাজারি মনসবের সেনাপতি ছিল, আরেক আত্মীয় আজুজি ছিল ২ হাজারি। এছাড়া তার সেনাপতিদের মাঝে ছিল রাজা রাজরূপ, অর্ঘ্যনাথ সিং, দিলীপ রায়, কবির সিং, প্রেমদেব সিং। রাজস্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন রসিকলাল ক্রোরী। [*চেপে রাখা ইতিহাস,* গোলাম মোর্তজা] ভূমি ব্যবস্থাপনা (কানুনগো বিভাগ) ছিল একচেটিয়া হিন্দুদের হাতে। সামগ্রিকভাবে হিন্দু-মুসলিমে ক্ষমতার একটা ভারসাম্য ছিল। [*বাংলার আর্থিক ইতিহাস,* সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৫]

হিন্দুদের ব্যাপারে মোগল সম্রাটগণ, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ প্রমুখের এই উদারনীতি মুসলিমদের জন্য ভালো ফল বয়ে আনেনি। অমুসলিমদের উচ্চপদে নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলিমদের নিষেধাজ্ঞা আছে। যার বাস্তবতা হলো, মুসলিম ভূমি বারবার হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসনের শিকার হয়েছে।

একটুও কাঁপল না পতিতালয়ের লাইসেন্স, সুদকে বৈধতা দেবার সময়। কার সাথে লাগতে যাচ্ছি? কে তিনি?

'আর যার ওপর আমার ক্রোধ আপতিত হয়, সে তো নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যায়।'[১]

দেশ পরিচালনায় যারা রয়েছেন, সকলের প্রতি অধমের দিল-চেরা আহ্বান। দুহাত জোড় করছি, আপনারা তাওবা করেন। সংসদে তাওবা করে দুআ হয়েছে। কিন্তু আসল ভুলটা কোথায়, স্পর্ধাটা কোথায়, সীমা ছাড়িয়েছি কোথায়, তা দেখানোই আমার বই লেখার উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাওবা করুন। সকল পলিসি রিচেক করুন। আল্লাহ-দ্রোহী আইন, পলিসি সব বাদ দিন। ভয় করুন। করোনা হয়তো চলে যাবে, **কিন্তু ওই আল্লাহকে ভয় করুন যার কাছে অসহায় অবস্থায় খালি হাতে আপনাকে যেতে হবে। তিনি লক্ষবার আপনার জ্যান্ত চামড়া তুলে লক্ষবার নতুন চামড়া দিতে পারেন, প্রতিবার আপনি ছাল-ছিলার অসহনীয় যন্ত্রণাময় স্বাদ আস্বাদন করবেন। তাঁর ক্রোধকে ভয় করুন**। আপনার অফিস, আপনার সংসদ, আপনার গোপন শলাপরামর্শ কিছুই তাঁর আওতা, তাঁর কাউন্টের বাইরে নয়।

লিখতে লিখতে আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে। **কেন তাঁর ক্রোধ আমাদের ওপর আসবে না, আমাকে বলেন। স্পর্ধার কী বাকি রেখেছি আমরা গত ১০০ বছর?**

১.২ ক্যারিয়ারে সেক্যুলার

এতটুকু পড়ে হয়তো নিজেকে দায়িত্বমুক্ত মনে হচ্ছে। স্পর্ধা যা দেখানোর তা তো ক্ষমতাবানরা দেখিয়েছে, আমরা তো দেখাইনি। আমরা তো আম-মুসলিম। রাষ্ট্র-বিচার-আইন-শাসন ওসব তো আর আমার হাতে ছিল না। না, বন্ধু। **আমি আপনি এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছি গত ১০০ বছর। নিজের মতামত, ভোট, মেধা, অস্ত্র, শ্রম দিয়ে আল্লাহর সাথে স্পর্ধাকারী সিস্টেমকে সমর্থন দিয়েছি। আমরা মনে করেছি, বিশ্বাস করেছি 'রাজনীতিতে আল্লাহর কোনো জায়গা নেই'। এই আপ্তবাক্যকে আউড়িয়েছি, শিখিয়েছি, দম্ভভরে ঘোষণা করেছি। কত বড় সাহস আমার, আমি আল্লাহকে বের করে দেবার কথা বলেছি, আল্লাহর দেওয়া মাটির ওপর দাঁড়িয়ে, আল্লাহর খেয়ে আল্লাহর পরে। আপনারা কী ভাবতে পারছেন আমরা**

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ৮১

কী করেছি? What we have done? 'আল্লাহ'মুক্ত রাজনীতি করেছি গত ১০০ বছর। **কী জানি কাকে দেখানোর জন্য, কাদের সাপোর্ট পেতে পেছনে ফেলে রেখেছি কুরআনের অকাট্য সব বিধান। যেন এসব কুরআনে নেই।**

চাকরিজীবনে আল্লাহকে বের করে দিয়ে চাকরি খুঁজেছি। চাকরিতে আবার আল্লাহ কেন আসবে? জীবিকা নিয়ে আল্লাহ কী বলল, তাঁর নবি কী বলল, কোনো তোয়াক্কা করিনি। কেউ বলে দিলেও পাত্তা নেই আমার কাছে। ওসব কি এ যুগে চলে? যেন বললাম, 'মধ্যযুগীয় আল্লাহ' আর তাঁর 'মধ্যযুগীয় রাসুল'-এর কথায় এই আধুনিক যুগ চলবে? (নাউযুবিল্লাহ) এটাই তো বলতে চাই, না কি? কথা ও চিন্তার 'গতিপথ' কোনদিকে দেখেন? আমাদের কথা আর আমাদের কাজে কী পরিমাণ স্পর্ধা প্রকাশ পায়, দেখেছেন? এগুলোর মানে কী দাঁড়ায়? সহিহ মুসলিমের হাদিসে রয়েছে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের চুক্তিলেখক ও চুক্তির সাক্ষীদের ওপর লানত করেছেন।[১] নবিজির অভিশাপের কী মূল্য? ফুঃ ওসব শুনলে জীবন চলে? **আলহামদুলিল্লাহ, আজ সুদের চুক্তিলেখকের চাকরি পেয়েছি। মেয়ের জামাই কী করে? জামাই সুদের চুক্তিলেখক। মেয়ে মাইক্রোসুদ এনজিওতে চাকরি করে। একবারও তোয়াক্কা করিনি আল্লাহ কী বলেছেন এই চাকরির ব্যাপারে।** এই লেখাটি পড়তে পড়তে নিজের অন্তরের দিকে তাকান। আল্লাহর যুদ্ধ ঘোষণার কোনো পাত্তা আমার কাছে আছে কি না।

দারিদ্র্যের ভয়ে সুদে ঋণ নিয়েছি, ব্যবসা করব। **কে ঘুচাবে আমার দারিদ্র্য? কে বণ্টন করে রিজিক? আমি কি আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করে রিজিক ছিনিয়ে আনতে চাচ্ছি?** আল্লাহ বলছেন কুরআনে : 'আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন... এরপর যদি তোমরা সুদ ত্যাগ না করো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে 'যুদ্ধের' ঘোষণা শুনে নাও।'[২] হোয়াট? আমরা চাকরি-ব্যবসা করছি, নাকি আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করছি? আমরা করতে চাচ্ছিটা কী আসলে? একটু ভাবেন ভাই, আমার পরিচয়টা কী আসলে? মুসলিম? মুসলিম মানে তো আত্মসমর্পিত, এর অর্থ তো 'প্রতিপক্ষ' নয়। **আমার ক্যারিয়ার থেকে (৮ ঘণ্টা দিনে) মহাশক্তিধর আমার Owner-কে আমি বের করে দেবার দুঃসাহস দেখিয়েছি। হোম লোন, কার লোন, বিয়ে লোন, শিক্ষা লোন। হে মহাশক্তিধর পরাক্রান্ত আল্লাহর 'প্রতিপক্ষ', ক্ষান্ত দেন,**

---

[১] *জামি তিরমিযি* : ১২০৬; *সহিহ মুসলিম* : ১৫৯৮

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৭৫-২৭৯

ক্ষান্ত দেন। নিজের ওপর রহম করেন। আল্লাহর ক্রোধকে চিনে নেন।

সুরা মায়িদায় পর পর তিনটি আয়াতে আমাদের Owner, আমাদের যিনি বানিয়েছেন, সেই আল্লাহ বলছেন : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা অনুসারে যে যারা বিচারকার্য করে না...' প্রথমে বলছেন, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ। (তারাই কাফির, অবিশ্বাসী), পরের আয়াতে বলছেন, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (তারাই জালিম, অত্যাচারী)। পরের আয়াতে বলছেন : فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (তারাই ফাসিক, গর্হিত পাপাচারী)।[১] আল্লাহর এই কথাগুলোর আর কোনো ব্যাখ্যা দরকার আছে?[২] **ভার্সিটিতে সাবজেক্ট চয়েসের সময়, সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা**

---

[১] সুরা মায়িদা, আয়াত : ৪৪, ৪৫, ৪৭

[২] কুরআনের স্পষ্ট আয়াতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহর দেওয়া আইন অনুসারে বিচার না করলে সে কাফির, ফাসিক ও জালিম। আমাদের জানার বিষয় হলো, মানব-রচিত আইনে বিচার করা সুস্পষ্ট বড় কুফর নাকি কুফর দুনা কুফর (ছোট কুফর) তথা ফিসক? এর উত্তর এক কথায় দেওয়া মুশকিল। মৌলিকভাবে বলা যায়—

- কেউ আল্লাহর আইনের বিপরীতে কোনো আইন প্রণয়ন করলে সে সুনিশ্চিতই কাফির।
- অনুরূপ যে এ ধরনের কাজ সাপোর্ট করে মানব-রচিত আইনকে সঠিক ও শ্রদ্ধাযোগ্য মনে করে তারও একই বিধান।
- আর আইন নিজে না বানিয়ে কেবল আল্লাহর আইনের বিপরীতে মানব-রচিত আইনে বিচার করলে সেক্ষেত্রে এর উত্তর হবে, যদি রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সে আল্লাহর আইনকে সঠিক এবং সে অনুসারে বিচার করাকে আবশ্যক বলে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও পার্থিব স্বার্থে কখনো ভিন্ন আইনে বিচার করে অথবা অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে বিচারকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে তাহলে সে কাফির নয়; বরং জালিম বা ফাসিক। এ ধরনের কুফরকে বলা হবে 'কুফর দুনা কুফর।' অর্থাৎ এর কারণে সে মারাত্মক গুনাহগার হলেও দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে না।
- আর যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানব-রচিত আইন প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং এটার প্রতি কোনো ঘৃণা ও বিদ্বেষ না রেখে সেই আইন অনুসারেই সে নিয়মিত বিচার-আচার করে থাকে কিংবা সে আল্লাহর আইনের বিপরীতে মানব-রচিত আইনকেই সঠিক ও শ্রদ্ধাযোগ্য মনে করে অথবা মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধানকল্পে এ আইন অনুসারে ফয়সালা করাকে বাধ্যতামূলক বিশ্বাস করে তাহলে তার কুফর ও ইরতিদাদের বিষয়টি সুস্পষ্ট। এখানে তার কুফরির ব্যাপারে ন্যূনতম সন্দেহ করার অবকাশ নেই। এটাকে 'কুফর দুনা কুফর' (ছোট কুফর বা ফিসক, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে খারিজ করে না) বলে যারা বিষয়টিকে হালকা করে প্রচার করে, তারা নিশ্চিত দ্বীনের অপব্যাখ্যা করে আল্লাহদ্রোহীদের খুশি করতে

দেবার সময়, একবারের জন্যও মন বলেনি আমার Owner কী বলেছেন দেখি। এই সাবজেক্টটা নেব, না নেব না? এই চাকরিটা করব, না করব না? আমার জীবনে আমার আল্লাহর মতামতের কী মূল্য আমি দিয়েছি? বলেন, কী মূল্য আমার কাছে সর্বশক্তিমান শাস্তিদাতা এবং একইসাথে স্নেহশীল অভিভাবক Owner আল্লাহর। **আমার চাকরিই আজ আল্লাহ-বিরোধী আইন প্রয়োগের চাকরি। আমার শক্তি-মেধা-শ্রম-অস্ত্র দিয়ে আমি আল্লাহ-বিরোধী আইনকে টিকিয়ে রেখেছি। উঁচু থেকে উঁচু পদে উন্নীত হয়েছি। হে মুসলিম ভাই, আমরা কি মুসলিম আছি? নাকি আল্লাহর প্রতিপক্ষ হয়ে গেছি?** এর পরের প্রোমোশন তো 'কাফিরুন-জলিমুন-ফাসিকুন' (কাফির-জালিম-ফাসিক)। আল্লাহ বলছেন—এখনো কি ঈমানদারের সময় আসেনি অন্তর বিগলিত হবার? নিজেই বিচার করেন, এই লেখা পড়ার পর আপনার অন্তর বিগলিত, নাকি উদ্ধত? কোনো ব্যাখ্যা দিলাম না, বলবেন অপব্যাখ্যা করছি। জাস্ট কুরআন কোট করলাম।

ফেসবুকে ডাক্তারদের বেশকিছু গ্রুপ আছে। ডাক্তাররা জানেন ঔষধের সাথে পথ্য (সহযোগী খাবার) দেওয়া হয়। এরপরও আমি নিশ্চিত জানি, পথ্য হিসেবে মধু ও কালোজিরার আয়াত ও হাদিসগুলো সেখানে দিলে হিন্দু ও মুরতাদরা 'হা হা' রিয়্যাক্টে ভরিয়ে দেবে। অথচ হলুদ-আদা-রসুন-ছাগলের দুধের কথা বললে দিতো না। সেটা সমস্যা নয়। সমস্যা হলো, **বহু মুসলিম দাবিদার, এমনকি নামাযি-হিজাবিরাও হাহা দেবে। অনেকে বলবে, কোনো 'মোল্লাদের গ্রুপে' দিতে, এখানে ধর্মীয় আলাপ না করতে।** এই বিভাজনটা কীভাবে এলো? **কে আমাদেরকে বলে দিলো : সব আলাদা করে ফেলো, এগুলো থেকে আল্লাহকে আউট করে দাও। আল্লাহর নাম নিবা শুধু মসজিদে-মাদরাসায়। মসজিদ থেকে বেরিয়ে প্যান্টের ভাঁজ খুলে ফেলবা, ভুলে যাবা আল্লাহ নামে কেউ আছেন। মসজিদের ভেতরে করো ঠিক আছে, বাইরে আল্লাহর আর এখতিয়ার নেই।** জীবনের ক্ষেত্রগুলো আলাদা করে দেওয়া, সবখানে ধর্ম টেনে আনবেন না—এসব শ্লোগান তো মুসলিমের মতো শোনায় না। তাহলে আল্লাহ যে দণ্ডবিধি দিলেন, তার ওপর আমাদের ঈমান কোথায়? আল্লাহ যে অর্থব্যবস্থা দিলেন তার ওপর ঈমান কোথায়? আল্লাহ যে পরিবার-ব্যবস্থা দিলেন, তার ওপর ঈমান কোথায় আমার? তাহলে কি আমরা কুরআনের কিছু অংশ মানি, কিছু মানি না?

চায়। আমরা এদের থেকে মুক্ত এবং তারাও আমাদের থেকে মুক্ত।—শারয়ি সম্পাদক

আমরা তো মুসলিম ছিলাম। আমরা তো আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলাম। আমাদের তো সবখানেই আল্লাহ ছিলেন। অফিসে, আদালতে, ব্যবসায়, অর্থব্যবস্থায়, বিচার, শিক্ষায়। তখন জবাবদিহিতা ছিল, দুর্নীতি-ঘুষ-আত্মসাৎ আল্লাহর উপস্থিতির স্মরণে ভয়ে কল্পনাতেও আসতে পারত না। সে অবস্থায়ই তো আমরা সব সভ্যতার শীর্ষে ছিলাম। হিরা শহর থেকে মদিনা ১২০০ মাইল একজন নারী একেলা উটে চড়ে এসেছে ((অবশ্য এভাবে স্বামী বা মাহরাম পুরুষ ছাড়া নারীদের একাকী ভ্রমণ শারিয়াহসম্মত নয়), কেউ তার দিকে চোখ তুলে তাকায়নি সেসময়।[১] স্বয়ং খলিফার বিরুদ্ধে বিচার হয়েছে, রায় গেছে সংখ্যালঘু ইহুদির পক্ষে।[২] এ কেমন আইন, এ কেমন সিস্টেম, এ কেমন অফিস, এ কেমন বাজার? ইহুদি আসামি মুসলিম হয়ে গেছে। **কাফির ইসলাম গ্রহণ করেছে সিস্টেম 'দেখে'। যাকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে বোঝাতে পারতেন না, সে নিজচোখে দেখে বুঝে গেছে। আজ আমরা দেখাতে পারছি না। শারিয়া সবচেয়ে বড় দাওয়াত। সুখ-সমৃদ্ধি-নিরাপত্তা-ইনসাফ-আইনের শাসন-অধিকার-জ্ঞানবিজ্ঞানের চূড়ান্ত রূপ তো আমরা দেখেছিলাম আল্লাহর আইনের অধীনেই। তাহলে কীসে আমাকে বাধ্য করল আল্লাহকে পরিত্যাগ করতে?**

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

> *হে মানব সম্প্রদায়! কীসে তোমাকে বিভ্রান্ত করল তোমার মহান রব সম্পর্কে?"*
> *(কী তোমাকে ধোঁকা দিলো, যে তুমি তোমার বদান্য রবকে পরিত্যাগ করলে?)*[৩]

---

[১] আদি ইবনু হাতিম থেকে তিরমিযির বর্ণনা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, আল্লাহ অবশ্যই এ দ্বীনকে এমন পূর্ণতা দেবেন, একাকিনী নারী হাওদার ওপর চড়ে সুদূর হিরা শহর থেকে এসে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে। তাতে কোনো লোকের আশ্রয় দানের প্রয়োজন তার হবে না। ...আদি ইবনু হাতিম রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এই তো আমি দেখছি হাওদানশিনা নারী কারো নিরাপত্তা সঙ্গী ছাড়াই হিরা থেকে এসে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করে যাচ্ছে। (*আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া* ই.ফা., ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৯-১৩০)

[২] ঘটনা আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের সময়কার। খলিফা আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারক স্বয়ং খলিফার বিরুদ্ধে রায় দেন এক ইহুদির দায়ের করা মামলায়। বর্মের মালিকানা নিয়ে খলিফা আর ইহুদির মাঝে বিরোধের ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ। (*তাবিয়িদের ঈমানদীপ্ত জীবন;* ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা, রাহনুমা প্রকাশনী,পৃষ্ঠা ১০৮) এবং (*আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া* ই.ফা., ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫)

[৩] সুরা ইনফিতার, আয়াত : ৬

আমার আজ প্রচুর টাকা দরকার, সমাজে সম্মান দরকার, উঁচু পদ দরকার। যেকোনো মূল্যে, যেকোনো কিছুর বিনিময়ে। প্রয়োজনে আল্লাহর বিরুদ্ধে গিয়ে, আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করে, আল্লাহ-বিরোধী এই সিস্টেমটার প্রহরী হয়ে। অথচ আমি দুনিয়াতে আসার উদ্দেশ্য ছিল যেকোনো মূল্যে আল্লাহকে খুশি করা, যেকোনো কিছুর বিপরীতে আল্লাহর দাসত্ব করা।

আমি জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের (দাসত্বের) জন্য।[১]

এই উপর্যুপরি অবাধ্যতা, বিদ্রোহ আর গুনাহের ওপর অটলতা আমাকে 'দাস' (বান্দা) হয়ে কবরে যেতে দেবে তো? নাকি তাঁর 'প্রতিপক্ষ' হয়ে যাব কবরে? বিশ্বাস করুন, আমার লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। **রিজিকের জন্য আজ মহান আর-রাজ্জাকের বিরুদ্ধে আমি? ইজ্জতের জন্য আজ মহাশক্তিধর আল-মুইজ্জের বিরুদ্ধে আমি? কে আমি? আজ আমার এত শক্তি, এত সাহস?** আল্লাহর ক্রোধের উপযুক্ত আমি ছাড়া আর কে?

১.৩ আমার আমি

একটু চোখ বুজি চলেন। আমার সাথে আমার Owner -এর সম্পর্ক কেমন? সম্পর্ক মানে ভাব-বিনিময়, টু-ওয়ে। তিনি আমাকে যা যা বলেছেন, তার প্রতি আমার রেসপন্স কেমন? নাকি তাঁকে আমার দরকার নেই? সম্পর্ক পাতানো নিষ্প্রয়োজন আমার কাছে। যেখানে তিনি চাচ্ছেন আমার সাথে সম্পর্ক করতে—

» **আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাকে স্মরণ করব।**[২]
» **আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো।**[৩]
» **তুমি একহাত এসো, আমি ২ হাত আসছি। হেঁটে আসো, আমি দৌড়ে আসব।**[৪]

---

[১] সুরা যারিয়াত, আয়াত : ৫৬

[২] অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫২]

[৩] আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। [সুরা গাফির, আয়াত : ৬০]

[৪] বান্দা আমার দিকে একহাত অগ্রসর হলে আমি তার দিকে এক বাঁও (প্রসারিত দুই বাহু পরিমাণ) এগিয়ে যাই। সে আমার দিকে হেঁটে এলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। (হাদিসে কুদসি) [*সহিহ বুখারি* :

১.৩.১

আমি আল্লাহকে পাত্তা দিচ্ছি না? আমি কার ডাক অগ্রাহ্য করছি? কে তিনি? অফিসের বস, মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট? সে (পড়ুন তিনি) আল্লাহ। আসমান জমিনের একচ্ছত্র Owner. বছরের পর বছর আমি সালাত পড়ছি না, কাকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছি? পড়লেও জুমআয় দুটো ঠোকর দিয়েই দৌড়। বছরের পর বছর কুরআন খোলার সময় আমার হচ্ছে না, মানে পাত্তা পাচ্ছে না। জিকির কাকে বলে তা জানিও না, জানার প্রয়োজনও মনে করছি না। Who cares? **আল্লাহর কসম, এই করোনা, এই ভীতি এগুলো কিচ্ছু না। সামনে আমার সাথে যা যা হতে যাচ্ছে তার তুলনায় এসব কিচ্ছু না।** 'একবার দহনের পর তাকে আমি দেবো নতুন ত্বক, যাতে সে যন্ত্রণার স্বাদ ভোগ করতে পারে।'[১] এভাবে অসীম দিন কেটে যাবে, আবার সেখানকার একদিন আমাদের পার্থিব হিসেব অনুযায়ী হাজার দিনের সমান। রেডি? কী করছি আমরা? বা কী করছি না আমরা? আমার জীবন থেকেই তো আমি আল্লাহকে বের করে দিয়েছি।

১.৩.২

ফেসবুকই ধরুন। **দ্বীনী কনটেন্ট আমি অপ্রয়োজনীয় মনে করি। স্কিপ করি। 'নট মাই টাইপ' মনে করি। দ্বীন-আখিরাত-'আল্লাহ' আমার প্রায়োরিটি লিস্টে সবার শেষে থাকে।** আমার ২৪টা ঘণ্টা ক্যারিয়ার-ফ্যামিলি-ফ্রেন্ডস-টিভি-গেমস সবকিছুর মাঝে ডিস্ট্রিবিউটেড। দিনরাতের স্রষ্টা আমার জীবন-মৃত্যুর হুকুমদাতা আমার Owner আল্লাহর জন্য আমার এক মিনিটও সময় নেই। বন্ধু একটা ইসলামি পোস্টে আমাকে ট্যাগ করেছে, সেটা পড়ার জন্য ১ মিনিটও নেই। 'তাদের অন্তর আছে, তারা ভাবে না; চোখ আছে, তবু দেখে না; কান আছে, তাও শোনে না।'[২] **দুনিয়ার বাকি সবকিছু আমার কাছে আল্লাহর চেয়ে ইম্পর্টেন্ট। আল্লাহ আমার জীবনে সবচেয়ে আন-ইম্পর্টেন্ট। I am not interested in ALLAH. ওফ!!** আমাদের কথা-কাজ-

---

৭৪০৫; *সহিহ মুসলিম* : ২৬৭৫]

[১] 'নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে অবশ্যই তাদেরকে আমি আগুনে পোড়াব; যখনই তাদের চামড়া পুড়ে পাকা দগ্ধ হবে তখনই তার স্থলে নতুন চামড়া দেবো, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' [সুরা নিসা, আয়াত : ৫৬]

[২] 'তাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না; তাদের চোখ আছে, তা দ্বারা তারা দেখে না; তাদের কান আছে, তা দ্বারা তারা শোনে না।' [সুরা আরাফ, আয়াত : ১৭৯]

চিন্তাকে ভেক্টর রাশি ধরেন, দেখেন এদের গতিপথ। **শয়তান এত এত বছর ইবাদতের পর একটা বার মাত্র স্পর্ধা দেখিয়েছিল। আর আমি দিনে কতবার স্পর্ধা দেখাই?** কতবার? আমার তো একটা শেষ আছে, একদিন তো সব ঔদ্ধত্য থামবে। তারপর?

১.৩.৩

সবার সামনে আল্লাহর নাম নিতে লজ্জা পাচ্ছেন। **কোনো বক্তব্য, কোনো একাডেমিক সেশন বা লেকচার, কোনো জ্বালাময়ী ভাষণে, কোনো সাক্ষাৎকারে। ভয় পাচ্ছেন, সামনে বসা বিধর্মীরা কী ভাববে। সাপোর্ট কমে যায় কি না, লাইক কমে যায় কি না। তালি কমে যায় কি না। কাফির বস, বড়ভাই, বড় নেতার সুনজর থেকে বাদ পড়ে যাই কি না আল্লাহর নামটা নিলে।** এক তো আল্লাহর প্রসঙ্গ আনারই দরকার নেই। ধর্ম টেনে আনার কী দরকার। আর একান্তই আল্লাহর নাম নিতে হলে অফিস-আদালত-বিশ্ববিদ্যালয়ে-জনসভায়-মিডিয়ায় 'আল্লাহ' বলবা না। সৃষ্টিকর্তা, পরম করুণাময়, গড—এগুলা বলবা। ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ। বলবা শুভসকাল বা 'সবাইকে শুভেচ্ছা'। সালাম-টালাম দেওয়ার কী দরকার। বেশি দরকার হলে বলবা 'স্লামালিকুম'। অন্তত ইসলামিক তো হলো না।... **আজ আমি এত স্মার্ট হয়েছি যে, আমার Owner, আমার Sustainer (টিকিয়ে রেখেছেন যিনি) 'আমার আল্লাহ'র নাম উচ্চারণ করতে আমার লজ্জা হয়। আমার সেক্যুলার পবিত্রতা (!) নাপাক হয়।** 'জাহান্নামের স্বাদ নাও, তুমি তো দুনিয়ায় সম্মানিত ছিলে।'[১] **এত সম্মানিত ছিলে, এত জনপ্রিয় ছিলে, আমার নাম নিতেও তোমার মান যেত।**

১.৩.৪

কেউ যখন আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিয়েছে 'ভাই, কুরআনে নিষেধ আছে', 'ভাই, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো নিষেধ করেছেন।' আমরা কী বলেছি? **আমরা বলেছি—'সবকিছুতে ধর্ম টেনে আনবেন না।' মানে কী? মানে সবখানে আল্লাহ-নবির কথা শোনাবেন না। সবখানে আল্লাহ-নবির জায়গা নেই।** সবখানে জায়গা নেই, নাকি আমার কাছে জায়গা নেই? আমি শুনতে চাই না, এ ব্যাপারে আল্লাহ কী বলেছেন। কী প্রমাণ করতে চাই আমি এ কথা বলে? জিজ্ঞেস

---

[১] ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ '(বলা হবে, আজ জাহান্নামের) স্বাদ গ্রহণ করো, তুমি তো (দুনিয়ায়) ছিলে সম্মানিত, অভিজাত!' [সুরা দুখান, আয়াত : ৪৯]

করি আজ নিজেকে, আমার জীবনের কোন জায়গায় আমি আল্লাহকে তাঁর স্থানটা দিয়েছি। মুখে আল্লাহকে মানার দাবি সবাই করে, প্রতিটি আস্তিক আল্লাহকে মানার দাবি করে। একজন মুসলিম (আত্মসমর্পিত) আর একজন আস্তিকের মধ্যে পার্থক্য কী? **কী কী কাজ করলে, কোন কোন কথা বললে, অন্তরের রোখ কোনদিকে হলে আমার নাম আরবি থাকে, সরকারের আদমশুমারিতে আমি মুসলিম থাকি। কিন্তু আল্লাহর খাতায় আমি আর মুসলিম থাকি না। কীসে আমাকে নিশ্চিন্ত করল? কোন সে জ্ঞান যা আমাকে জান্নাতের ব্যাপারে এতটা টেনশন-ফ্রি করে রেখেছে। আল্লাহর কথা শুনতে চাই না, আল্লাহর নাম নিতে চাই না, পাত্তা দিতে চাই না।** মুসলিম পরিবারে জন্ম দিয়ে আল্লাহ ঠেকায় পড়ে গেছেন আমাকে জান্নাত দেবার। নাকি?

১.৩.৫

যারা কুরআনের কথা, আল্লাহর কথা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাকে পৌঁছানোর কাজটা করত, আমাদের মাঝে নবির দায়িত্ব পালন করত, তাদেরকে 'মোল্লা, মৌলভি, হুজুর' লকব দিয়ে তাচ্ছিল্য করেছি, অচ্ছুৎ অবমানব হিসেবে মার্জিনালাইজ করেছি। **যেন তাদের কথাকে পাত্তা দিতে না হয়। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায়। বলেন, আমার জীবনে এমন কে আছে যে আমাকে আল্লাহর কথা পৌঁছাবে?** জরুরি মনে করিনি, তোয়াক্কা করিনি। এমন কার সাথে আমি সম্পর্ক রেখেছি যে আমাকে আল্লাহর কথা শোনাবে? 'সেই উত্তম সঙ্গী যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যার কাজে আখিরাতের স্মরণ আসে।'[১] আল্লাহ দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান হাসিলকে আপনার ওপর ফরজ করেছেন। আলিমদের জন্য আপনার কাছে গিয়ে আপনাকে শেখানো ফরজ নয়। **ফিকহে আছে, শরিয়তের যেসব বিধান সচেতন মুসলিম সমাজের কাছে প্রসিদ্ধ কিংবা যেখানে সহনীয় দূরত্বের মধ্যে মাসআলা জিজ্ঞেস করার মতো একজন আলিম আছেন, সেখানে 'না জানার অজুহাত' বাতিল হয়ে যায়।** ওই বাসিন্দাদের 'না জানার অজুহাত' বাতিল হয়ে যায়।[২] আমার বাসার পাশে মসজিদ আছে, পাশের মহল্লার মাদরাসা আছে,

---

[১] সেই তো উত্তম সঙ্গী, যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যার কথা শুনলে আমলের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং যার কাজে আখিরাতের স্মরণ আসে। [*মুসনাদু আবি ইয়ালা* : ২৪৩৭; *শুআবুল ঈমান* : ৯০০০; *আল-আওলিয়া, ইবনু আবিদ দুনইয়া* : ২৫; *আত-তারগিব ফি ফাজাইলিল আমাল* : ৪৮২; *আল-মুনতাখাব মিন আবদ বিন হুমাইদ* : ৬৩১; *আল-মাতালিবুল আলিয়া* : ২৮১৭, ৩২৪৬। হাদিসটির সনদ সামান্য দুর্বল।]

[২] *শারহুল হামওয়ি আলাল আশবাহি ওয়ান নাযায়ির* : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা৩৮; *আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা*

আলিমদের সাথে উঠবসকারী বন্ধু আছে, আমার হাতে ফেসবুক-ইউটিউব-পিডিএফ (অনিরাপদ উৎস, তারপরও উৎস তো)। এরপরও আমার 'না জানার অজুহাত' আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ইয়া আল্লাহ, আমি তো জানতাম না। **এরপরও দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার অর্থ—আমার ইচ্ছা হয়নি। স্বেচ্ছায় আমি আল্লাহর করা ফরজকে অবজ্ঞা করেছি। এত ব্যস্ত আমি, এত আমার ডিমান্ড, দুনিয়াতে এত জরুরি আমি? আমার নিজের পিঠ বাঁচানোরই সময় আমার নেই।**

যে পরিমাণ **স্পর্ধা, ঔদ্ধত্য আর দর্প আমি আমার রব (Owner + Sustainer** + Guardian + **Master)-এর সাথে এই একজীবনে** দেখালাম, তাতে কাফির কেন, **আমিই তো তাঁর গযব বা ক্রোধের বেশি উপযুক্ত। কাফির তো চিনে নাই; আমি তাঁকে চিনে তাঁকে জেনেই যা দেখাইলাম।** দোষ আল্লাহকে দিতে পারবেন, বলেন? আসেন তওবা করি। জবান না, অন্তর ব্যবহার করে বলি :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

(লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায য-লিমীন)

আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ (দাসত্ব বা উপাসনা পাবার উপযুক্ত) আর কেউ নেই। আপনিই পবিত্র, আমিই জালিম। **আমার ওপর যে সমস্যা এসেছে, আপনার কোনো দোষ নেই, আপনি পবিত্র। আমিই দোষী। আমিই আপনার ক্রোধকে সেধে** পড়ে ডেকে এনেছি। **নিজের কর্মদোষে অটোমেটিক আপনার ক্রোধে পড়ে গেছি। আমাদেরকে মাফ করুন। আপনি ছাড়া আমরা আর কাউকে চিনি না যে মাফ করার এখতিয়ার রাখে।** হেঁচকি তুলে সিজদায় কাঁদুন : আল্লাহ, আবার নতুন করে ঈমান আনলাম আপনার ওপর, যেমন করে ঈমান আনার কথা ছিল। অতএব আপনি আমাদের মাফ করেন। কারণ, 'আপনি তো আল্লাহ।' লিআন্নাকাল্লাহ (لِأَنَّكَ اللهُ)।

১.৪ পারিবারিক সেক্যুলারিতা

তখন শীতের শেষ। ফজরের জামাআত একটা সময় ৫ :৫০ বা ৬ :০০ টার দিকে থাকে না? ওই সময়টায়। আহলে হাদিস মসজিদে প্রায় মিনিট তিরিশেক আগে জামাআত হতো। আমার বাসা থেকে হানাফি আর আহলে হাদিস মসজিদের দূরত্ব

: খণ্ড :১৬, পৃষ্ঠা :১৯৯

সমানই। খুব সম্ভব লেখালেখির জন্যই হবে, আমি আহলে হাদিস মসজিদে যেতাম আগে আগে সালাত পড়ে এসে কাজ শুরু করার জন্য। আমার বাসার সামনেই একটা দোকানঘর ভাড়া করে একজন স্যার বেশ কটা ছেলেমেয়ে পড়াতেন ঠিক ওই টাইমটায়, বাচ্চাগুলো সেভেন-এইটের হবে। আমি যেতাম আর দেখতাম, ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বাবা-মায়েরা বাচ্চাদেরকে দিয়ে যাচ্ছেন এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই সেটা ফজরের প্রারম্ভিক সময় এবং খুব বেশি সম্ভাবনা যে, এই বাচ্চারা কেউই ফজর পড়েনি। বাবা-মায়েরা ফিরে গিয়ে পড়বেন, কিন্তু এই ১৩-১৫ বছরের বাচ্চারা আর পড়বে না। অনেকগুলো ভালো ধারণা করা যায়, কিন্তু বর্তমান সেক্যুলার ক্যারিয়ারিস্ট ফ্যামিলি কালচারের কারণে সে সুধারণা আমি করতে পারলাম না। স্যরি।

কাকডাকা ভোরে আমরা আমাদের সন্তানদের কোচিং ব্যাচের জন্য ঘুম থেকে তুলে দিই, কিন্তু আল্লাহর ফরজ হুকুম সালাত তার জন্য অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা কোচিং। সালাতে উঠলে বাচ্চার শরীর খারাপ করবে, কোচিংয়ে উঠলে কিন্তু করবে না। **রামাদান মাসে পড়াশোনার অজুহাতে পরীক্ষার অজুহাতে... সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা 'আল্লাহর ফরজ বিধান' সিয়ামকে 'আমি'... কত বড় কলিজা আমার? 'আমি' ফরজ সিয়ামকে আমার সন্তানের জন্য নিষ্প্রয়োজন ঘোষণা করেছি।** সন্তানকে নাচ শেখাচ্ছি, গান শেখাচ্ছি। আমি কালচারাল মাইন্ডেড। কুরআন শেখানো? **ওসব বড় হলে 'যদি প্রয়োজন মনে করে' শিখে নেবেনে, মানে 'আমি প্রয়োজন মনে করি না'।** সিয়াম রাখলে শরীর খারাপ করবে, ফজরে উঠলে শরীর খারাপ করবে। পড়ালেখা করে, এ-প্লাস পেতে হবে। সিয়াম-সালাত করলে পিছিয়ে পড়বে। আমার আর আমার সন্তানের মাঝে আল্লাহ কোথায়? **এই আল্লাহ চাইলে আমার এই সন্তান দ্বারাই আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিতে পারেন, এই আহ্লাদের সন্তানের কারণে আমাকে সমাজে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারেন। সেই মহাশক্তিশালী আল্লাহর হুকুম 'আমি' স্থগিত করে দিচ্ছি। কে আমি?** আমার কি একটুও ভয় লাগছে না, পরিবার থেকে আল্লাহকে বের করে দিতে? যিনি আমাকে পরিবার দিলেন তাঁকেই বের করে দিলাম। আমি এগুলো লেখার সময় কিছুটা কাঁপছি।

একবারও ভাবি না, যিনি দিলেন, তিনি কেড়ে নিতে কতক্ষণ; যিনি চোখের মণি করেছেন, তিনি তো চোখের বালিও বানিয়ে দিতে পারেন। পরিবারেও আমরা সেক্যুলারিতা প্রতিষ্ঠা করেছি। **সন্তানকে ভোগবাদ শেখাই (লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে), ক্যারিয়ারিজম শেখাই ('এইম ইন লাইফ' রচনায়), শুধু দ্বীন শেখাতে লজ্জা পাই। দ্বীন শেখানোকে অপচয় মনে করি।** এক বাবাকে বললাম :

ছেলের তো এসএসসি শেষ, তাবলীগ জামাতে ৩ দিনের জন্য দ্যান; কিছু শিখুক। কমপক্ষে এটুকু শিখুক যে—আল্লাহ কে, রাসুল কে, বাপ-মা কী? শুনলাম : এই ছুটির সময়টা খুব দামি, প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নেয়া চাই। ইংলিশ স্পিকিং কোর্সে ভর্তি করিয়ে রেখেছি, এখন সময় নষ্ট করা যাবে না। সময় নষ্ট? সময় কার দেওয়া? আমার বাবার? ছেলে আইলেটস-এ ৮+ স্কোর করবে, বিদেশি ভার্সিটিতে পড়বে। বিদেশে সেটেল হবে। আর বাপকে বৃদ্ধাশ্রমের খরচ পাঠাবে, কিংবা একেলা ফ্ল্যাটে লাশ পড়ে থাকবে ৬ মাস। বিসিএস ক্যাডার হয়ে মাকে ফেলে আসবে স্টেশনে। কিংবা ছুরি গলায় ধরে বাপকে বলবে : 'কোনো মসজিদে-টসজিদে জমি দেওয়া চলবে না, চুপচাপ কবরে যাবেন।' এগুলো সবই হয়েছে, হচ্ছে। সব হবে, বাপ-মায়ের দাম চেনা হবে না। **যে ছেলে নিজের স্রষ্টাকে চেনে না, তার কাছে আপনার কী মূল্য? তার কাছে মূল্য শুধু টাকা আর পণ্যের, যার সাথে আপনিই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ছোটবেলায়।**

ভালো স্কুলের নামে কাফিরদের ব্রেইন-ওয়াশিং (পড়ুন মিশনারি) স্কুলে কাফিরের হাতে তুলে দিচ্ছি সন্তানের আনকোরা মগজ। স্রেফ দুনিয়ার জন্য। আক্কেল-দানাই ব্যাংকের ভল্টে নাকি? লাজ-শরম-আকল কিছুই আর নিজের কাছে নেই জনাব? **আধুনিক হবার জন্য বাপ হয়ে সোমত্ত মেয়েকে এমন পোশাক কিনে দিই, যেটা পরে আরেক মেয়ে হেঁটে গেলে নিজেই জুলজুল করে চেয়ে থাকি। নিজে মা হয়ে, যুবতী মেয়েকে তাই পরাই, যা নিজে পরার কথা চিন্তাও করতাম না।** আমরা তো এমন ছিলাম না ভাই? আজ কীসে আমাদের এমন করল? কে আমাদের এমন প্রতিবন্ধী, চিন্তাশক্তিহীন, 'ভেড়ার তোড়ে ভাসমান' করে দিলো?

আপনার আর আপনার সন্তানের মাঝে 'আল্লাহ' নামের একজন ছিলেন। তাঁকে চেনানো আপনার দায়িত্ব ছিল। তাঁর দিকে আমার সন্তানকে আকর্ষিত করার দায়িত্ব আমারই ছিল। আমার সন্তান আজ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শুনলে বলে, এটা তো ফকিরদের গান। 'ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশিপ' পারে, পুরো 'অপরাধী' গানটা পারে; নাজাতের কালিমাটা পারে না। বলিউড হিরোদের চেনে, ৪ খলিফাকে চেনে না, নবিকে চেনে না। শাইখ উমায়ের কোব্বাদি বলেছিলেন, আমরা ভাবি, আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তানের কী হবে। কেউ ভাবি না, আমার সন্তানের মৃত্যুর পর তার কী হবে? ১০ বছর বয়সে সালাত না পড়লে সন্তানকে প্রহারের হাদিস[১] শুনলে

[১] ৭ বছর বয়সে তোমাদের সন্তানকে সালাত আদায়ের জন্য আদেশ করো আর ১০ বছর বয়সে সালাত

আমার নাক সিঁটকে আসে? **আহ মুসলিম, আপনার এই সন্তান যখন জাহান্নামি হবে, আল্লাহকে ফরিয়াদ করবে : মালিক, আমার বাপ-মা আমাকে ফার্স্ট হতে পারিনি বলে মেরেছে, স্কুল পালিয়েছি বলে মেরেছে, এ-প্লাস পাইনি বলে বকেছে। তোমার হুকুম সালাতের জন্য আমাকে বকেনি, তোমার হুকুম ভেঙেছি বলে কখনো মারেনি। আজ এই বাপ-মাকে দোযখে দ্বিগুণ শাস্তি দাও।**[১]

আমার ঘর সয়লাব মূর্তি আর প্রাণীর ছবিতে। প্রগতির নামে, সংস্কৃতির নামে, সজ্জার নামে মুসলিমের ড্রয়িং-রুম জন্তু-জানোয়ার, লালন-রবীন্দ্র-নজরুল, মৃত বাপ-মায়ের শোপিসে ছবিতে ভর্তি। ছবি-মূর্তিতে রহমতের ফেরেশতা ঢোকে না।[২] আযাবের ফেরেশতাদের কিন্তু এসবের তোয়াক্কা নেই। আরো আছে। সেকেন্ডে ৩৬টা স্টিল পিকচার বা ৩৬ ফ্রেম গেলে নাকি তাকে বলে মুভি বা ভিডিও। ঘরে সে জিনিসও আছে। থাক, বললে দ্বীনদাররাও তেড়ে আসবেন। চেপে গেলাম। নিজেকে উদারমনা, প্রগতিমনা, ধর্মের খুটোছেঁড়া প্রমাণের কত চেষ্টা আমাদের। **ভেবেছেন একবার, আধুনিক হবার নামে 'পশ্চিমা' হবার, সংস্কৃতিমনা হবার নামে 'হিন্দু' হবার এই হিড়িক আমাদের দুনিয়াতেই কোথায় নিয়ে ফেলবে? সেক্যুলার-মনা হবার নামে আল্লাহকে ত্যাগ করার এই স্পর্ধা আখিরাতে আমাদের কোথায় নিয়ে ফেলবে?** আফটার-অল যদি আখিরাতে বিশ্বাস করেই থাকি।

১.৫ বোনদের সেক্যুলারিতা

এটা আসলে ভিন্ন কোনো স্পর্ধা নয়, এতক্ষণ যেগুলো আলোচনা করলাম, তারই অনিবার্য প্রতিফলন। হওয়ারই ছিল। **টেস্টোস্টেরোন হরমোন-জাত বৈশিষ্ট্য হলো 'প্রভাব-প্রতিপত্তি' বা ডমিনেন্স। পুরুষ সৃষ্টিগতভাবে 'আমির ম্যাটেরিয়াল'।** আর

আদায় না করার জন্য প্রহার করো।—*সুনানু আবি দাউদ* : ৪৯৫, *মুসনাদু আহমাদ* : ৬৬৮৯, ৬৭৫৬; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৭০৮; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ৩২৩৩, ৩২৩৪, ৩২৩৫, ৫০৯২; *সুনানু দারাকুতনি* : ৮৮৭, ৮৮৮। হাদিসটি সহিহ

[১] তারা (জাহান্নামিরা) আরো বলবে, 'হে আমাদের রব, আমরা আমাদের "নেতা ও বড়দের (সিনিয়রদের)" আনুগত্য করেছিলাম, আর ওরাই আমাদেরকে ভুলপথে নিয়েছে। হে আমাদের রব, ওদের "দ্বিগুণ শাস্তি" দিন আর তাদেরকে দিন মহা-অভিসম্পাত।' [সুরা আহযাব, আয়াত : ৬৭-৬৮]

[২] *সহিহ বুখারি* : ৩২২৫, ৩২২৬, ৩৩২২ ৪০০২, ৫৯৪৯, ৫৯৫৮; *সহিহ মুসলিম* : ২১০৬; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪১৫৩, ৪১৫৫; *জামি তিরমিযি* : ২৮০৪; *সুনানু নাসায়ি* : ৪২৮২, ৫৩৪৭, ৫৩৪৮ ৫৩৫০; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৬৪৯

নারী 'মামুর' ম্যাটেরিয়াল, আনুগত্য ও সহজে প্রভাবিত হবার বৈশিষ্ট্য নারীর মাঝে প্রবল। আমরা পুরুষেরা নষ্ট হয়েছি, স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে আমাদের নারীরা নষ্ট হয়েছে। একে আমি আলাদাভাবে 'নারীদের স্পর্ধা' হিসেবে দেখতে রাজি নই।

আমরা মুসলিম পুরুষেরা একেকজন পাক্কা দাইয়ুস হয়েছি, আত্মমর্যাদা ইউরোপের হাটে তুলে গায়রতহীন লো-টেস্টোস্টেরোন কাপুরুষ হয়েছি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : দাইয়ুস কোনোদিনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১] যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যায় সর্বনিম্ন ৪০ বছর সর্বোচ্চ ৫০০ বছরের দূরত্ব থেকে। কে[২] দাইয়ুস? দাইয়ুস হলো ওই পুরুষ, যার ঘরের নারীরা খুল্লামখোলা বেপর্দা ঘোরে, আর সে তা স্বাভাবিকভাবে নেয়। মেয়েকে হাত ধরে

---

[১] আম্মার ইবনু ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'তিন প্রকারের লোক কোনোদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যথা : দাইয়ুস, পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তি।' [*শুআবুল ইমান*, বাইহাকি : ১০৩১০; *মারিফাতুস সাহাবা*, আবু নুআইম : ৫২০৮, ৫২০৯; *মুসনাদু আবি দাউদ তায়ালিসি* : ৬৭৭; *আত-তাওহিদ*, ইবনু খুযাইমা : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৬৫; *সহিহুল জামি* : ৩০৬২। হাদিসটি সহিহ।]

ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—'তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন—মদে আসক্ত ব্যক্তি, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং দাইয়ুস, যে তার পরিবারে নোংরামি সমর্থন করে।' [*মুসনাদু আহমাদ* : ৫৩৭২, ৬১১৩, ৬১৮০; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ২৪৪; *মুসনাদুল বাযযার* : ৬০৫০, ৬০৫১; *শুআবুল ইমান*, বাইহাকি : ৭৪১৬; *সহিহুল জামি* : ৩০৫২, ৩০৬৩। হাদিসটি সহিহ।]

এখানে একটি মূলনীতি স্মরণ রাখা দরকার, কুফর-শিরকে লিপ্ত না হয়ে থাকলে ঈমানের ওপর মৃত্যুবরণ করা প্রত্যেক মুমিনই একদিন না একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে। গুনাহের কারণে যতদিনই সে জাহান্নামে থাকুক না কেন, আল্লাহ একদিন না একদিন তার ঈমানের বদৌলতে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাত দান করবেন। এটা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাহর স্বীকৃত মূলনীতি ও আকিদা। সুতরাং, যেসব আয়াত-হাদিসে কোনো গুনাহের কারণে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকা কিংবা জান্নাতে কোনোদিনও প্রবেশ না করার কথা বলা হয়েছে সেগুলো ধমকের অর্থে ধরা হবে। অর্থাৎ সেসব আয়াত-হাদিসে প্রকৃত অর্থেই চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকা বা কোনোদিনও জান্নাতে না যাওয়ার কথা বোঝানো হয়নি; বরং গুনাহের ক্ষেত্রে এ ধরনের কথা সাধারণত কঠিন ধমক ও দীর্ঘ শাস্তি বোঝানোর উদ্দেশ্যেই বলা হয়ে থাকে। গুনাহের জঘন্যতা ও ভয়াবহতা বোঝানোর জন্যই অনেক সময় এমন কঠিন ধমকি দেওয়া হয়ে থাকে। আরবি ভাষায় শব্দের এমন রূপক ব্যবহারের অনেক প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত আছে। তাই এ ব্যাপারটিতে আমাদের সচেতন থাকতে হবে, যেন কোনোরূপ বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়।—শারয়ি সম্পাদক

[২] *সহিহ বুখারি* : ৬৯১৪; *সহিহ মুসলিম* : ২১২৮; *জামি তিরমিযি* : ১৪০৩; *সুনানু নাসায়ি* : ৪৭৪৯, ৪৭৫০; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২০৫৪, ২৬১১, ২৬৮৬, ২৬৮৭; *মুসনাদু আহমাদ* : ৬৭৪৫, ১৬৫৯০, ১৮০৭২, ২০৫০৬, ২০৫১৫।

নাচের ক্লাসে নেয়। হাজারো মানুষের চোখের সামনে সোমত্ত মেয়েটা বাঁকা দেহে নাচে, আর গর্বে বাবার বুক ভরে ওঠে। মেয়েকে এমন পোশাক বাবা কিনে দেয়, সেই একই পোশাক পরে অন্য মেয়ে হেঁটে গেলে সেই বাবাই চোখ দিয়ে লালা ঝরায়। স্ত্রী পরপুরুষের সাথে খিলখিলিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে, স্বামীও সেটা উপভোগ করে। বন্ধুরা বৌয়ের পাশ ঘেঁষে ছবি তোলে, স্বামীই তুলে দেয়। বন্ধুরা বলে, 'ভাবী যা সুন্দরী, দোস্ত তুই তো জিতছিস', শুনে স্বামী ভাবে সে কতই না ভাগ্যবান! রাস্তার লোকে আমার বৌকে দেখে হাঁ করে চেয়ে থাকে, স্ক্যান করে আপাদমস্তক, মনে মনে মনকলা খায়; আমি দেখি, দেখে আমার খুব সুখ হয়। আমি পেয়েছি, তোমরা পাওনি, পাবে না। উঁহু... হবে না ভাই, ৫০০ বছর দূর থেকেই বিদায়, টা টা। **লক্ষ লক্ষ দাইয়ুসের ঘরের লক্ষ লক্ষ নারী ব্যতিক্রম হবে কীভাবে?** আমাদের আইকন যেমন আত্মপরিচয়হীন কামাল পাশা। আমাদের মেয়েদের আইকন তেমনি বেগম রোকেয়া-রা।

ইউরোপ যেমন ধর্মকে শত্রু হিসেবে দেখে, আমাদের মেয়েরাও ধর্মকে শত্রু হিসেবে দেখতে শিখেছে। ইসলাম সম্পর্কে, ইসলাম যে জীবন তাদের দিয়েছে তা সম্পর্কে আমাদের মেয়েদের জানাশোনা ভয়ংকর রকম কম। ভার্সিটিতে যান, সেখানে ১০০ জন মেয়ের সাথে যদি আপনি ১০ মিনিট করে কথা বলেন ইসলামে নারীর অবস্থানের ব্যাপারে, ৯৫ জনের মাঝে কোনো-না-কোনো পয়েন্টে বিভিন্ন মাত্রার ইরতিদাদ (ইসলাম ত্যাগ) দেখতে পাবেন। দেখবেন কোনো একটা টপিকে হয় কুরআনের কোনো আয়াতকে, না হয় স্পষ্ট কোনো হাদিসকে সে হয় অস্বীকার করছে, না হয় এ যুগে অচল বলে মন্তব্য করছে। ইসলামকে পুরুষতান্ত্রিক ও সেকেলে, আর পশ্চিমা সভ্যতাকে আধুনিক ও নারীবান্ধব বলে মনে করছে। খুব স্বাভাবিক। **সে ঘরে তার মায়ের নিগৃহীত জীবন আর টিভিতে পশ্চিমের বাঁধনহারা জীবন দেখতে দেখতে বড়ো হয়েছে। তুলনা করেছে। দুটোর জন্য দায়ী** তো আমরা **পুরুষরাই**। মোদ্দা কথা হলো আমরা পারিনি এবং করিনি। ইসলাম যে মর্যাদার, প্রশান্তির, আরামের আর সার্থকতার জীবন নারীকে দিয়েছিল, আমাদের 'হিন্দুয়ানি মুসলিম' সমাজ তা আমাদের নারীদের দিতে পারেনি, মানে দেয়নি আর কি। পশ্চিমা সমাজ কিন্তু নারীবাদের ঝলমলে সোনালি খাঁচা ঠিকই তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। আমরা আমাদের নিজ ঘরের মেয়েদের কাছে ইসলামের মুক্তির ডাক পৌঁছাতে পারিনি।

হে মুসলিম নারী,

» কোনো সন্দেহ নেই যে, আমরা মুসলিম পুরুষেরা বছরের পর বছর আপনাদের ওপর জুলুম করেছি।

» কৃষিপ্রধান বাঙালি মুসলিম কন্যাসন্তানকে খাটো নজরে দেখেছে।

» হিন্দুদের দেখাদেখি আমাদের বিধবাদের শাদা শাড়ি পরিয়ে রেখে দিয়েছি।

» হিন্দুদের পণপ্রথাকে যৌতুক হিসেবে আত্মীকরণ করে ঘরের বউয়ের ওপর নির্যাতন করেছি, মোহরানা তো দূর কি বাত।

» আমরা মসজিদ বানানোর সময় আমাদের নারীদের কথা ভুলেই গেছি যে, সফরে তাদের ওপরও সালাত ফরজই থাকে।

» একাধিক বিয়ে করার পর আগের স্ত্রীর সাথে ইনসাফ করিনি।

» স্ত্রীর সাথে আচরণের ক্ষেত্রে মুসলিম-এটিকেটের বালাই রাখিনি।

» কখনো কখনো তো শারীরিক অত্যাচারকেও ছাপিয়ে গেছে মানসিক অত্যাচার।

কিন্তু তার মানে কি এই যে, আল্লাহর দেয়া সমাধান আপনাদের জন্য যথেষ্ট নয়? তার মানে কি এই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও আপনাদের বঞ্চিত করেছেন? তার মানে কি এই যে, কাফির নারীদের মতো স্বাধীনতাই আপনাদের চাই?

হে মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া মেয়ে, 'নিশির ডাক' চেনেন? মাঝরাতে ৩ বার নাকি আপনার নাম ধরে কেউ ডাকবে। সেই ডাক শুনে যে ঘর থেকে বের হবে, সে মারা পড়বে। (কাল্পনিক গল্প) ঠিক এই 'সমতার নিশির ডাকে' দলে দলে আমাদের মেয়েরা বেরিয়ে পড়েছে। আমাদের মেয়েরা ইউরোপের সমতার সুরে মাতাল হয়ে ইঁদুরদৌড়ে মেতেছে বাঁশিওয়ালাদের পিছু পিছু। **অস্বীকার করেছে বায়োলজির স্রষ্টা, সাইকোলজির স্রষ্টার বেঁটে দেওয়া ওয়াজিব কর্মবণ্টন। যা তাদের নাজুক শারীরতত্ত্বের সাথে যায় না, যা তাদের মাতৃত্ব-আবেগতাড়িত মানসিক প্রোসেসিংয়ের সাথে যায় না, সেই সব পুরুষালি বোঝা তারা তুলে নিয়েছে কাঁধে।**[১] ফলে বিদ্রোহ করেছে শরীর, বিদ্রোহ করেছে মন। ইউরোপের ব্যাবসায়িক স্বার্থে নারীরা তিলে তিলে ক্ষয় করে দিয়েছে নিজের দেহ-মন-সন্তান-পরিবার। নারীর

[১] এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত জানতে লেখকের রচিত 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২.০' বইটি দেখা যেতে পারে।

দেহ-মনের সাথে মিলিয়ে যে ঘরোয়া দায়িত্ব তাদের দেওয়া হয়েছিল, তাকে তারা নিকৃষ্ট-অপমানজনক-ছোটকাজ মনে করেছে। নারীর দেহ-মনের সাথে মিলিয়ে যেসব দায়িত্ব থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোকেই তারা 'আসল কাজ', 'পুরুষের মতো হয়ে নিজেকে প্রমাণ করা', 'পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা', 'পুরুষের মতো করে মর্যাদা'—সেগুলোর পেছনেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। এর পেছনে কি পুরুষের দায় নেই? **আমরাই কি বছরের পর বছর ঘরের কাজে দিনরাত খাটতে থাকা নারীদের তাচ্ছিল্য করিনি? 'ঘরেই তো থাকো সারাদিন', 'কিছুই তো করো না', 'আমার স্ত্রী কিছু করে না, হাউজওয়াইফ।' ঘরের কাজ কোনো কাজই না, এই মাইন্ডসেটের জন্য দায়ী তো আমরাই, নাকি?** ইউরোপের খ্রিস্টান পুরুষ যা করেছে, আমরা আমাদের মেয়েদের সাথে ঠিক তাই করেছি। তাদের নারীরাও ধর্মকে ঝেড়ে ফেলেছে, আমাদের নারীরাও একই রাস্তায় বাঁচার উপায় খুঁজছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো এমন দিন আসেনি, আমাদের মেয়েরা আমাদেরকেই শত্রু ভেবেছে। পরিবারকে, পরিবার গঠনকে নিজের পিছুটান মনে করছে। নিজের সম্মানিত পিতা, খেলার সাথি বড়ভাই, প্রাণের স্বামী, কলিজার ছেলেকে মেয়েরা শত্রু ভাবছে : এরা তাকে আটকে রেখেছে, তাকে মুক্ত-স্বাধীন হতে দিচ্ছে না, তার 'নারী হয়ে ওঠা'র পেছনে জীবনকে নিজের মতো উপভোগ করার পেছনে এরাই বাধা। বাঁধ ভেঙে দাও... ন ডরাই...। **পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দিন কখনো আসেনি যে মেয়েরা গর্ভধারণকে তুচ্ছজ্ঞান করেছে। আহা, যে গর্ভধারণকে নারী নিজ নারীজন্মের পূর্ণতা ভাবত, তাকে ফেলে দেবার অধিকার চাইছে।** পশ্চিমে গবেষণা হচ্ছে Risk of Pregnancy নিয়ে, যেন এটা একটা রোগ। সারা দুনিয়ার জনসংখ্যার হার কমে যাচ্ছে নারীবাদের কারণে, ইউরোপ-আমেরিকায় আরো বেশি কমে যাচ্ছে। পুরস্কার ঘোষণা করেও বিয়ে করানো যাচ্ছে না। কে টানে ওসব ঝক্কি। এর চেয়ে একা আছি, বেশ আছি। দরকার হলে হুক-আপ করি, প্রোটেকশান নিই, গর্ভপাত করি, সেক্সটয় আছে, ভালো চাকরি করি। কী দরকার বিয়েশাদি, বাচ্চাকাচ্চার।

মুক্ত হতে গিয়ে, স্বাধীন হতে গিয়ে, স্বাবলম্বী হতে গিয়ে সে প্রধান শত্রু হিসেবে চিনে নিয়েছে নিজের পরিবারকে ও ধর্মকে। পর্দার ফরজ বিধানকে ছুড়ে ফেলেছে। গরম লাগে, দমবন্ধ লাগে, বুড়ি-বুড়ি লাগে। এই মেয়ে, তুমি জানো তুমি কী বলছ? ধর্মকে সেকেলে, নারীবিদ্বেষী, পুরুষের জুলুমের হাতিয়ার মনে করছে। গত ১৪০০ বছরের আলিমসমাজকে, সাহাবিদেরকে, এমনকি খোদ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামকে পুরুষতান্ত্রিক sexist বলতে ছাড়েনি। শেষ পর্যন্ত কোনোভাবেই নারীবাদের প্যারাডাইমে ইসলামকে কুলিয়ে উঠতে পারেনি, ছেড়ে দিয়েছে ঈমানকেই। নারীবাদের শেষ গিয়ে ঠেকে কুফরে (কুরআনের একটা আয়াত বা একটা মুতাওয়াতির হাদিস অস্বীকার কুফর)। পশ্চিমের সুরে সুর মিলিয়ে আমাদের মেয়েরা নিজ পরিবার ও ধর্মকে কথায় কথায় sexist, পুরুষতান্ত্রিক, নারীবিদ্বেষী, কুসংস্কার বলে গালি দিচ্ছে।

হাজারো মানুষের হাজারো মনমানস থেকে সুরক্ষার সকল স্তর নারী ত্যাগ করেছে। ইসলাম যে কয়েক স্তর বিশিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নারীর জন্য দিয়েছিল, সেগুলোকে উঠিয়ে দিয়ে নারীকে ভিকটিম হিসেবে শিকারযোগ্য করে তুলেছে নারী নিজেই। পশ্চিমা সভ্যতার বড়ি গিলে তুলে নিয়েছে সব বাঁধ। সহশিক্ষা, সহকর্ম, বিয়েপূর্ব প্রেম, পরকীয়া। **যে নারীকে পাওয়া ছিল কঠিন, নারীকে পেতে হলে পুরো সমাজকে সাক্ষী রেখে, উপযুক্ত সম্মানী পরিশোধ করে, স্বামী হিসেবে তার আজীবন সকল প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব নিয়ে এরপর তাকে একান্তে পেতে হতো। এখন সে নারীকে সহজেই পাওয়া যায় চোখের আড়ালে, কোনো প্রমাণ থাকে না, নিয়ে যাওয়া যায় পার্কের চিপায়, লাইব্রেরিতে স্টাডির অসিলায়, খালি ফ্ল্যাটে, হোটেলে, অফিসে কিংবা মিডিয়ায় সুযোগ দেবার লোভ দেখিয়ে।** পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ভোগ, গর্ভপাত, ড্রেনে পড়ে থাকা নবজাতক, ভিডিও তুলে ছেড়ে দেওয়া।

বেশ ইন্টেলেকচুয়াল এক এক্স-মুসলিম নাস্তিক নারীবাদী তার ফেসবুক প্রোফাইলে নিয়মিত তার গ্রুপসেক্স ও সেক্সটয়ের ছবি আপলোড করে। আরেক এক্স-মুসলিম নারীবাদীকে জিগ্যেস করা হয়ে ছিল: নাস্তিক ফেমিনিস্ট হয়ে আপনার অর্জন কী? তার উত্তর: আমি এখন নগ্ন হয়ে প্রতিবাদ জানাতে পারি। দেশী নারীবাদীদের প্রায়ই দেখা যায় পিরিয়ডের রক্তমাখা প্যাডের ছবি বা অন্তর্বাসের ছবি আপলোড দিয়ে স্বাধীনতা উদযাপন করতে। আহ কী অর্জন! আল্লাহ-রাসূল-সালাফদের অস্বীকার করে কতটুকু স্বাধীন হইবা বোন? এতটুকু হলে চলবে?

২য় স্পর্ধা : পুঁজিবাদ

আমাদের স্পর্ধা উদাসীনতার স্পর্ধা। আমি উদাসীন, আই ডোন্ট কেয়ার। এটাই প্রবল পরাক্রমশালী অধিকর্তা আল্লাহর তেজ, প্রাবল্য, বিক্রমের সাথে স্পর্ধা। তিনি বলছেন একটা কথা আমাকে আর আমি উদাসীন। 'আল্লাহকে বের করে দেওয়া' কথাটা খুব খারাপ শোনাচ্ছে, না? জি, এতটা দম্ভ আর অহংকারই আমরা দেখিয়েছি আমাদের রবের সাথে, আমাদের পালনকর্তা দয়াময় আল্লাহর সাথে। এবার চলে যাচ্ছি আমাদের দ্বিতীয় সামষ্টিক স্পর্ধায়।

পুঁজিবাদ একটা জীবনব্যবস্থা (দ্বীন)। ইসলাম যেমন জীবনের প্রতিক্ষেত্রে নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। ইসলাম ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-বাজার-আদালত-রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, সুস্পষ্ট নীতিমালা দেয়। তেমনি পুঁজিবাদকে যদিও আমরা 'অর্থব্যবস্থা' হিসেবে পড়ি, কিন্তু ফাংশনালি এটা একটা দ্বীন। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করে, নীতিমালা গড়ে দেয়। আজ আমরা নীতিমালা হিসেবে সর্বক্ষেত্রে পুঁজিবাদকে গ্রহণ করেছি, মানে আমাদের দ্বীন পুঁজিবাদ। إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ — ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম।[১] আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীনকে (ইসলাম) ছেড়ে দিয়েছি আমরা। এটা আমাদের দ্বিতীয় স্পর্ধা।

---

[১] সুরা আলি ইমরান, আয়াত : ১৯
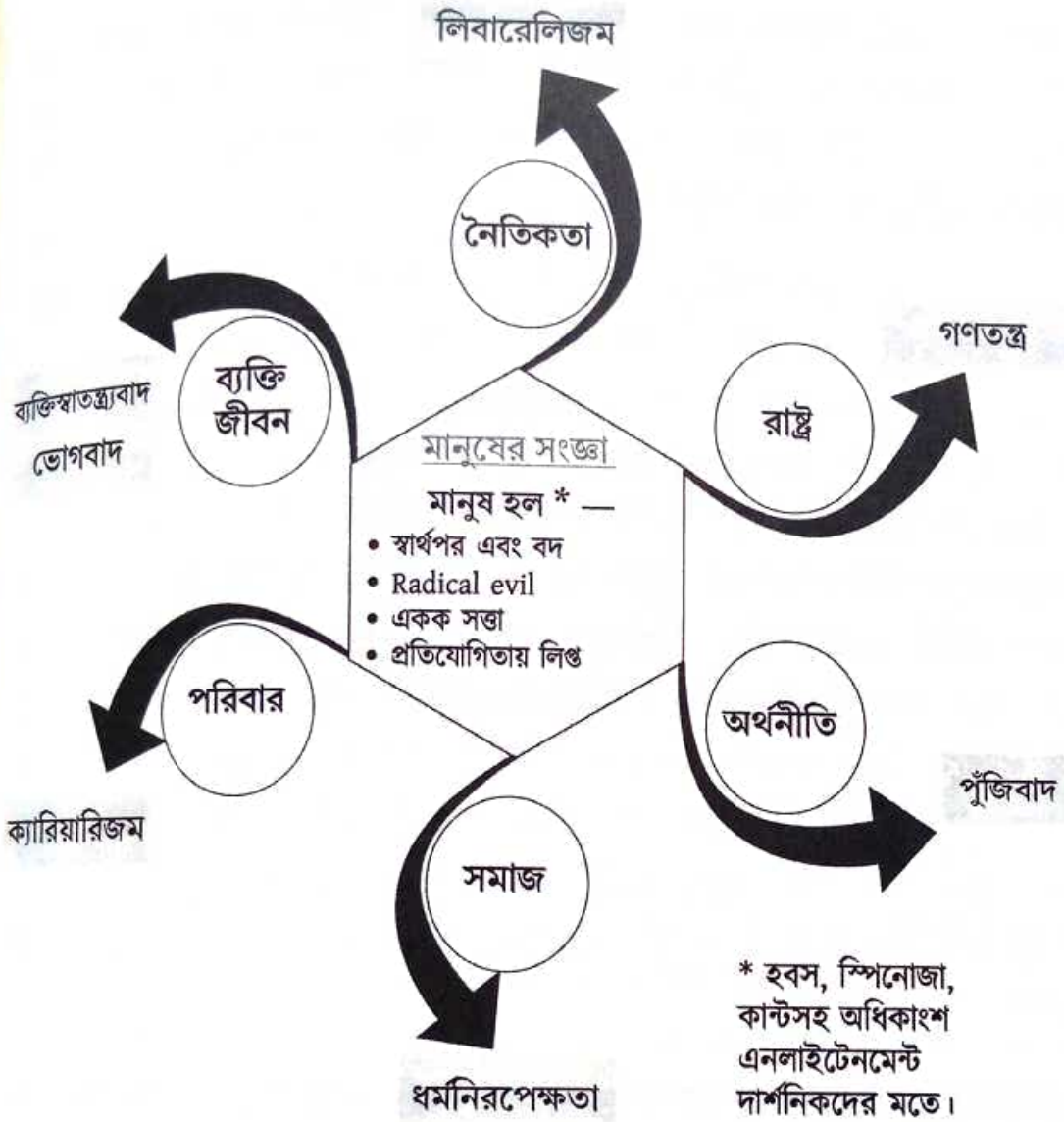
২.১

একটু ইতিহাস দেখে নিই। শিল্পবিপ্লবের আগে সারা দুনিয়া চলত কুটিরশিল্পে বা ক্ষুদ্রশিল্পে। যখন ইঞ্জিন আবিষ্কার হলো, তৈরি হলো বৃহৎ শিল্প। একব্যক্তির পক্ষে বড় বড় কারখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা কঠিন হতো, কারণ একজনের হাতে এত পুঁজি বা মূলধন থাকে না। ডেভলপ হলো ব্যাংক-ব্যবস্থা, যেখানে সমাজের সবাই টাকা রাখত। সমাজের সকলের পুঁজি একত্রিত হয়ে চলে যেত ওই পুঁজিপতির হাতে ঋণ হিসেবে, যাতে সে বড় কারখানা বানাতে পারে। কারখানা থেকে এদের প্রচুর লাভ করতে হবে। ব্যাংকের সুদ, শ্রমিকের মজুরি দিয়েথুয়ে তাকে আরো লাভ করতে হবে যাতে সে আরো মেশিন কিনতে পারে, ব্যবসা আরো বড় করতে পারে। **এই ক্রমাগত পুঁজি বৃদ্ধির প্রবণতা থেকে পুঁজিবাদ**

(Capital-ism) শব্দের উদ্ভব। কিন্তু বর্তমানে পুঁজিবাদ কেবল ব্যাবসায়িক প্রবণতায় সীমাবদ্ধ নয়। পুঁজি বৃদ্ধির প্রবণতা আজ প্রতিটি মানুষের শিরায় শিরায় প্রবহমান। যেকোনো মূল্যে 'পুঁজির আমদানি' আজ আমাদের আরাধ্য দেবতা। **Money is the second God.**

ইসলাম ও পুঁজিবাদের পার্থক্যটা বুঝতে হবে আমাদের। বিশ্বের একক হচ্ছে মানুষ। মানুষের সংজ্ঞা কেমন, তার ওপর নির্ভর করবে পুরো সিস্টেমটা কেমন। ইসলামের মতে মানুষ একটি আধ্যাত্মিক (spiritual) জীব। মানুষের উন্নতি মানে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি। একজন মানুষ যত আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত হতে থাকবে তত সে তার অস্তিত্বের পূর্ণতায় পৌঁছাবে। তার অস্তিত্বই 'আবদ' হিসেবে (দাস বান্দা)। আমি জীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের (দাসত্বের) জন্য।[১] অর্থাৎ **একজন 'আবদ' বা দাস হিসেবে আপনি যত পারফেকশনের দিকে যাবেন, তত আপনি আপনার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন, মানবজনম তত সার্থক হতে থাকবে।** ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু 'ইবাদতের জন্য' অংশটুকুর অর্থ করেছেন 'লিয়া'রিফুন' (চেনার জন্য)। আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁকে চেনার জন্য। যত চেনা হবে, তত আমার আবদিয়্যাত (দাসত্ব) পরিপূর্ণ হবে, আধ্যাত্মিকভাবে আমার উন্নতি হবে। মানুষের এই সংজ্ঞাটুকুর ওপর ইসলামের পুরো সিস্টেমটা দাঁড়ানো।

মানুষের সাথে আল্লাহর এই আধ্যাত্মিক সম্পর্ক 'ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র'-র ইসলামি সংজ্ঞা দেয়। **আমার প্রতিটি সম্পর্কের মাঝে আল্লাহ আছেন। রাষ্ট্র-প্রজা, বিচারক-বাদী, ক্রেতা-বিক্রেতা, সেবাদাতা-গ্রহীতা, উৎপাদক-ভোক্তা, চুক্তির দুইপক্ষ, পাড়াপড়শি, কাফির-মুসলিম, আত্মীয়-অনাত্মীয়, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন, এমনকি বাথরুমে একেলা বাসায় একাকী আমি। প্রতিটি সম্পর্কের মাঝে আল্লাহ রয়েছেন, এই বোধের জন্ম দেয় আবদিয়ত দাসত্বানুভূতি।** ফলে প্রতিটি সম্পর্কের মাঝে এক আশ্চর্য জবাবদিহিতা-সংযম-পরোপকার এবং ওহিভিত্তিক নীতিমালা মেনে চলার প্রবণতা ব্যক্তিকে জীবনের প্রতি কদমে 'ন্যায় প্রতিষ্ঠার তাড়না' যোগায়। কারণ তাকে তো আবদিয়্যাতের পূর্ণতা দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি করে রবকে খুশি করতে হবে। **এটা একটা সফটওয়্যার যা 'বাথরুম থেকে রাষ্ট্র' সবখানে তাকে জুলুম করতে বাধা দেবে, ইনসাফ ও কল্যাণ সাধনে তাড়িয়ে বেড়াবে।**

[১] সুরা যারিয়াত, আয়াত : ৫৬

২.২

পুঁজিবাদের চোখে মানুষ কেবল একজন 'ভোক্তা'। তার ভোগের চাহিদা সীমাহীন। অর্থনীতির সংজ্ঞা কী পড়েছিলাম, মনে আছে? অসীম চাহিদা ও সীমিত সম্পদের মাঝে ব্যালেন্স। পুঁজিবাদ প্রোডাক্ট বানাবে আর বিক্রি করে মুনাফা কামাবে, তার পুঁজি বাড়বে। তার চোখে মানুষ একজন ভোক্তা (consumer/customer), আপনি যত ভোগ করতে আগ্রহী হবেন, তার প্রোডাক্ট তত বিক্রি হবে। অতএব সে বলবে : মানবজনমের সার্থকতা হলো ভোগে। কয়দিনই বাঁচবা, ভোগ করে নাও, 'YOLO= you only live once', 'জী ভারকে জীও, কাল হো না হো'—মিডিয়া, বিনোদনের নামে এগুলো শেখানো পুঁজিবাদের কাজ। **এটা করতে গিয়ে তো ধর্ম আধ্যাত্মিকতাকে বাতিল করতে হবে। সেজন্য লাগবে নাস্তিকতা-বিবর্তন-নারীবাদ-মানবতাবাদ।** তাকে টিকে থাকতে হলে মানুষকে পরিপূর্ণ ভোক্তা বানাতে হবে, সংযমের সব বেড়া উঠিয়ে দিতে হবে।

পুঁজিবাদ আপনার মধ্যে ভোক্তা হবার অনুপ্রেরণা দেয়, **আপনার ভোক্তা হওয়াকে যারা বাধা দেয় (ধর্ম), তাদেরকে ভিলেন বানিয়ে ছাড়ে। তার চোখে আপনি যত বড় ভোক্তা, আপনার তত উন্নতি হয়েছে। গাড়ি-বাড়ি-ফোন-পোশাক-গগলস-খাবার। যত দামি যত ফ্যাশনেবল, যত বেশি, জীবনে আপনি তত সার্থক।** সমস্ত হাতিয়ার (মিডিয়া, অ্যাডুকেশন) ইউজ করে এমনভাবে আপনার মাথায় পুঁজিবাদ ঢুকিয়েছে যে, আপনিও একজন উন্নত ভোক্তা হবার চেষ্টায় দৌড়াচ্ছেন। **যেকোনো মূল্যে আপনাকে একজন পাক্কা ভোক্তা হতে হবে, এজন্য চাই প্রচুর টাকা। আপনার বাবা যে লেভেলের ভোক্তা ছিলেন, তার চেয়ে আপনাকে ওপরের লেভেলের ভোক্তা হতে হবে। সুদ-ঘুষ-দুর্নীতি-ভূমিদস্যুতা-খুন-প্রতিজ্ঞাভঙ্গা-অর্থনৈতিক সব অপরাধ করে হলেও ভোগের তাড়না মেটানো চাই।**

» **এখানে ব্যক্তি পুঁজিবাদী (ভোগের তাড়না, ক্যারিয়ারিস্টিক, অপরাধপ্রবণ)**

» **পরিবার পুঁজিবাদী (চাকরিজীবী মা; সন্তানের চোখে 'লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে')**

» **সমাজ পুঁজিবাদী (অপরাধ ও কলহপ্রবণ, আত্মকেন্দ্রিক)**

» **বাজার পুঁজিবাদী (মাপে কম, মজুতদারি, সিন্ডিকেট, প্রতারণা)**

» **অর্থনীতি পুঁজিবাদী (সুদি, খেলাপি, একমুখী প্রবাহ, পাচার)**

» রাষ্ট্র পুঁজিবাদী (পুঁজিপতি নিয়ন্ত্রিত সরকার, পুঁজিপতিরাই মন্ত্রী, পুঁজিপতি-বান্ধব পলিসি)

প্রতিটি মানুষ পুঁজিবাদী। যেকোনো মূল্যে পুঁজি বাড়ানো চাই। দুটো সিস্টেমের কনট্রাস্ট দেখেন। **একটা জুলুম করতে বাধা দিচ্ছিল। আরেকটা জুলুম করতে উৎসাহিত করছে।** ফলে আবশ্যিকভাবে প্রতিটি মানুষ কিছু না কিছু জুলুম করছে। **এই পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থাকে আমরা দ্বীন হিসেবে নিয়েছি।** 'টাকা' আমাদের আরাধ্য দেবতা, যার বেদীতে আর সব কিছুকে **এমনকি আল্লাহ-রাসুলের আদেশ-নিষেধকেও বলি দিয়ে** চলেছি। এ দীনের কালিমা হচ্ছে—লা ইলাহা ইল্লাল মাল (অর্থসম্পদ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নাই)। **এ এক আজব দ্বীন, যেখানে মাজলুম নিজেও জালিম। আবার জালিম নিজেও মাজলুম।**

২.৩

বর্তমান পৃথিবী যে সিস্টেম বা অর্ডার অনুযায়ী চলছে তা হলো 'পুঁজিবাদ-ভোগবাদ' সিস্টেম। **এটা এমন দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা যা গ্রহণ করে নিয়েছে কাফির-মুমিন সবাই।** খুব ভেবে দেখুন, পুরো সিস্টেমটায় ওপরের স্তরগুলো লাভবান হচ্ছে। এখানে—

- **অর্থব্যবস্থা :** পুঁজিবাদ (ওয়ান-ওয়ে)। **অর্থনৈতিক কাঠামোয় যে যত ওপরে তার দিকে লাভের স্রোত, পুঁজির স্রোত।** উৎপাদক/মজুর/শ্রমিক নিম্নতম মজুরি পায়। ভোক্তা থেকে অর্জিত লাভের বলতে গেলে কিছুই পৌঁছে না উৎপাদকের হাতে। ধনী হয় আরো ধনী, গরিব থেকে হয় আরো গরিব।
- **ব্যক্তিব্যবস্থা ও পরিবার-ব্যবস্থা :** জানি না শব্দটা বানালাম কি না। **সেলফ-মোটিভেশন বা সেলফ-অপারেটিং-সিস্টেম। এটা আজ 'ক্যারিয়ারিজম'।** ধর্ম শব্দের অর্থ যদি (√ধৃ+অনট) হয় ধারণ করা, তবে মুমিন-কাফির নির্বিশেষে **প্রত্যেকের অসাম্প্রদায়িক ধর্ম হলো ক্যারিয়ারিজম। আরো ওপরের স্তরের ভোক্তা হবার প্রতিযোগিতা।** সবাই এই ক্যারিয়ারিজম টার্গেট রেখে ভাবে। সন্তানকে ক্যারিয়ারের জন্য বড় করে। অধিক হারে ভোক্তা তৈরি, বেশি ভোক্তা তৈরি। দুনিয়া উপভোগই লক্ষ্য।
- **সমাজ-ব্যবস্থা :** ইনডিভিজুয়ালিস্টিক। **সেলফ-সেন্টার্ড।** অনেক প্রয়োজন সমাজ মেটাত। **সমাজের সেই ফাংশনগুলো শেষ করে দেওয়া হয়েছে।** আর

পুঁজিবাদ সেগুলোর ভার নিয়েছে। ভোক্তা বাড়িয়ে নিয়েছে। যাকাতের জায়গা নিয়েছে মাইক্রোসুদ। মেহমানদারি ও পান্থশালার জায়গা নিয়েছে হোটেলব্যবসা। আত্মীয়-সংযোগের স্থান নিয়েছে ক্যাবল-টিভি। একাকী জীবন, একক পরিবার।

- **বিচার-ব্যবস্থা :** ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থা। কোর্ট-উকিল নিয়োগ-জেল। ডেটের পর ডেট, আরো ডেট। আইনের প্যাঁচ, প্রচুর ফাঁক। পুঁজিপতিদের জন্য কোনো আইন নেই। ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবে। ফাঁসির আসামির রাষ্ট্রীয় ক্ষমার ব্যবস্থা। **বাদীর কোনো say নেই।** বিস্তারিত এবং বিকল্প পরে কোনোদিন আলোচনায় আসবে হয়তো।

- রাষ্ট্রব্যবস্থা : সেক্যুলার সোকল্ড 'গণ'তন্ত্র। যেখানে **সরকার বসাবে পুঁজিপতিরা (গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের মালিকরা)। Government by the পুঁজিপতি, of the পুঁজিপতি, for the পুঁজিপতি। নির্বাচনের ডোনার পুঁজিপতিরা, মন্ত্রিপরিষদে পুঁজিপতিরা, পলিসি হবে তাদের পক্ষে।** অর্থপাচার, ঋণখেলাপি, কালোটাকা, শেয়ার বাজারে পুঁজিলোপাট সব তারা করবে। কিন্তু তাদের পুতুল তাদের বিরুদ্ধে কিচ্ছু করবে না। ৩য় বিশ্বের পুঁজিপতিদের ওপরে আছে ১ম বিশ্বের পুঁজিপতিরা (Buyer-রা, সাপ্লায়াররা)। তারা বসায় তাদের সরকার।

২.৪

এবার তাকান। পুরো সিস্টেমটার পুঁজির স্রোত ওপরে। শ্রমিকদের নামমাত্র মজুরি দেওয়া, ভোক্তাদের ঠকানো, পণ্যে ভেজাল, বেশিদিন টেকানোর জন্য বিষ দেওয়া, জমিতে যথেচ্ছা সার কীটনাশক থেকে নিয়ে ঘুষ-দুর্নীতি সবকিছুর মূলে এই সিস্টেমটা। **প্রতি স্তরে যে বসে আছে, সে চাচ্ছে আরো লাভ করতে, আরো পুঁজি বাড়াতে।** যে **করেই হোক। ব্যবসায়ী হিসেবে সে চাচ্ছে আরো পুঁজি বাড়াতে আর একই লোক ভোক্তা হিসেবে চাচ্ছে আরো বেশি ভোগ করতে, আরো ওপরের স্তরের ভোক্তা হতে।**

ফলে **প্রতিটি ব্যক্তি নিজে নিচের স্তরে জুলুম করছে পুঁজি বাড়ানোর জন্য। আর ওপরের স্তরের কাছে সেই ব্যক্তিটিই মাজলুম হচ্ছে ভোক্তা হিসেবে।** পুরো সিস্টেমটাই নষ্ট। যে মাছওয়ালা আমাকে ১০০ গ্রাম কম দিলো কেজিতে, সেও পাইকারের কাছে মণে ৩ কেজি কম পেয়েছে। বেশি লাভ সবাই করতে চাচ্ছে। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে। যে অফিসার আজ আমার থেকে ১০ হাজার টাকা ঘুষ নিল, ওই চেয়ারে থাকতে

তাকেও কোথাও ঢেলে আসতে হচ্ছে মাসে কিছু। একটা সিস্টেম। উন্নত বিশ্ব হয়তো এভাবে নিচ্ছে না, কিন্তু ভিন্ন কোনোভাবে এই পুঁজির একমুখী স্রোত চালু রেখেছে।

দুটো উদাহরণ দিয়ে শেষ করি। আমি সবার সাথে খুব গল্প করি। ইমার্জেন্সিতে রোগী না থাকলে ওয়ার্ডবয় থেকে নিয়ে স্থানীয় পরিচিতমুখ সবার সাথে। তো রাতে অন-ডিউটি পুলিশ কনস্টেবল এস-আই, উনাদের সাথেও খুব খাতির গপসপ করতাম। একদিন একজন কনস্টেবল এসে দুঃখের কথা শোনালেন : স্যার, আসামি ধরতে অনেকগুলো সোর্স পালি। তাদের টাকা না দিলে ইনফো দেবে না। আবার এদের পালার জন্য বরাদ্দ পাই না। কিংবা বরাদ্দ থাকে, সিনিয়ররা নিয়ে নেয়। ওদিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আসামি ধরতে না পারলে প্রোমোশনের স্কোর তুলতে পারব না। বেতনও বাড়বে না, জিনিসপত্রের যা দাম। তো কী আর করব, নিরপরাধ লোক ধরে থানায় দিতে হয়, যাতে আমার কোটা পূরণ হয়। প্রোমোশন যেন পাই। দেখেন সিস্টেমে পড়ে বেচারা জুলুম করতে বাধ্য হচ্ছে নিরপরাধের ওপর, সে নিজেও মাজলুম।

শেষ উদাহরণ। আমার চেম্বার। রোগী এসেছে। লাইপোমা জাতীয় টিউমার। অনেকগুলো, একটা আবার ব্যথা, দ্রুত বড় হচ্ছে। আমি দেখেটেখে বললাম : ব্যথা না হলে সমস্যা ছিল না। যেহেতু ব্যথা, আর বড় হচ্ছে, অপারেশন করাতে হবে বড় ডাক্তার দিয়ে। অপারেশনের পর আবার বায়োপসি করতে হবে খারাপ কিছু কি না বুঝতে। আপনি কুষ্টিয়া মেডিকেলে যাবেন, যত দ্রুত সম্ভব। আর কিছু ব্যথার ওষুধ লিখে দিলাম। ৩০০ টাকা ভিজিট দিলো, বের হয়ে বাইরে গিয়ে বসল। যে ডায়াগনস্টিকে বসি, তার মালিক এসে বলল : স্যার, রোগীটাকে পাঠিয়েছে পল্লীচিকিৎসক, তাকেও একটা পার্সেন্টিজ দেওয়া লাগে। আপনি যদি টেস্ট না দেন, তাহলে ওকে ওর পার্সেন্টিজ দেবো কোত্থেকে? পকেট থেকে? সে রোগীটাকে আবার পাঠাল ভেতরে, অশিক্ষিত গ্রাম্য কৃষক। খচখচ করে লিখলাম রক্ত পরীক্ষা আর প্রস্রাব পরীক্ষা। আর ভিজিটে পাওয়া আমার ৩০০ টাকা দিলাম ফিরিয়ে। সিস্টেম।

পুলিশ-ডাক্তারদের সবাই গালি দেয়। দোষ করলে তো দেবেই। **কিন্তু সিস্টেমটাকে কেউ গালি দেয় না। সিস্টেমটাকে কেউ বদলাতে চায় না। সিস্টেমের কর্তারা এসে** ঠ্যাঙাবে বলে? প্রতিটা পুলিশ-ডাক্তার-শিক্ষক সেবার ব্রত পোষণ করে। মনের গভীরে। কিন্তু এই লোভী সিস্টেম তাকে করে তোলে লোভী-কঠোর। **যে সিস্টেম ঘুষখোর তৈরি করে, কসাই তৈরি করে, ফাঁকিবাজ তৈরি করে, সে সিস্টেমের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলে না।** সমাধান ইসলাম নিয়ে এসেছিল, হুজুরদের কথাটা

একবার বসে শুনুন। একবার বসেন। কী অর্থনীতি, বিচার-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রপদ্ধতির কথা তারা বলে, একটাবার শোনেন। নাকি জানেন? জানেন বলেই শোনেন না? কার স্বার্থে? জুলুম করা যাবে না আর, তাই?

কত মাজলুমের চোখের পানি আজ করোনা ডেকে এনেছে, আমফান (ঘূর্ণিঝড়ের নাম) ডেকে এনেছে, সেটা কেউ বলবে না। সবাই বলবে নিম্নচাপ হয়ে আমফান এসেছে। মুমিন এটা বলবে না। মুমিন বলবে, 'মাজলুমের দুআ আল্লাহর দরবারে কবুল, এমনকি মাজলুম কাফির হলেও।'[১] **কত মজুরের বেদামি ঘাম, কত কয়েদির উতলা মন, কত সর্বস্বান্ত বাদীর দীর্ঘশ্বাস, কত সেবাগ্রহীতার তিতে মন, কত চোখের পানি এই সিস্টেমের কারণে আল্লাহর দরবারে নালিশ করেছে বছরের পর বছর।** পুরো দুনিয়ায়। আল্লাহর ক্রোধ না আসার কোনো কারণই তো আমি খুঁজে পাই না। আপনারা কীভাবে এত নিশ্চিন্ত, এত প্রশান্ত?

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ১২৫৪৯; *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৮৭৫; *মাকারিমুল আখলাক*, তাবারানি: ১২৭; *জামিউল মাসানিদ*, ইবনুল জাওযি, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ১৫৬

স্পর্ধা ৩ : বক্রতা, ইলহাদ

৩.১

শরিয়তে মুহাম্মাদিকে আল্লাহ তাআলা সুরক্ষিত রেখেছেন। কীভাবে সংরক্ষিত রেখেছেন, সেটা নিঃসন্দেহে আরেক মুজিযা। কী এক আশ্চর্য উপায়ে আল্লাহ—

» **তাঁর কালামকে সংরক্ষিত রেখেছেন** (একেবারে নবিজির জীবদ্দশা থেকে আজ অব্দি একটানা, লিখিত-মুখস্থ দুভাবেই, প্রতি প্রজন্মেই বহুসংখ্যক লোকের দ্বারা)

» **কালামের ভাষাকে সংরক্ষণ করেছেন** (আরবি ভাষা দুনিয়ার সবচেয়ে 'অ-তরল' মানে কম পরিবর্তিত ভাষা, বিস্তারিত সামনে ইনশা আল্লাহ)

» **কালামের ব্যাখ্যাকে সংরক্ষণ করেছেন** (নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস। এটাও তাঁর জীবদ্দশা থেকে একটানা লিখিত প্লাস মুখস্থ, দুটোই। উদাহরণটা একটু কেমন হয়, তারপরও বলি। গার্মেন্টস থেকে প্রোডাক্ট ডেলিভারির সময় একটাতে খুঁত পেলে যেমন পুরো লট বাতিল, একেবারে তেমন করে সংরক্ষণ করা হয়েছে আল্লাহর রাসুলের মুখের কথা)

» **কালাম যার ওপর নাযিল হয়েছে, তার জীবন-চরিতকে সংরক্ষণ করেছেন।** (হাদিসের মতো করেই)

» **কালামের বুঝ সংরক্ষণ করেছেন।** এই কালামের প্রথম ছাত্ররা (সাহাবিরা) যা বুঝেছেন, যেভাবে প্রয়োগ শিখেছেন শিক্ষক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের কাছ থেকে, সেটাকেও একইভাবে সংরক্ষণ করেছেন। (সাহাবিদের কথাও হাদিসের মতো করেই সংরক্ষণ করা হয়েছে)

» প্রথম ছাত্রদের, তাদের ছাত্র, তাদের ছাত্র, তাদের ছাত্র এভাবে যারা যারা প্রতি জেনারেশনে তার কালাম-ব্যাখ্যা-বুঝ-ইতিহাস বহন করে পরের জেনারেশনে পৌঁছে দিয়েছেন, তাদের **সবার জীবন-চরিত, চরিত্র বিশ্লেষণ সংরক্ষণ করেছেন**। এই শাস্ত্রের নাম 'আসমাউর রিজাল'।

ধরুন, নবিজির একটা হাদিস হঠাৎ করে উদয় হলো, যেটা কেউ শোনেনি। তখনই সেটার উৎস খোঁজা হবে, কোন চেইনে (সনদ) কথাটা এলো। এই বর্ণনা চেইন ছাড়া একটা লাইনও পাত্তা পাবে না। নতুন করে কিছু ঢুকবার সুযোগই নেই। না আয়াত, না হাদিস, না নতুন কোনো ব্যাখ্যা, না নতুন কোনো বুঝ। এরপর দেখা হবে, সেই চেইনে কারা কারা আছে, এই হাদিসের বাহক কারা প্রজন্মান্তরে। তাদের জীবনী সংরক্ষিত। বের করা হবে ৮০ ভল্যুম, ৬০ ভল্যুমের সেসব বই। এমন কেউ যদি চেইনে থাকে যার নাম এসব বইয়ে নেই (মাজহুল বা অজ্ঞাত), নগদে সে হাদিস বাদ। এমন কেউ যদি থাকে যার নামে অবজেকশন আছে, হয় সে মিথ্যুক, নয় হাদিস জালের হিস্ট্রি আছে, সাথে সাথে বাদ। কী কী খুঁত থাকলে হাদিস বাদ হবে, কী খুঁত থাকলে বাদ হবে না তবে ওজন কমে যাবে, দালিলিক গুরুত্ব কমে যাবে। সবখানে সে হাদিস ব্যবহারযোগ্য থাকবে না। আকিদা প্রমাণের জন্য কোন লেভেলের হাদিস, বিধান প্রমাণের জন্য কোন লেভেল, উৎসাহ-সতর্কবাণী প্রমাণের জন্য কোন লেভেলের, ইতিহাস প্রমাণের জন্য কোন লেভেলের বর্ণনা নেয়া যাবে, এগুলো সব নীতিমালা করা রয়েছে।

সুতরাং, মনে চাইল একটা হাদিস বানিয়ে ঢুকোলাম, একটা হাদিস মনমতো ব্যাখ্যা মেরে দিলাম, কুরআনের আয়াতের একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দিলাম, সে সুযোগ ইসলামে নেই। **ইসলাম হলো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন (কুরআন), নবিজি যা বুঝেছেন, যা বুঝিয়েছেন (হাদিস)। সাহাবিরা যা বুঝেছেন-বুঝিয়েছেন (আছার)। এটুকু যুগের সাথে সম্পর্কিত নয়। কুরআনকে সেই যুগে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে বুঝেছেন, সাহাবিদের যেমনিভাবে বুঝিয়েছেন। আজকের যুগে সেই কুরআনকে আমরা অন্যভাবে বুঝব, সে সুযোগ নেই।** কাণ্ডজ্ঞান (আকল) খাটিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হাদিস, সুপ্রতিষ্ঠিত বুঝ বাইপাস করার সুযোগ নেই।

৩.২
ইসলাম এসে যুগকে বদলায়, দেশকে বদলায়, মানুষকে বদলায়। যুগভেদে, দেশভেদে, জাতিভেদে ইসলাম বদলায় না। বর্তমান যুগের খাপে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসকে জোর করে সেট করতে চায় অনেকে, কুরআনের আয়াত সেট করতে চায়। এটা ভুল। বর্তমান যুগের খাপে কুরআন-হাদিস বসবে না, বরং কুরআন-হাদিসের উপযোগী খাপে যুগকে বসতে হবে। এটাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। সাইয়িদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন : 'ইসলাম ছাড়া বাকি সব জাহিলিয়্যাত। শুধু ইসলামই সভ্যতা।' আসলেই তাই। আজ আমরা জাহিলিয়াত পরম ধরে ইসলামকে ভ্যারিয়েবল নিচ্ছি।

» অবিবাহিত নারী-পুরুষ সম্পর্ককে স্বাভাবিক ধরে নিয়ে তার থেকে সাহাবিদের 'কোর্টশিপ' টেনে বের করছি।

» ব্যভিচারকে, সমকামকে, শিরককে একটা 'অধিকার' ধরে নিয়ে বলছি 'ইসলাম মানবাধিকারের কথা বলে'।

» জন্ম-নিয়ন্ত্রণকে আগে অপরিহার্য ধরে নিয়ে এরপর সাহাবিদের আযল (withdrawl method)-এর দলিল খুঁজে বের করছি। তাই বলে জায়িয হয়ে গেল জন্মনিয়ন্ত্রণের অবৈধ উদ্দেশ্যে পিল খাওয়া, যার রয়েছে ভয়াবহ শারীরিক ক্ষতি? জায়িয হয়ে গেল চামড়ার ইমপ্ল্যান্ট, ভ্যাসেকটমির মতো সৃষ্টি-বিকৃতি?

» জাতিরাষ্ট্র সীমাকে সর্বৈব পরম ধরে নিয়ে লজিক দিচ্ছি, জন্মনিয়ন্ত্রণ না করলে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বেড়ে যাবে যে!

গণতন্ত্র-ধর্মনিরপেক্ষতা-মানববাদ-ব্যক্তিস্বাধীনতার খাপ অপরিবর্তনীয়। খালি আল্লাহর কালাম-রাসুলের হাদিস-সাহাবিদের বুঝই মোয়া? আল্লাহকেই আমার চিন্তার মাঝে পশ্চিমা জীবনধারার মাঝে ফিট হতে হবে? নইলে আল্লাহ বাদ, কিংবা ব্যাখা করতে হবে ঘুরিয়ে যাতে কোনোমতে আল্লাহকে রাখা যায়, কিন্তু কাফিরদের সামনে ছোট হতে না হয়। আল্লাহর রাসুলকেই আমার মানসিকতায় সেট হতে হবে? নইলে হাদিস বাদ। আমি আত্মসমর্পণ করছি, নাকি আল্লাহ-রাসুলকে বলছি আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে? (নাউযুবিল্লাহ)

৩.৩

কুরআনের আয়াত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের বক্র অর্থ করা এক বিশেষ প্রকারের কুফর। এমন অর্থ করা যা গত ১৪০০ বছরে আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত ওই বিধানের চেহারা-অর্থ-বুঝ-স্বরূপ থেকে ভিন্ন। একে বলে 'ইলহাদ', যে করবে তাকে বলা হবে মুলহিদ। আমার আপনার মনের কাছে ইসলাম আত্মসমর্পণ করে না। হয় আমি এগুলোর কাছে নিজেকে মিটিয়ে দেবো, নচেৎ ইসলাম আমাকে সশব্দে ডিজ-ওন করবে। এবং আমার বাকি সব আমল নষ্ট হয়ে যাবে। হাশর হবে কাফিরদের সাথে।[১]

আল্লাহ বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

> *নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহে বক্রপথ অবলম্বন করে তারা আমার অগোচর নয়। যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ; নাকি যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে (ও প্রশান্ত চিত্তে) উপস্থিত হবে সে (শ্রেষ্ঠ)? তোমাদের যা ইচ্ছা কর; তোমরা যা করো, তিনি তার প্রত্যক্ষদর্শী।*[২]

ইসলাম 'আধুনিক' 'সর্বাধুনিক' ধর্ম। এর মানে এটা নয় যে, বর্তমান আধুনিকতার সংজ্ঞায় ইসলামকে আসতে হবে। আপনার আমার আধুনিকতার খাপে ইসলামকে ঢুকতে হবে। **বরং 'ইসলাম আধুনিক' মানে হলো ইসলামটাই আধুনিক, বাকি সব অ-আধুনিক। আমাকে আপনাকেই আমাদের অজ্ঞতা থেকে ইসলামের আধুনিকতায় এসে ঢুকতে হবে। ইসলাম কোনো সমঝোতায় আসে না। আর যদি আমি আমার কুফরি চিন্তা-চেতনা, জাহিলি জীবন-বোধ, জুলুমি-সিস্টেমের সাথে ইসলামের সমঝোতা চাই, তবে যেন আমি জেনে নিই, 'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়া লিয়া দ্বীন।'** আমার জাহিলি দ্বীন, আমার সোকল্ড আধুনিক চিন্তাচেতনার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম ইসলামের মতো, আমি আমার মতো।

---

[১] সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৪০ এর তাফসির, *তাফসিরে মাআরেফুল কুরআন* দ্রষ্টব্য

[২] সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৪০

ইসলাম নিয়ে এত প্রশ্ন কেন?

ইসলাম ছাড়া বাকি সকল ধর্মই ব্যক্তিক আধ্যাত্মিকতা। কেবল কিছু আকিদা-বিশ্বাস আর সচ্চরিত্র গঠনমূলক নীতিকথা। আর কিছু সামাজিক প্রথা-পার্বণ। নওমুসলিম প্রফেসর জেফ্রি লাং তার '*আত্মসমর্পণের দ্বন্দ্ব*' বইয়ে খুব চমৎকার তুলে ধরেছেন, যদিও আমি বইটা গণহারে পড়তে নিষেধ করি, 'আমেরিকান ইসলাম' সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তারা পড়তে পারেন। তিনি বলেন, অমুসলিমদের দাওয়াহর ক্ষেত্রে আমরা যে স্ট্র্যাটেজি নিই (তাদের ধর্মগ্রন্থ ভুল প্রমাণ, ইসলামকে সঠিক প্রমাণ, বিতর্ক) এসব সংশয়ীদের ক্ষেত্রে কাজ করে (সংশয়ী খ্রিস্টান বা সংশয়ী হিন্দু)। কিন্তু প্র্যাকটিসিং হিন্দু বা প্র্যাকটিসিং খ্রিস্টান এগুলোতে প্রভাবিত হয় না। কারণ তাদের কাছে তাদের ধর্মগ্রন্থের ভুলগুলোর (যেগুলো আমরা খণ্ডন করি) একটা ব্যাখ্যা আছে। যেমন আছে আমাদের কাছে, যখন ওরা কুরআনের কোনো ভুল ধরে। বরং **প্র্যাকটিসিং অমুসলিম খোঁজে 'আধ্যাত্মিকতা'। বর্তমান ধর্মে আমি 'এক ধরনের' আধ্যাত্মিক খোরাক পাচ্ছি, ইসলাম আমাকে কী এমন বেশি দেবে? সুতরাং, ইসলামের আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা ও ব্যক্তিক আধ্যাত্মিকতা তুলে ধরতে হবে** আমাদের। এটুকু ওনার বক্তব্য। দেখুন, তারা ধর্ম বলতে যেমন ব্যক্তিক আধ্যাত্মিকতা (personal spirituality) বোঝে, ইসলামকেও সেটাই বোঝে। কষ্টের বিষয় হলো, অধিকাংশ মুসলিমও এটাই ভাবে। তখনই প্রশ্ন ওঠে ইসলামের আইন নিয়ে, জিহাদ নিয়ে, অনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা নিয়ে। **একটা ব্যক্তিক অধ্যাত্মবাদের (ধর্মের) ভেতর এত কিছু থাকবে কেন?**

ইসলাম নিয়ে খুব কমন একটা আপত্তি আসে পশ্চিমা-মনস্কদের তরফ থেকে। ইসলাম তো তরবারির জোরে ছড়িয়েছে। এই আপত্তির বিপরীতে হীনম্মন্য মুসলিমরা চিঁচিঁ করে জবাব দেবার চেষ্টা করে : আরে না না, ইসলাম মানেই তো শান্তি। ইসলামে তো যুদ্ধই নেই, যা হয়েছে সব ডিফেন্সিভ। অফেন্সিভ যুদ্ধ ইসলামে নেই। ব্লা ব্লা... **প্রশ্নটা ওঠে ঠিক এই কারণে কেবলই যেটা বললাম। ইসলামকে** অন্যান্য **ধর্মের মতো কেবল ব্যক্তিক আধ্যাত্মিকতা আর নৈতিকতার সমষ্টি ভাবার** কারণে। কেমন ধর্ম (পড়ুন ব্যক্তিক আধ্যাত্মিকতা), যে যুদ্ধ করে দেশ জয় করে? কেমন ধর্ম (নৈতিকতা) যে, তরবারি ধরে চাপিয়ে দেয়? ইসলাম সম্পর্কে নাস্তিক ও ইসলামবিদ্বেষীদের অধিকাংশ প্রশ্ন এই 'আলাদা করতে না পারা' থেকে উৎসারিত। আর আমাদের ভুল হলো আমরাও তাদের কোণা থেকেই জবাব দেবার চেষ্টা করি। ফলে হয় 'না ঘরকা, না ঘাটকা'।

খেয়াল করলে দেখবেন, উপমহাদেশে হিন্দুরা বিদেশিদের করা সকল ব্যবস্থা দ্রুততার সাথে আত্মীকরণ করে ফেলেছে। মুসলিমদের আনুগত্য মেনেছে, ব্রিটিশদের আনুগত্য মেনেছে। দ্রুততম সময়ে। তেমন কোনো বৃহৎ প্রতিবন্ধক ছাড়াই। এসব ধর্ম ব্যক্তিক নীতিমালা দেয়, বেশির চেয়ে বেশি সমাজনীতি দেয়। ফলে অর্থনীতি, বিচারনীতি, রাষ্ট্রনীতিতে একটা শূন্যতা রয়ে যায়। সেটা যখন যে পাত্রে তখন সে পাত্রের আকার ধারণ করে। এই শূন্যতাটাই ইউরোপে জমিদার-রাজাদের যথেচ্ছাচারিতার কারণ, খ্রিস্টবাদের ব্যর্থতার কারণ। যে শূন্যতাটা পূরণ করতে জন্ম হয়েছে সেক্যুলার লিবারেল হিউম্যানিজমের ভিত্তিতে নয়া রাষ্ট্রচিন্তার। **ইসলামের বিষয়টা ভিন্ন, ভিন্নরকম ভিন্ন। ইসলামের এই শূন্যস্থানটা নেই। তাই ব্রিটিশ আইন, বিচার, অর্থ, রাষ্ট্রকাঠামো হিন্দুরা যত সহজে মেনেছে, মুসলিমরা তত সহজে পারেনি। প্রায় ১০০ বছর লেগেছে সাধারণ মুসলিমদের পোষ মানাতে। ইসলামের স্বতন্ত্র পরিপূর্ণ বিচার-বাজার-রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে নতুন আনা কোনো ব্যবস্থা টক্কর লাগবেই।**

স্পর্ধা ৪ : অশ্লীলতা

৪.১

পূর্ববর্তী জাতিগুলোর প্রতি আল্লাহর আযাবের প্যাটার্নটা যদি লক্ষ্য করি। সব জাতিকেই আল্লাহ একটা আযাবে ধ্বংস করেছেন, সিঙ্গোল আযাব।

» **কওমে নুহকে মহাপ্লাবন**

» **আদ জাতিকে প্রবল ঝড়**

» **সামুদ জাতিকে ফেরেশতার প্রচণ্ড আওয়াজ**

» **আসহাবুল আইকা-কে মন্দা-খরা**

» **কওমে সাবাকে বাঁধ ধ্বসে প্লাবন**

শুধু একটা জাতিকে ধ্বংস করেছেন ৪টা আযাব একসাথে দিয়ে, করুণভাবে। কওমে লুত।

» **দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া**[১]

» **প্রচণ্ড নিনাদ**[২]

---

[১] সুরা কমার, আয়াত : ৩৭

[২] সুরা হিজর, আয়াত : ৭৩

» **নগরকে উলটে দেওয়া**[১]
» **পাথর-বর্ষণ**[২]

স্পর্ধা তো সবার কমন কারণ। তাহলে কওমে লুত কেন ভাগে এতগুলো পেল। কারণ আমরা সবাই জানি। বিরল প্রজাতির অশ্লীলতার প্রসার। মূলত সমকামিতা ছিল তাদের অশ্লীলতার চরমতম পর্যায়। এর আগের পর্যায়গুলো ছিল তাদের কাছে পানিভাত। স্বাভাবিক যৌনতা যখন সয়লাব, তখন মানুষ আরো বৈচিত্র্য খোঁজে। *মানসাঙ্ক* বইয়ে বহু আলোচনা করেছি যৌন-মনোবিজ্ঞান নিয়ে। সুতরাং,, **অশ্লীলতার সয়লাব আল্লাহর ক্রোধকে বাড়িয়ে তোলে। অশ্লীলতা বিষয়টি চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ে, মানুষ চিত্ত-বিনোদনের জন্য নতুন নতুন অশ্লীলতা খুঁজে নেয়।** অলরেডি পশ্চিমে সমকামিতা গ্রহণযোগ্য হয়ে গেছে, ফলে আওয়াজ উঠেছে ড্র্যাগকুইনের নামে বালক-কামের। নেদারল্যান্ডে শিশুকামীদের ম্যাগাজিন আছে PAIDIKA নামে। ডার্ক-ওয়েবে টেরাবাইট টেরাবাইট শিশুপর্ন, মৃতদেহের সাথে পর্ন। জার্মানিতে পশুকামীদের সংগঠন নিজেদের অধিকারের জন্য আইনি লড়াই চালাচ্ছে।

৪.২

লিবারেলদের কথাবার্তার মূল ভিত্তি হলো 'সম্মতি'। সম্মতি থাকলে সব বৈধ, ধর্মটর্ম গোনার টাইম নাই। এখন কানাডার আদালত বলছে, 'সম্মতির ব্যাপারটা যেহেতু নেই, অতএব যৌনাঙ্গে প্রবেশ ছাড়া পশুর সাথে সবকিছু করা বৈধ।' পশুকামীরা বলছে, পশুরাও এক বিশেষ ধরনের সম্মতি দেয়, অতএব পশুকাম বৈধ। 'জেন্ডার আইডেন্টিটি'র পুরোধা মনোবিদ জন মানি এক সাক্ষাৎকারে শিশুকামী ম্যাগাজিনকে বলেন : 'বালক যদি সম্মতি দেয়, তবে বালক-কাম হতে পারে দুই প্রজন্মের এক অপূর্ব সম্মিলন।' অথচ, সম্মতি ছাড়া স্বামী কিচ্ছু করতে পারবে না—'বৈবাহিক ধর্ষণ' হবে সেটা। এই হলো সোকল্ড 'সম্মতি'র বাস্তব চেহারা। অন্য কোনোদিনের জন্য সে আলাপ তোলা থাক।

---

[১] সুরা হুদ, আয়াত : ৮২

[২] সুরা হিজর, আয়াত : ৭৪

৪.৩

ইসলামি মুআশারাত (ধরে নেন কালচার) এর একদম বেসিক এসেন্স হলো 'হায়া' বা লজ্জাশীলতা। ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক হিন্দু সমাজের অংশ হওয়ায় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রেতাত্মা সওয়ার রয়ে গেছে। শূদ্র-বৌদ্ধ-বৈশ্য-নারী কেউই বাদ যায়নি ব্রাহ্মণ্যবাদের জুলুম থেকে, কেবল অস্ত্রধারী রাষ্ট্রকর্তা ক্ষত্রিয়রা ছাড়া। নারীর প্রতি হিন্দু সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের আজও ছাড়েনি। সেজন্য ইসলাম যখন 'হায়া'র কথা বলে তখন আমাদের চোখেও লজ্জাশীলা নারীর ব্রীড়ানত লাজনম্র দৃষ্টিটাই চোখে ভাসে। আমাদের বুলিই হয়ে গেছে, 'লজ্জা নারীর ভূষণ, পুরুষের দূষণ।' যেন পুরুষের লজ্জা থাকতে নেই, পুরুষ হবে বেহায়া-নির্লজ্জ।

ইসলামি এই 'হায়া' সর্বজনীন, নারী-পুরুষ সবারই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ নিজে লজ্জাশীল, তিনি লজ্জাশীলতা পছন্দ করেন।'[১] **ইসলাম তার বিভিন্ন বিধানের দ্বারা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য এই 'হায়া'-কে প্রোমোট করে এবং বে'হায়া'পনা-কে দমন করে।** যে সমাজ 'হায়া' বা modesty'র ভিত্তিতে নির্মিত সে সমাজ হয় পবিত্র, সুসংহত। আজ আমাদের সমাজে অমুকের মেয়ে তমুকের সাথে ভেগে যাচ্ছে, অমুক প্রবাসীর বউয়ের ঘরে লোকের আনাগোনা, রাস্তাঘাটে ভ্রূণ-নবজাতকের লাশ পড়ে থাকা, পরকীয়ার বলি, প্রেমের বলি, ধর্ষণ, ভিড়ে-বাসে হাতাহাতি, পার্কে-রিকশায় উন্মত্ত নারী-পুরুষ, এগুলো একটা সমাজে 'হায়া' না থাকার প্রমাণ। আর 'হায়া' না থাকা সমাজ যেকোনো সভ্যতার আসন্ন ধ্বংসের আলামত।

৪.৪

সোশ্যাল নৃতাত্ত্বিক Joseph Daniel Unwin MC[২] প্রায় ৫ হাজার বছরের ইতিহাস ঘেঁটে ৮৬টি আদিম গোত্র ও ৫টি বৃহৎ সভ্যতার ওপর একটি পর্যালোচনা করেন। Sex and Culture (1934) বইয়ে তিনি ফলাফল তুলে ধরেন বিস্তারিত আকারে। যেকোনো সমাজ বা সভ্যতার বিকাশ তাদের যৌনসংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত। প্রতিটি সমাজ শুরুতে যৌনতা ও নৈতিকতার ব্যাপারে কঠোর থাকে,

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪০১২; *সুনানু নাসায়ি* : ৪০৬; *মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক* : ১১১১; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ৯৫৬; *শুআবুল ঈমান* : ৭৩৯৪—হাদিসটি সহিহ

[২] মৃত্যু : ১৮৯৫–১৯৩৬

যতদিন তারা এর ব্যাপারে সংযমী থাকে ততদিন তাদের বিকাশ ও উন্নতি হতে থাকে। সমৃদ্ধির চূড়ায় পৌঁছে তাদের ভেতরে শুরু হয় অবক্ষয়। যৌনতার ব্যাপারে উদার হতে থাকে। ব্যভিচার-সমকাম-প্রকাশ্য অশ্লীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এগুলো স্বাভাবিক প্র্যাকটিসে পরিণত হয়। ফলে কমে যেতে থাকে সামাজিক শক্তি। অশ্লীলতার প্রসার মানে পতনের বিউগল।

ইসলামি সমাজ-ব্যবস্থার বুনিয়াদ এই 'হায়া' বা লজ্জা। দেখুন কীভাবে ইসলাম 'হায়া'কে বিভিন্ন বিধানাবলির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করে—

» বিপরীত লিঙ্গের প্রতি দৃষ্টি অবনত রাখা।

» নারীর খিমার-জিলবাব-নিকাব। পুরুষের ঢিলেঢালা পোশাক। মোদ্দা কথা ইসলামি ড্রেসকোড।

» মাহরাম ও গাইরে মাহরাম মেনে চলা। এই ফরজ বিধান তো আমরা মুসলিমরা অস্বীকারই করে বসি।

» বাবার সামনে মেয়ে, ছেলের সামনে মা, ছেলেরা ছেলেরা, মেয়েরা মেয়েরা কতটুকু খোলা রাখবে কতটুকু ঢেকে রাখবে তার বিধান।

» সতর-আওরাতের বিধান।

» একজন আরেকজনের ঘরে, আরেকজনের বাড়িতে প্রবেশের আগে অনুমতি গ্রহণের বিধান। উঁকিঝুঁকি নিষিদ্ধ।

» একটা বয়সের পর সন্তানকে পৃথক বিছানায় প্রেরণ।

'হায়া' প্রোমোটিং কিছু বিধান ফরজ, কিছু মুস্তাহাব। আবার কিছু আছে ব্যক্তিগত তাকওয়া ও গাইরাত (আত্মমর্যাদাবোধ)। আবার এমনও কিছু আছে যা শুনতে অ্যাবসার্ডও মনে হতে পারে। এগুলো একটু বলি, তাহলে 'হায়া'র কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে। 'হায়া'র বাংলাটা ঠিক লজ্জাশীলতায় পরিপূর্ণতা পায় না। **অপরে দেখবে বলে সংকোচটাকে আমরা লজ্জা বলি। কিন্তু 'হায়া' অর্থ এটাও, প্লাস আত্মলজ্জা। অনেকটা 'আমি এমন কাজ কীভাবে করি!' স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোনো পর্দা নেই, তারপরও স্ত্রীর শরমগাহে না তাকানো। গুনাহ হবে, তা কিন্তু না। জাস্ট আত্মলজ্জা।** আত্মলজ্জার কয়েকটি উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে—

» উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হতো সবচেয়ে লজ্জাশীল, অত্যন্ত দুর্বল একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনো নিজের ডান হাত দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করেননি।[১]

» আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে যাই তখন আল্লাহকে লজ্জা করে আমার মাথার কাপড় দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে নিই।[২]

» আবু মুসা আশআরি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি অন্ধকার কামরায় গোসল করি, এরপরও আল্লাহর লজ্জায় কাপড় পরার আগ পর্যন্ত আমার পিঠ সোজা করি না, ঝুঁকিয়ে কুঁজো করে রাখি।[৩]

৪.৫

মেয়েদের 'হায়া' বললে তো চট করে বুঝে ফেলি আমরা। লজ্জা নারীর ভূষণই নয় কেবল, ইসলামি কালচারে পুরুষেরও অলংকার এই লজ্জা। পুরুষের জন্যও ইসলাম 'হায়া'র কিছু বিধানকে ফরজ করেছে, কিছু মুস্তাহাব, কিছু আদব, আবার কিছু আছে কিছুই না, স্রেফ আত্মলজ্জা। ওপরের হাদিসটা মনে করুন, 'আল্লাহ লজ্জাশীল, ভালোও বাসেন লজ্জাশীলদের।'[৪]

» পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু সর্বাবস্থায় ঢেকে রাখা
» চোখ নামিয়ে চলা
» গাইরে মাহরাম নারীদের এড়িয়ে চলা (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ)
» বেশভূষায়, চুলের কাটে ইসলামি কোড মেনে চলা।
» পুরুষ হয়ে নারীর পোশাক না পরা
» স্বচ্ছ পোশাক না পরা

---

[১] *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি : ৫০৬১

[২] *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ১১২৭; *আয-যুহদ*, আহমাদ বিন হাম্বল : ১১৬৮; *শুআবুল ঈমান* : ৭৩৩৭; *তাযিমু কাদরিস সালাহ* : ৮২৮; *হিলইয়াতুল আউলিয়া* : খণ্ড :১,পৃষ্ঠা : ৩৪

[৩] *আয-যুহদ*, আহমাদ ইবনু হাম্বল : ১১০০; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ১১২৮; *তাযিমু কাদরিস সালাহ* : ৮৩৯; *হিলইয়াতুল আউলিয়া* : খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬০—শারয়ি সম্পাদক

[৪] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪০১২; *সুনানু নাসায়ি* : ৪০৬; *মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক* : ১১১১; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ৯৫৬; *শুআবুল ঈমান* : ৭৩৯৪। -হাদিসটি সহিহ

৪.৬

পারিবারিক কিছু 'হায়া' (আত্মলজ্জা) আছে। এখন মুসলিম পরিবার থেকে 'হায়া' বিদায় নিয়েছে। পুরো পরিবার একসাথে বসে ফরাসি-চুম্বনদৃশ্য উপভোগ করছে। 'লিটনের ফ্ল্যাট'-টাইপ নোংরা ডায়লগ বাপের সাথে মেয়ে বসে দেখে। অভিনেতাদের পোশাকে 'আই অ্যাম পর্নস্টার', 'ব্লো-জব', 'ডগিস্টাইল' লেখা—সবাই মিলে দেখছে। ছেলের সাথে মা বসে দেখে, ভাইবোন একসাথে দেখে। নায়ক নায়িকাকে বুকে জড়িয়ে নিচ্ছে, থুতনি ওপরে তুলে ধরে এরপর দুটো ফুল একটা আরেকটাকে ঠোকরাচ্ছে—এ ধরনের সিম্বোলিক দৃশ্য তো একদমই স্বাভাবিক হয়ে গেছে আরো আগে। **গুনাহের প্রতি ঘৃণা উঠে যাওয়া ঈমানহীনতার আলামত।** হাদিস আমাদেরকে জানিয়েছে : অন্তরে ঘৃণা করার নিচে ঈমানের আর স্তর নেই। তাহলে এইসব জঘন্য অশ্লীলতার প্রতি ঘৃণা উঠে যাওয়া, এগুলোকে নর্মাল মনে হওয়া কীসের আলামত?

৪.৭

যেকোনো খারাপ বিষয় নর্মালাইজ করার কয়েকটা ধাপ আছে। প্রথমে সেটাকে সবাই ঘৃণা করত। এরপর সেটা নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে। এরপর সেটা সিম্প্যাথাইজ করে, ওর কী দোষ। এরপর সেটা নর্মাল হয়ে যায় সমাজে। পর্নো, সমকামিতা এখন আমাদের সমাজে ঠাট্টার স্তরে আছে, একটা সময় ঘৃণার বিষয় ছিল। বিনোদনের নামে (নাটক-সিনেমা) মিডিয়া এই কাজগুলো করে। ছেলে-মেয়ে লিভ-টুগেদার আমাদের সমাজে একটা ঘৃণার জিনিস ছিল। 'লিটনের ফ্ল্যাট' জাতীয় ডায়লগ ও নাটকের দ্বারা এগুলোকে প্রচলিত করে দেওয়া হয়েছে হাসি-ঠাট্টা হিসেবে। পরের ধাপে সেটা নর্মাল একটা ব্যাপার হয়ে যাবে, বা অলরেডি হওয়ার পথে। সমাজে গ্রহণযোগ্য একটা সম্পর্কে পরিণত অলরেডি হচ্ছে। যেমন ধরুন, প্রেমটা। একসময় আমাদের বাবাদের যুগেও সামাজিকভাবে ঘৃণ্য একটা ব্যাপার ছিল, এখন নাটক-সিনেমার সুবাদে 'কিছুই না' বা 'ছেলের নিজের পছন্দ আছে' হয়ে গেছে। টিভি প্রোগ্রামগুলো আমাদের মনস্তত্ত্ব গঠনে গভীর প্রভাব ফেলে। **একই ধরনের মেসেজ বারবার পেতে পেতে, একই ধরনের সিনারিও বারবার দেখতে দেখতে সেটাকে বাস্তবজীবনেও স্বাভাবিক মনে হয়।** 'ও তো জাস্ট অভিনয়'—এভাবে ফু মেরে উড়িয়ে দিলেও ব্যাপারটা আসলে এমন নয়। **ঘটনাপ্রবাহ, পটভূমি, সিনারিও, চরিত্রায়ণ, ডায়লগ, পোশাক, ভাষা, ভঙ্গিমা সকল কিছু দিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয় 'হায়া'বিরুদ্ধ, ইসলামের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক সব জীবনাচরণ—বেহায়াপনা,**

অশ্লীলতা, ফাহশা। যেমন করছে ক্লোজ-আপ: কাছে আসার গল্প। একটু একটু করে আমাদের মানসিক প্রতিরোধকে ভেঙে দিয়েছে।

৪.৮

মিডিয়াকর্মীদের মাঝে যারা এখনো নিজেদের মুসলিম ভাবেন, আখিরাতের ওপর, বিচার দিবসে জবাবদিহিতার ওপর এখনো বিশ্বাস করেন, তাদের জন্য জাস্ট একটা আয়াত কুরআনের। কোনো তাফসির দরকার নেই, এমন দিবালোকের মতো স্পষ্ট আয়াত।

> *যারা চায় ঈমানদারদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে যাক, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ভোগ করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।*[১]

যন্ত্রণাদায়ক আযাব দুনিয়াতেও, আখিরাতেও। **খেয়াল করলে দেখবেন অধিকাংশ মিডিয়াকর্মী, নাট্যাভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবন সুখের হয় না। ড্রাগ-ডিভোর্স-পরকীয়া-ড্রিংক্স-আত্মহত্যা প্রভৃতির ঘূর্ণাবর্তে এক অস্থির জীবন কাটায় তারা।** পত্রপত্রিকাতেই অহরহ আমরা পেয়ে থাকি। এটা তাদের জন্য দুনিয়ার আযাব। এটা এজন্য, তারা মুসলিম সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটাত, পশ্চিমের অশ্লীল জীবনাচারকে নর্মালাইজ করত। আর এর চেয়ে শত-সহস্রগুণ শাস্তি তারা ভোগ করবে আখিরাতে।

বহু মুসলিম ভাই, যারা আখিরাতে জবাবদিহিতায় বিশ্বাসী, তারাও নিজেদের অজান্তেই এই গর্হিত গুনাহ করে যাচ্ছেন। অনেকের জীবিকা উপার্জনের উপায়ই (ক্যারিয়ার) এটি, অশ্লীলতার প্রসার। হারাম উপায়ে অর্জিত অর্থও হারাম হয়ে যাচ্ছে তাদের অজান্তে। বিনোদনের নামে জনপ্রিয়তা অর্জনের দিকে তাদের ঝোঁক। জনপ্রিয়তা, নিশ্চিন্ত জীবিকা—এগুলো ভেদ করে আল্লাহর আহ্বান কানে আসাই কঠিন হয়ে যায়। দুনিয়ার জীবনের এসব ধোঁকা থেকে আল্লাহ কুরআনে বারবার সতর্ক করেছেন। অনেকে আল্লাহর দয়ায় উঠে আসতে পারেন এই পঙ্কিল জীবন থেকে। আল্লাহর জন্য বিসর্জন দেওয়া জনপ্রিয়তা ও জীবিকা আল্লাহ দুনিয়াতেই তাদেরকে ফিরিয়ে দেন শতগুণে, হালালের মাঝে। জুনাইদ জামশেদ রাহিমাহুল্লাহর উদাহরণ আমাদের সামনেই রয়েছে।

---

[১] নিশ্চয় যারা ঈমানদারদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। [সুরা নূর, আয়াত : ১৯]

মিডিয়া দ্বারা প্রচারিত বা ইন্সটিলড এই সিনারিওগুলোর প্রয়োগ দর্শকের কাছে বাস্তবজীবনে এভেইলেবল করে দেয় সহশিক্ষা ও সহকর্ম। **নাটক-সিনেমার শোনা-দেখা (প্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীর) ডায়লগ, ভঙ্গিমা, ভাষা, চরিত্রায়ণগুলো ফ্যানরা এখানে প্র্যাকটিস করে। এটাই প্রমাণ করে এগুলো কেবলই নির্দোষ 'অভিনয়' নয়, এগুলোর গভীর মানসিক ও সামাজিক প্রভাব রয়েছে।** আপনারা বহু ঘটনা পাবেন যেখানে 'ক্রাইম পেট্রোল' জাতীয় প্রোগ্রাম থেকে অপরাধের আইডিয়া নেওয়া হয়েছে। আমি বলতে চাইছি—এগুলো থেকে 'নেওয়া' হয় অনেক কিছুই। 'জাস্ট বিনোদন' বলার সুযোগ নেই

৪.৯

'হায়া' মানুষের এক্সক্লুসিভ বৈশিষ্ট্য। পশুর কাছে নিজের চোখ আর লজ্জাস্থান সমান। কুকুর তার জিভও বের করে রাখে, তার পায়খানার রাস্তাও বের করে রাখে। সবই তো অঙ্গ, লজ্জার কিছু নেই। 'লজ্জার কী আছে?' এটা পশুর মুখে মানায়। বস্তুবাদ বা মানব-ইতিহাসের বস্তুবাদী দর্শন (ডারউইনিজম) মানুষকে একটা উন্নত পশু ছাড়া আর কিছু হিসেবে দেখে না। তাই বস্তুবাদীদের কাছে 'লজ্জা' অনর্থক একটা শব্দ, কারণ বস্তুবাদ দিয়ে 'লজ্জা'কে ব্যাখ্যা করা যায় না। অথচ মানবেতিহাসের শুরু থেকেই মানুষ লজ্জা পেয়েছে, পোশাক পরেছে। লিঙ্গ আর হাতের পার্থক্য করেছে, যদিও দুটোই শরীরের প্রত্যঙ্গ। **এটা মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। যে কারণে আমরা মানুষ, যে কারণে আমরা জন্তু নই, এগুলো সেই বৈশিষ্ট্য যা আমাদের মানুষ করেছে।** কোনো পশু লজ্জা পায়নি, কোনো পশু ধর্ম পালন করেনি, কবিতা লেখেনি। এজন্য শুধু বস্তুবাদ দিয়ে মানুষকে ও মানুষের ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা যায় না, শুধু ভাববাদ দিয়েও যায় না। ড. আলিজা আলি ইজাতবেগোভিচ তার Islam between East and West বইতে চমৎকারভাবে এটা আলোচনা করেছেন। ইসলামই মানুষের সত্তা ও জিজ্ঞাসাগুলোর পরিপূর্ণ উত্তর দেয়। বস্তুবাদ ও ভাববাদের সমন্বয় করেছে ইসলাম, মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে শেষ নির্দেশনা। মানুষ বলেই আমাদের কাছে আমার শার্ট আর জাঙ্গিয়া এক জিনিস নয়, যদিও দুটোই পোশাক। মানুষ বলেই আমরা পিরিয়ডের রক্ত দেখিয়ে রাস্তায় ঘুরতে পারি না। মানুষ বলেই আমরা লিপস্টিক নিজে কিনে, প্যাড বাপকে দিয়ে কেনাতে পারি না। মানুষ বলেই নিজেদের অন্তর্বাস ছাদে মেলে তার ফটো ফেসবুকে আমরা দিতে পারি না। **এগুলো যতখানি 'লোকলজ্জা'র বিষয়, এর চেয়ে বেশি 'আত্মলজ্জা'র বিষয়। মনুষ্যত্ব মানে ধর্ম ছেড়ে দিয়ে 'হিউম্যান' হওয়া নয়। যদি**

বিবর্তন সঠিক ধরেও নিই, বস্তুবাদের অবোধ্য এই বিষয়গুলোকেই মনুষ্যত্ব বলে। এগুলোই অন্যান্য জন্তু থেকে আমাদের আলাদা করেছিল, আমাদেরকে 'এইপ' (Ape) থেকে 'ম্যান' করেছিল।

৪.১০

তো আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে, সমাজে বে'হায়া'পনা ছড়ানোর শাস্তি হিসেবে আল্লাহ আযাব পাঠান। সমাজে অশ্লীলতার প্রসারে কিছুই করতে আমরা বাকি রাখিনি। পোশাকের ডিজাইন থেকে নিয়ে নাটক, পত্রিকার বিনোদনপাতা থেকে নিয়ে গানের লিরিক্স—প্রতিটি রাস্তাকে ব্যবহার করে আমাদের সমাজে 'হায়া'কে নষ্ট করা হয়েছে। আজ দেখেন চারিদিকে। মুসলিম-সন্তানদের আমরা 'হায়া' শেখাতে পারিনি। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ওদের মতো আমাদের সমাজ থেকেও 'হায়া', শ্লীলতা, মডেস্টি, ডিসেন্সি শব্দগুলো উঠে গেছে। যা গোপনে করা হতো, তা প্রকাশ্যে করা হয়। সমকামিতার মতো ঘৃণার্হ কাজকে 'অধিকার' হিসেবে দাবি করা হয়। ব্যক্তিস্বাধীনতার পশ্চিমা সংজ্ঞা গ্রহণ, নারীবাদ ও এলজিবিটি আন্দোলনের নামে নির্লজ্জতাকে মূলধারায় আনা, স্কুলে যৌনশিক্ষার নামে 'হায়া' ভাঙানো, নাটক-সিনেমা-বিনোদনের নামে পারিবারিক 'হায়া' ধ্বংস করা—ধ্বংসের কিছুই কি বাকি রেখেছি আমরা?

ফিরে যাই শুরুতে। লুত আলাইহিস সালামের কওমে তিনিই ছিলেন সংখ্যালঘু, এমনকি তার স্ত্রীও ছিল অশ্লীল-মতাদর্শী। **আজ আপনি সমাজে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে কিছু বলে দেখেন, আজ এই লেখায় যা বললাম এগুলো বলে দেখেন। আপনিও টের পাবেন আপনি সংখ্যালঘু। আপনার স্ত্রী-বোন-বেস্টফ্রেন্ডও আপনার বিরুদ্ধে চলে যাবে।** লুত আলাইহিস সালামের জাতি তাকে শাসিয়েছিল : 'বেশি পবিত্র সেজেছ, বেশি পবিত্র হতে চাও?' আপনার জাতিও আজ আপনাকে শাসাবে : 'বেশি হুজুর হয়েছো, উগ্রবাদ ভালো না, টিভি-সিনেমা দেখে না তো জঙ্গিরা।' তাই যদি হয়, প্রবল পরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান আল্লাহর রোষ কেন আসবে না, সেইটে আমাকে বুঝায়ে বলেন।

'করোনা' কেন শুধু, খেল তো সবে শুরু। এ তো একটা, পিকচার আভি বাকি হ্যায়। তবু যদি আমরা কেউ কেউ ফিরে আসি। তবু যদি আমাদের কারো হুঁশ হয়। আসেন আমরা আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে তাওবা করি, আত্মীয়-বন্ধুদের পক্ষ থেকে করি, পুরো উম্মতের পক্ষ থেকে তাওবা করি। ফিরে আসি। إن عذابك بالكفار

ملحق—'ইন্না আযাবাকা বিল কুফফারি মুলহিক্ব।' আয় মালিক, আপনার আযাব কাফিরদের জন্য। আল্লাহ, আমরা আপনাকে চিনি, আপনার আযাবকে ভয় করি। আল্লাহ, আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের মাফ করে দেন। আমরা আর ফিরে যাব না আগের অন্ধকার জীবনে। এবারের মতো আমাদের মাফ করে দেন।

পাশ্চাত্য সমাজে ইসলাম

ইতিহাস কেবল ধারাবিবরণী নয়। ইতিহাসের ক্ষেত্রে ঘটনার গভীরতা ও পারিপার্শ্বিকতা চিন্তা করা চাই। ইতিহাসে লুকায়িত আছে সুন্নাতুল্লাহ বা 'বান্দাদের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত রীতি।' সেটা বের করা গেলেই ইতিহাসের অর্থ বেরিয়ে আসে।

মনের দরজা-জানালা খুলে নিয়ে পড়তে হবে। দুনিয়ার কোনোকিছুই সরল রেখায় চলে না। একেকটা জিনিসের পেছনে বহু ফ্যাক্টর কাজ করে। এরপরও আমরা সবকিছুকেই কমন ফর্মুলায় ফেলি। সেই ফর্মুলাটা ফলো করি বা এভোয়েড করি। এটাই আল্লাহর রীতি ধরে নিই। আর দুআ করি, যাতে নেপথ্যে ক্রিয়াশীল তাঁর যত রীতি আছে সবগুলোর মাঝে ফাইন টিউনিং করে আল্লাহ যেন আমার উদ্দেশ্যটা পুরো করে দেন। মোটাদাগে একটা সরলীকৃত ফরমেট আমরা বের করতে চাই নিজেদের অনুসরণের জন্য। এবারও আমরা সেটাই করব। মানবমন ও সমাজের একদম সাধারণ আদিম সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে কিছু কথা বলব।

মানুষ তার পরিবেশ দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। ভীষণভাবে। এটা কারো সত্যায়নের দরকার নেই। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাই এজন্য যথেষ্ট। এমনকি বাকি সব ফ্যাক্টর অপরিবর্তিত থাকলে (সেটেরিস পেরিবাস) কেবল পরিবেশ একজন লোককে ১৮০ ডিগ্রি বদলে দিতে পারে। ইবনু খালদুন বলছেন, প্রথম প্রজন্মের মাঝে ধর্মবোধ প্রবল থাকে। তার 'আসাবিয়া তত্ত্ব'-টা আমরা ব্যক্তি লেভেলে খাটাব। প্রতি পরবর্তী প্রজন্ম ভোগবিলাসের দিকে ঝুঁকতে থাকে, ধর্মীয় উপাদান কমতে থাকে, দুনিয়ামুখিতা বাড়তে থাকে। তার মানে প্রথম পুরুষ যতই ধার্মিক

ও গোত্রপ্রীতি (ধরে নিচ্ছি ধর্মপ্রীতি-মুসলিমপ্রীতি) ওয়ালা হোক। পরের দুই-তিন পুরুষে তার জায়গা নিয়ে নেয় ধর্মহীনতা ও অসাম্প্রদায়িকতা (নিজ ধর্মের লোকের সাথে দূরত্ব ও পরধর্মের লোকেদের সাহচর্যপ্রিয়তা)। এটা বাড়তেই থাকে প্রজন্মে প্রজন্মে, যদি না আল্লাহ অন্য কোনো ফাইন টিউনিং করেন।

পশ্চিমা সমাজটাকে বুঝব আমরা এখন। এখন এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আমরা সমাজ সংগ্রামে লিপ্ত পশ্চিমা সভ্যতার বিরুদ্ধে। টিভিতে দেখছেন ইউরোপ-আমেরিকার বেহেশত, হুর, সুখ, আয়েশ। আবার হুজুর নামক একটা শ্রেণি ওয়াজে বলছে টিভি হারাম, শয়তানের বাকসো। আবার টিভিতেই আরেক হুজুরের প্রোগ্রাম হয়, সেটাও না দেখলে চলছে না। একটা দ্বন্দ্ব। নিজের মধ্যে, সমাজের মধ্যে। না পারছেন পুরো পশ্চিমী হতে, না পারছেন পুরো পশ্চিম ডিনাই করতে। সবখানে একটা দ্বন্দ্ব। ঠিক এই দ্বন্দ্বটাই ইউরোপ-আমেরিকা শেষ করে এসেছে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে। এখন বাংলাদেশে নারীদের যে অবস্থা, সেটা ইউরোপ আমেরিকা ৫০-৬০ এর দশকে শেষ করে এসেছে। ইউরোপ-সংলগ্ন মুসলিম দেশগুলো তারপর। আমাদের দেশে নব্বইয়ের দশকের দিকে। এখন সেটা সৌদিতে। এখন পশ্চিম যে অবস্থানে আছে, আমরা সেখানে পৌঁছাব ২০৪০-৫০ এর দিকে (সেটেরিস পেরিবাস)। উপমহাদেশে দেওবন্দি ও সৌদিতে সালাফি আন্দোলন না থাকলে আমরা আরো ২০ বছর আগেই ভেসে যেতাম স্রোতে। যেমন গেছে মিসর, তিউনিসিয়া, সিরিয়া, লেবানন, আমাদের বহু আগেই।

একটা উদাহরণ দিলে সহজ হবে। প্রফেসর জেফ্রি লাংয়ের *আত্মসমর্পণের দ্বন্দ্ব* বইটা আমাকে খুব সাহায্য করেছে পশ্চিমা সমাজকে বুঝতে। বইটা আমি সবাইকে পড়তে বলব না, কেন তা পরে আসছি। একটা ইসলামিক সেমিনারের ঘটনা উল্লেখ করেন উনি। একজন মুসলিম বোন উপস্থিত গেস্ট আলিমকে জিজ্ঞেস করেন : আচ্ছা শাইখ, এই যে আপনারা নারী-পুরুষ আলাদা করে বসিয়েছেন, এটার দ্বারা আমরা অফেন্ডেড ফিল করছি। আপনার কি মনে হয় না, একসাথে মিশিয়ে বসার সুযোগ দিলে আমরা মেয়েরা আরো ভালো শুনতে পারতাম? শাইখ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পরের প্রশ্নে চলে যান। আমাদের সমাজের সাথে মেলান এবার। আমাদের সমাজে মেয়েরা এখনো আলাদা বসতেই কমফোর্ট ফিল করে। এটা ওই বোনের দ্বীনী জ্ঞানের কমতি যতটা না, তার চেয়ে বেশি আমেরিকার সমাজ-বাস্তবতা। সমাজমানসে নারী-পুরুষ সমতা, ফ্রি-মিক্সিং এতটাই নির্দোষ এতটাই স্বাভাবিক, এতটাই যে, আলাদা বসতেই তারা আনইজি ফিল করছে। এটা আমেরিকার সমাজ।

এটা আমাদের মতো নয়। ইসলামের যে বিষয়গুলোতে আমাদের এখানে, বা অন্য মুসলিম সমাজে প্রশ্ন উঠবে না, ওখানে সেগুলোতেও মুসলিমদের মধ্য থেকেই প্রশ্ন ওঠে। কারণটা কী?

কাফির রাষ্ট্রে মুসলিম মনস্তত্ব কেমন হয়, আরেকটা উদাহরণ দিই। আমেরিকাতে বিভিন্ন ভার্সিটিতে মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন (MSA) আছে। এমনই এক MSA-এর প্রোগ্রামে, খেয়াল করুন 'মুসলিম ছাত্রদের প্রোগ্রামে' একজন মুসলিম ছাত্র প্রশ্ন করলেন দাঈ উস্তায ড্যানিয়েল হাকিকাতজুকে : সমকামীদের অধিকারের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান কী? তো উনি হীনম্মন্যতা না রেখে স্ট্রংলি ইসলামের অবস্থান তুলে ধরলেন। পরে শুনলেন : এমন একজন কট্টরপন্থি দাঈকে কেন প্রোগ্রামে আনা হলো, তা নিয়ে মুসলিম ছাত্ররাই প্রশ্ন তুলেছে।

ইসলাম ব্যক্তিপর্যায়ে সীমাবন্ধ ধর্ম নয়। ব্যক্তির নিজস্ব আধ্যাত্মিকতা-সর্বস্ব ধর্ম নয়। যেমনটা খ্রিস্টধর্ম। খ্রিস্টবাদের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ আকিদা হলো : ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর একমাত্র ঔরসজাত (begotten) পুত্র বলে মেনে নেওয়া এবং এটা মেনে নেওয়া যে, তিনি আমাদের পাপমোচনের জন্য ক্রুশে আত্মাহুতি দিয়েছেন। এরপর আপনি কী করলেন না করলেন, তা আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। এরপর আপনি চাইলে গে হন, চাইলে ঈসায়ি মুসলিমও থাকতে পারেন। যা ইচ্ছে করতে পারেন, আপনাকে ঈসা জাহাজে করে বেহেশতে নেবেন। এজন্য দেখেন খ্রিস্টান মিশনারিরা কোনায় কোনায় গিয়ে উপজাতিদের খ্রিস্টান বানিয়েছে। ডন রিচার্ডসনের *Eternity in Their Hearts* বইয়ে দেখবেন, পাদরিরা গিয়ে সাঁওতালদের বলছে, আমরা তোমাদের 'ঠাকুর জিউ'-এর লোক। বিশ্বাস বদলে দিয়ে আচার-পার্বণ, ব্যস। **বিপরীতে ইসলামের প্রচারটা ভিন্ন। দেখুন, সাহাবিরা যুদ্ধ করেন, দেশ জয় করেন, এরপর ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম খলিফার জন্য বছরে একবার বা দুবার কাফিরদের সীমান্তে ফৌজ পাঠিয়ে ইকদামি জিহাদ ফরজ। জয় করে প্রচার।** কেননা ইসলাম শুধু বিশ্বাস নয়। যখন আপনি কাউকে ইসলাম শেখাচ্ছেন, আপনি প্রথমত তাকে...

» আধ্যাত্মিকতা শেখাচ্ছেন
» এরপর আত্মশৃঙ্খলা
» এরপর শেখাচ্ছেন সমাজজীবন (আচার-পার্বণ সমাজজীবনের অংশ)
» এরপর অর্থব্যবস্থা

- রাষ্ট্রনীতি
- যুদ্ধনীতি
- আইন-বিচার

ভূমি জয় না করে নতুন একটা সমাজ, নতুন একটা বাজার-অর্থনীতি, নতুন একটা রাষ্ট্রচিন্তা আপনি কখনোই প্র্যাকটিক্যালি দেখাতে পারেন না। কেউ পারেনি, না সমাজতন্ত্র, না গণতন্ত্র, কেউ না। **পৃথিবীর কোনো ওয়ার্ল্ডভিউ, কোনো জীবনব্যবস্থা তরবারি ছাড়া ছড়ায়নি।**

- ফরাসি বিপ্লবে রাজতন্ত্র হটিয়ে গণতন্ত্র আনতে তরবারি লেগেছে।
- রুশ বিপ্লবে রাজতন্ত্র সরিয়ে সমাজতন্ত্র আনতে তরবারি লেগেছে, সমাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে তরবারি লেগেছে।
- মাও সে তুংয়ের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে গণতন্ত্র সরিয়ে সমাজতন্ত্র আনতে তরবারি লেগেছে, টিকিয়ে রাখতে লেগেছে।[১]
- লিবিয়া-ইরাকে স্বৈরতন্ত্র সরিয়ে গণতন্ত্র দিতে তরবারি লেগেছে।
- আফগানিস্তানে গণতন্ত্র সরিয়ে ইসলাম আনতে তরবারি লেগেছে, আবার ইসলামি ইমারাত সরিয়ে গণতন্ত্র দিতেও তরবারি লেগেছে।

যখন সামনে ব্যাবহারিক একটা কাঠামো থাকবে না, তখন জন্ম নেবে প্রশ্ন। যেমন এখন। হদ নিয়ে প্রশ্ন, পর্দা নিয়ে, মুরতাদের শাস্তি নিয়ে, জিযিয়া নিয়ে। কারণ, সামনে কোনো উদাহরণ নেই। রাষ্ট্র ও আইন নেই সামনে, তাই মুসলিম অধ্যুষিত দেশেও প্রশ্ন উঠছে। এখানে আপাত একটা সমাজ আছে, তাই সমাজ নিয়ে কিছু উত্তর এখনো অবশিষ্ট আছে। এখন যেখানে মুসলিম-সমাজ নেই (পশ্চিম), শিক্ষা দিয়ে ধুমসে ঢুকছে তাদের সমাজের বিষ, সেখানে স্বাভাবিকভাবে ইসলাম নিয়ে মুসলিমদের আরো বেশি প্রশ্ন থাকবে।

তাদের রাষ্ট্রচিন্তা আমাদের রাষ্ট্রচিন্তা আলাদা, সাংঘর্ষিক। তাদের সমাজচিন্তা, আমাদের সমাজচিন্তা আলাদা এবং সাংঘর্ষিক। ইসলাম একটা টোটালিটি, হোলিস্টিক সিস্টেম। যখন আপনি ইসলামের রাষ্ট্রচিন্তাকে কম্প্রোমাইজ করলেন,

[১] necrometrics.com সাইটটা দেখতে পারেন। বিভিন্ন ইতিহাসবিদের রেফারেন্স আছে

তো সমাজবিধানের কিছুটাও আপনাকে ছাড় দিতে হবে। এরপর তা এসে পড়বে পরিবারের ওপর, পারিবারিক ইসলামেও ছাড় দিতে হবে আপনাকে। এরপর ব্যক্তিগত আচারেও আপনাকে ছাড় দিতে হবে। প্রতিটি ছাড় আপনাকে আরো ছাড় দিতে বাধ্য করে। **কীভাবে পশ্চিমা রাষ্ট্রচিন্তা তাদের সমাজচিন্তাকে চাপিয়ে দিয়ে মুসলিমের ব্যক্তিক ইসলামকে নষ্ট করে, তার কিছু উদাহরণ দেখুন—**

» ছেলেকে LGBT ক্লাস করতে না দেওয়ায় ব্রিটেনে মুসলিম পিতাকে জেল। কয়দিন দেবে জরিমানা এই বাবা। থাকতে তো হবে (?) সেখানেই।[১]

» নিকাব নিষিদ্ধ করে দেশে দেশে আইন পাশ ও জরিমানার বিধান।[২]

» নিকাব পরলে জরিমানা গুনতে হবে।[৩]

» জার্মান কোর্ট হেডস্কার্ফ পরতেও বারণ করেছে।[৪]

» ইনসিওরেন্স ইত্যাদি সুদি ব্যবস্থার আওতায় সব নাগরিককে আসতে হয়। (কেটে নেওয়া টাকা ব্যালেন্স করতে অনেক আলিম জমাকৃত টাকার সুদ গ্রহণকে জায়িযও বলে থাকেন সেখানে)

সেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমাজব্যবস্থায় অর্থব্যবস্থায় একথা বলার কোনো সুযোগই নেই যে, আমি ইসলাম পালন করছি। শুধু সালাত পড়তে পারার নামই কি ইসলাম? কোনো না কোনোভাবে আপনি হাজারো কবিরা গুনাহে লিপ্ত হচ্ছেন। কিংবা আপনি এমন ইসলামকে 'ভালোভাবে মানছেন', যে ইসলামের সাথে নবি-সাহাবি ও সালাফগণের কোনো সম্পর্ক নেই, **এক রিফাইনড ও রিডিফাইন্ড ইসলাম আপনি ভালোভাবে মানার দাবি করছেন। কাফির সমাজব্যবস্থায় টিকে থাকার উদ্দেশ্যকে মূল ধরে নিয়ে কুরআন-হাদিসের স্পষ্ট বিধানকে ইনিয়ে-বিনিয়ে সাইড করে এক আশ্চর্য ইসলাম আপনি পালন করছেন।** আর আত্মতৃপ্তিতে ভুগছেন। আজ আপনি যে পরিমার্জিত 'গুড' ইসলাম মানছেন, আপনার সন্তান সেটুকুও মানবে না, নাতি

---

[১] Jimmy Nsubuga (3 Feb 2020), Dad who refuses to send son to school over LGBT lessons is facing jail, Metro.co

[২] Where are 'burqa bans' in Europe? DW (01.08.2019)

[৩] Denmark veil ban : First woman charged for wearing niqab. BBC (4 August 2018)

[৪] Berlin court bars Muslim teacher from wearing headscarf. BBC (9 May 2018)

আরো ছেড়ে দেবে। ইবনু খালদুনের তত্ত্ব থেকে দেখুন, এই প্রভাব ২-৩ প্রজন্ম পর হয় পুরো বিশ্বাসকেন্দ্রিক মুসলিম (সালাত না পড়লেও ঈমান ঠিক আছে টাইপ) কিংবা মুরতাদে (যে বলবে, এ যুগে এদেশে ইসলাম মানা সম্ভব নয়। যে ভাববে, ইসলাম পুরোনো মডেল, আধুনিক রাষ্ট্র মডেলের সাথে ইসলাম যায় না) পরিণত করবে আপনার বংশধরদের। এর পেছনে কি আপনার কোনো দায় নেই? **আজ কাফির রাষ্ট্রে আপনি সেটেল হবার যে সিদ্ধান্তটা নিলেন, সেই সিদ্ধান্তের কি কোনোই দায় নেই আপনার পরবর্তী প্রজন্ম মুরতাদ হবার পেছনে?**

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম কাফির অধ্যুষিত দেশে সেটেল হবার বিপক্ষে মত দিয়েছেন। ব্যবসা বা শিক্ষার জন্য যাওয়া যাবে, তবে স্থায়ীভাবে থাকা যাবে না। হানাফি মাযহাবে সবচেয়ে বেশি ছাড় দেওয়া হয়েছে। ফাতওয়াগুলো লক্ষ করবেন, এর চেয়ে বেশি লক্ষ করবেন ফাতওয়া চাইবার ভাষাটা। মুসলিম দেশে তিনি ইসলাম পালন করতে পারছেন না, বরং কাফির রাষ্ট্রে তিনি নিরাপত্তার সাথে ইসলাম পালন করতে পারছেন। মানে কী এগুলোর? **কোন সে ইসলাম যা তিনি মুসলিমদের মাঝে পালন করতে পারছেন না। সেই ইসলাম পালন করতে তাকে কাফিররাই বেশি সহায়তা করছে।** অনেকে বলবেন, মুসলিমদের দেশগুলোতে যুদ্ধ চলছে, জানমালের নিরাপত্তা নেই; বরং কাফিরদের দেশে স্থিতিশীলতা আছে, রাষ্ট্র কাঠামো সুসংহত।

মাঝে কিছু ছবি দেখলাম। গ্রিক সীমান্ত থেকে সিরীয় যুবকদের খেদিয়ে দিয়েছে। আন্ডারপ্যান্ট পরে শীতে যারা কাঁপছে, তাদের সবাই যুবক। তাদের দেশে অলরেডি একটা অংশ ইসলাম কায়েমের জন্য, দ্বীন পালনের পরিবেশদায়ী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মেহনত করছে। আর এরা প্রাণভয়ে আশ্রয় নিচ্ছে কাফির দেশে। এমন নয় যে, সংগঠিত হওয়া কঠিন, অলরেডি সংগঠিত মেহনত চলছে। **আসল কথা হলো, কাফিররা নয়; মুসলিমদের মধ্যে বিরাট একটা অংশ ইসলামকে ভয় পায়। ইসলামি সমাজ-আইন-বিচার-শাসনকে ভয় পায় কাফিদের চেয়ে বেশি। এরা ইসলাম চায়, ইসলামি রাষ্ট্র** চায় না। সেক্যুলার ইসলাম চায়। কাফিরদের মনমতো ইসলাম পালন করতে চায়। **আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি ১৪০০ বছর আগে। মদিনা নগররাষ্ট্র। কিছু মানুষ সেখানে সামনের কাতারে সালাত পড়ে, ইশা ও ফজরের সালাতও জামাআতের সাথে পড়ে, কুরআন তিলাওয়াত করে আবেগঘন তারতিলে, কিন্তু মক্কার মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক রাখে, সাজশ করে ইহুদিদের সাথে। যেকোনো সুযোগে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উৎখাত করার জন্য। ইসলামকে**

সহ্য হয়, সহ্য হয় না ইসলামি রাষ্ট্র-সমাজ-আইন-বাজার। মিলিয়ে নিন, এরাও বড় গলায় বলত আমরা মুসলিম, আমাদের ইসলামে কোনো খাদ নেই, কিন্তু আল্লাহর খাতায় তারা কী? সুতরাং,, ইসলাম পালনের নামে সুবিধার যে অজুহাত দাঁড় করাচ্ছেন, সেই ফাঁকি আল্লাহকে দিতে পারবেন তো?

কাফিরদের মাঝে থাকার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, **তাদের সাথে ওঠাবসার ফলে সহমর্মিতা তৈরি হয়। তাদের কুফরকে নির্দোষ মনে হয়, শিরককে তার অধিকার মনে হয়। তাওহিদকে আবশ্যিক মনে হয় না।** হয় আপনার কাছে, নয় আপনার সন্তানের কাছে, নয়তো আপনার নাতির কাছে। দ্বীনি গায়রত চলে যায়, দ্বীনের প্রবল বিধান নিয়ে হীনম্মন্যতা, তা থেকে সংশয়, তা থেকে ইরতিদাদ। একদম সরলরেখা। একসময় এটা হবেই। এজন্য এককভাবে আপনি দায়ী। সামান্য দুনিয়ার চাকচিক্য, নিরাপত্তা, আরাম, স্বস্তির জন্য আপনি অনন্তকালের শাস্তির রাস্তা বেছে নিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমা সমাজমানস খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়ে গেছে। পশ্চিম আর ইসলাম খুব দ্রুত প্রতিপক্ষ হয়ে গেছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে 'কাফির দেশে স্থায়ী বসবাস' নিয়ে ফিকহশাস্ত্রবিদদের আবার ভাবার সময় এসে গেছে। রাষ্ট্রীয় পলিসির কারণে নারী-উদ্দামতা, সমকামিতা, নাস্তিকতা, ইসলামের ফরজিয়াত অস্বীকার প্রভৃতি বাধ্যতামূলকভাবে সন্তানদের শেখাতে হচ্ছে। আর ওয়ালা-ওয়াল বারাআ (মুমিনদের প্রতি ভালোবাসা-বন্ধুত্ব আর কাফিরদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ) তো এমনিতেও নষ্ট হয়, খালদুনীয় ফর্মুলায়।

ইসলাম একটা বুননের মতো। শুধু সালাতের কথা চিন্তা করেন। দেখেন সালাতের একটা রাষ্ট্রীয় বুনন আছে (মসজিদ-টাইম-সুযোগ তৈরি), একটা সামাজিক বুনন আছে (নামাযিদের মাঝে থাকা-বেনামাযির প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি), পারিবারিক বুনন আছে (বাবা-মায়ের কেয়ার, তিরস্কার ইত্যাদি), সেই সাথে ব্যক্তিক বুনন (দায়বদ্ধতা, অভ্যাস ইত্যাদি)। সবকটা বুনন মিলে 'ইকামাতে সালাত' হচ্ছে, সালাত প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। নামাযি বাড়ছে, বেনামাযি নামাযি হচ্ছে, নামাযি জামাআতের পাবন্দি করছে, সালাতকে জীবনে ধরে রাখছে। এভাবে দ্বীনের প্রত্যেকটা বিধানের পরতে পরতে বুনন আছে। এক পরত ছুটিয়ে দিলে বাকিগুলোও আস্তে আস্তে ছুটে যায়। কর্তৃপক্ষের লেভেলে সালাতের সহায়তা বাদ দিলে শেষে গিয়ে ব্যক্তিজীবনেও সালাত বিঘ্নিত হয়। গ্রামের দিকে অনেক জায়গায় এখনো বেনামাযিকে অন্যচোখে দেখা হয়, গোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন নজরে দেখা হয়। সালাতের মতো একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় দিয়ে উদাহরণ দিলাম। অপেক্ষাকৃত বেশি সামাজিক বা পারিবারিক বিধানগুলো এখন মুসলিম দেশেই

সেক্যুলারিতার কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেখানে কাফির দেশে কীভাবে আপনারা ইসলাম ভালোভাবে পালনের দাবি করছেন, আমি বুঝতে পারছি না।

যদি শুধু ব্যক্তি বা পরিবারে আপনি ইসলাম চর্চা করছেন বলে মনেও করেন, সেটা নিম্নমুখী, ক্ষয়িষ্ণু। যেটা ওপরের উদাহরণ থেকে দেখলাম। রাষ্ট্র নেই (মুসলিম দেশেও রাষ্ট্র নেই অবশ্য), সমাজ নেই (এটা তো মুসলিম দেশে আছে এটলিস্ট কিছুটা), অতএব আপনার পারিবারিক ও ব্যক্তিক ইসলাম ক্ষয়িষ্ণু। ইবনু খালদুনও সেটাই বলছেন। আরাম-আয়েশ নিরাপত্তা বাড়বে, ধর্ম কমবে। আপনার যা আছে, তাও থাকবে না, সন্তানের আরো থাকবে না, নাতির আরো না। এটাই পরিবেশ। এমনকি পশ্চিমের আলিমরাও এ থেকে মুক্ত নন। তারা ফেরেশতা নন, তাই পরিবেশ-সমাজ-সাহচর্যের প্রভাব থেকে মুক্ত নন। দেখুন একজন মুসলিম মেয়ে অপমানবোধ করছে, কেন তাকে আলাদা বসানো হলো, কেন ছেলেমেয়ে মেশানো হলো না। মুসলিম ছেলেরা দাঈকে অপছন্দ করছে, কেন তাদের সমকামী বন্ধুদের মেনে নেওয়া হবে না। **এই রকম মুসলিম কমিউনিটির কাছে জনপ্রিয় হতে চাইলে বা এদের মাঝে কাজ করতে চাইলে হিকমাহর নামে আপনাকে অবশ্যই দ্বীনের কিছু অংশ চেপে যেতে হবে। নইলে এরা আপনার কথা শুনবে না, আপনাকে অপছন্দ করবে**। মেয়েটির প্রশ্নে সেই আলিম জবাব না দিয়ে কেন পরের প্রশ্নে গেলেন, এটা জেফ্রি লাংয়ের লেগেছে। কেন হাকিকাতজু ভাই সমকামীদের অধিকারের পক্ষে অবস্থানকে কুফর বললেন, এটা মুসলিম ছাত্রদের লেগেছে। এভাবে আপনি পশ্চিমা মুসলিম কমিউনিটির কাছে পাত্তা পাবেন না।

এজন্যই পশ্চিমা সেলিব্রেটি দাঈ-আলিমদের উপস্থাপিত ইসলাম অপূর্ণাঙ্গ হয়। পুরোটা তারা তুলে ধরতে পারেন না, চাইলেও পারেন না। পুরোটা প্রেজেন্ট করতে চাইলে তারা সমস্যায় পড়বেন। ইসলামের সামাজিক বুনন তুলে ধরলে সামাজিকভাবে আপনি বয়কট হবেন, যেমন হাকিকাতজু ভাই হলেন। রাষ্ট্রীয় বুনন তুলে ধরলে আপনি জেলে যাবেন, যেমন শাইখ জিবরিল গেছেন। পশ্চিমা দাঈদের উপস্থাপিত ইসলাম হতে হয় পশ্চিমা সমাজের সাথে মিলিয়ে, পশ্চিমা রাষ্ট্রচিন্তার সাথে মিলিয়ে। ব্যালেন্সিং ইসলাম উইদ সিভিল রাইটস। এ এক নতুন ইসলাম, এক নতুন ধর্ম হয়ে যায় তখন। পশ্চিমা ইসলাম। এখানে ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বুনন থাকে না। পারিবারিকও না, ব্যক্তিস্বাধীনতার তোড়ে। বেশি তেড়াব্যাড়া করলে সন্তান কেসও করে দিতে পারে। ফলে তা অতিক্ষয়িষ্ণু এক আজব ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে কুফরের পাশে দাঁড়ানো হয় টিকে থাকার কৌশল, ধর্মের খুঁটি। ব্যক্তিজীবনের

ইসলাম নিশ্চিত করতে আপনাকে জগতের নিকৃষ্টতম কর্ম (যেমন সমকামিতা) কে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাস্তায় নামতে হবে। অথচ অলরেডি আপনি কুফরের সীমা অতিক্রম করে ফেলেছেন। হাদিস : অন্যায় হতে দেখলে হাত দিয়ে বাধা দাও, নয়তো মুখে নিষেধ করো। তাও না পারলে অন্তরে ঘৃণা করো। এর নিচে আর ঈমান নেই।[১] আর আপনি অন্তরে ঘৃণা না করে সেটাকে সিভিল রাইট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম করছেন। মানে ঈমানের শেষ সীমার নিচে চলে এসেছেন। প্রবেশ করেছেন কুফরের সীমায়।

এজন্য পশ্চিমা দাঈদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ খুব সতর্কতার সাথে গ্রহণ করতে হবে। ঠিক যেমন ডাক্তার জাকির নায়েক যখন কোনো হিন্দুকে বোঝানোর জন্য হয়তো কোনো একটা বিষয় ব্যাখ্যা করলেন, যেটা আপনার জন্য নয়, সেটা হয়তো ইসলামের ব্যাখ্যাও নয় বা ডিফেন্সিভ ব্যাখ্যা। **তেমনি এসব দাঈর ব্যাখ্যা, ভেঙে ভেঙে বিশ্লেষণ করে লঘুকরণ, এটা আমেরিকান মুসলিমদের জন্য, তাদেরকে তাদের সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষিতে অচেনা ইসলামি সমাজের বুঝ দেওয়ার জন্য; আপনার জন্য নয়।** আমেরিকান একজন মুসলিমের মেন্টাল সেট-আপ ও সমাজবাস্তবতা আপনার মতো নয়। ঠিক একই কারণে **কাফির ভূমিতে বেড়ে ওঠা কোনো দাঈর সামাজিক-রাষ্ট্রীয় বিধানের ব্যাখ্যা অবশ্যই আপনি নেবেন না। কারণ একই মানস-গঠনের কারণে এলিয়েন (অপরিচিত) ইসলামি সমাজ-রাষ্ট্র-আইনকে সে তার চেনা সমাজ-রাষ্ট্র-আইনের সাপেক্ষে ব্যাখ্যা করবে।** উদাহরণ যদি দিই, উস্তায নোমান আলি খান। বড় হয়েছেন, পড়াশোনা করেছেন আমেরিকায়। আপনি কুরআনের ব্যাকরণিক বিস্ময়গুলো তার থেকে নিলেন, কিন্তু যখন তিনি বলছেন—সাহাবিরা পরিচয়ের ভিত্তিতে নিজেদের মাঝে বৈধ কোর্টশিপ (প্রেম) করতেন। তখন আপনাকে ভুরু কুঁচকাতে হবে। এমন কথা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। **এই ভুরু কুঁচকানো-প্রত্যাখ্যান করা আপনাকে শিখতে হবে, কখন কুঁচকাতে হয় কখন ছুড়ে ফেলতে হয় আপনাকে জানতে হবে।** এটা ইলমের বিষয় নয়, কাণ্ডজ্ঞানের আওতায় পড়বে। কারণ নোমান আলি খান যে সমাজে বড় হয়েছেন, সেখানে হারাম সম্পর্ক পানিভাত। সেই চোখে তিনি ব্যালেন্স করতে চেয়েছেন স্বাভাবিক মানবপ্রকৃতির তাড়নায়।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৪৯; *সুনানু আবি দাউদ* : ১১৪০, ৪৩৪০; *সুনানু নাসায়ি* : ৫০০৮; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১২৭৫, ৪০১৩; *মুসনাদু আহমাদ* : ১১০৭৩, ১১১৫০, ১১৪৬০, ১১৫১৪; *আস-সুনানুল কুবরা,* বাইহাকি : ১১৫১৩, ১৪৫৪৮, ২০১৭৯; ; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৩০৬, ৩০৭

সুতরাং, ব্যক্তিক ও পারিবারিক ইসলাম আপনি পশ্চিমা দাঈদের কাছে পেলেও পেতে পারেন। সব আবার পাবেন না। অর্থনৈতিক অংশটুকুও পশ্চিমের অর্থব্যবস্থার আলোকে ব্যালেন্স করে তারা আপনাকে জানাবে, ওইটুকুই জানাবে যেটুকু আপনার পশ্চিমে থাকার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। সেটুকুই আপনি শুনতে চান, বাকিটুকু শুনতে চান না। কারণ যাদের উদ্দেশে উনি বলছেন, তাদেরকে থাকতেই হবে পশ্চিমে। পশ্চিমে থাকতে অসুবিধা হয়, ইসলামের এমন অংশটুকু তাদের কাছে অপ্রিয়। অপ্রিয়টুকু আপনাকে তারা শোনাবে না। সামাজিক দিকগুলোও পাবেন না। তাহলে কোথায় পাবেন? সেসব পাবেন মুসলিমপ্রধান দেশে, যেখানে ইসলামের সামাজিক দিকগুলো এখনো আংশিক রয়েছে, বা আলিমরা নির্ভয়ে সামাজিক দিকগুলো বলছেন। যেমন বাংলাদেশের কথাই ধরি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলোর আলোচনা কমে গেলেও এখনো শেষ হয়ে যায়নি। সুদ, পর্দা, মাহরাম বিষয়গুলোর আলোচনা এলে পরদিন ইমামের চাকরি নেই। তারপরও কিছু আলোচনা আছে। এগুলো জায়িয বা ইনিয়ে-বিনিয়ে জায়িয তো বানাচ্ছে না এটলিস্ট। আবার রাষ্ট্রীয় বিধানগুলোতে তারা কম্প্রোমাইজ করছেন, তাদের মুখে 'ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামি জিনিস', 'শাসকের আনুগত্য না করলে খারেজি'—এসব বয়ান পেলে আপনার ভুরু কুঁচকাতে হবে। কেননা তাদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা নেই, ফলে রাষ্ট্রচিন্তাগুলোও তাদের প্রভাবিত, যেমনটা পশ্চিমা দাঈদের সমাজচিন্তা প্রভাবিত। এটা আবার কোথায় পাবেন? এটা পেতে হলে আপনাকে তাকাতে হবে, যেখানে ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে আছে। সেখানে আপনি ইসলামের রাষ্ট্রীয় হুকুমগুলোর নির্ভেজাল ব্যাখ্যা পাবেন। **তেমনি জিহাদ এমন একটা বিষয় যার সঠিক আনইন্টেরাপ্টেড আনবায়াসড পিওর হুকুম ও ব্যাখ্যা আপনি এ যুগে সেখানেই পাবেন, যেখানে সেটার আমল হচ্ছে। সুবিধার জন্য, হিকমাহর নামে, কারো হুমকি থেকে বাঁচতে কোনো কাটছাঁট করা হচ্ছে না। বিকৃতির জন্য প্রভাবক থেকে তারা মুক্ত। ইসলামের ব্যক্তিক-পারিবারিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-বিচারিক-রাষ্ট্রীয়-আন্তর্জাতিক সকল হুকুমের ব্যাখ্যা ও দর্শন যদি একসাথে চান, আপনাকে সেই ভূমির দিকে তাকাতে হবে, যেখানে ইসলাম জয়ী, ইসলাম যেখানে মিনমিন করে চলে না, বুক চিতিয়ে চলে সেখানে আল্লাহর হুকুম।**

এখন আপনি যদি আমেরিকায় অবস্থানকারী কোনো দাঈ থেকে বা আমেরিকায় বেড়ে ওঠা কোনো দাঈ থেকে জিহাদের মতো ইসলামের আন্তর্জাতিক দর্শনের ব্যাখ্যা চান, সেটা হবে আপনার ভুল। যেখানে সে পাশ্চাত্য সমাজের প্রভাবে

ইসলামের সামাজিক দর্শনই তুলে ধরতে অপারগ, সেখানে আন্তর্জাতিক দর্শন ক্লিয়ার করা আপনি কীভাবে আশা করেন। হতে পারে তার জ্ঞান সম্পর্কে আপনার অগাধ বিশ্বাস। এটা জ্ঞানের বিষয় নয়, এটা টিকে থাকার ইস্যু। সে সমাজে টিকে থাকতে হলে তিনি এগুলো আপনাকে ক্লিয়ার করতে পারবেন না। সম্প্রতি নোমান আলি জিহাদ সম্পর্কে যা বলেছেন, তা তার জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক। আপনি এই বিষয়ে তার ওপর আস্থা রাখছেন, এটা আমার-আপনার ভুল। **ঠিক একারণেই পরিপূর্ণ ইসলামকে বুঝতে আপনাকে পূর্ববর্তী আলিমদের বক্তব্য নিতে হবে যেসময় ইসলাম বিজয়ী ছিল, তাহলে আপনি পুরো বুননটা পাবেন। আধুনিক সময়ে মুসলিমরা পরাজিত, মানসিকতাও পরাজিত। আধুনিক যুগের স্কলারদের কথা যদি জমহুর (অধিকাংশ) ক্ল্যাসিক্যাল স্কলারদের বিরুদ্ধে যায়, আপনাকে বুঝতে হবে তার সীমাবদ্ধতা, ক্ল্যাসিক্যালদের বিজয়ের যুগে সীমাবদ্ধতা ছিল না।** তবেই আপনি আংশিক ইসলামের হাত থেকে মুক্তি পাবেন। 'তবে কি তারা কিতাবের কিছু অংশ মানে কিছু অংশ মানে না?'র অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো স্পষ্ট নির্দেশনা আমাদের দিয়েই গেছেন—সর্বোত্তম আমার যুগ, এর পরের যুগ, তার পরের যুগ। এরপর মিথ্যা প্রকাশ পাবে।[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর প্রথম তিন যুগের চোখে ইসলামকে জানুন, পুরো বুননটা পাবেন। আর এখনকার চোখে নিলে পাবেন সুতোছেঁড়া বুনন—এড়ে যাওয়া শতচ্ছিন্ন এক ইসলাম, যাতে সতরই ঢাকে না। আল্লাহ আমাদের গুনাহগুলো ঢেকে রাখুন। ইয়া সাত্তার।

[১] আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম ব্যক্তি (যারা আমাকে দেখেছে—সাহাবি), অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী (যারা সাহাবিদের দেখেছে—তাবিয়িন), অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী (যারা তাবিয়িদের দেখেছে—তাবি তাবিয়িন)। এরপর আসবে মিথ্যা কসম ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার যুগ।
সহিহ বুখারি : ২৬৫২, ৩৬৫১, ৬৪২৯, ৬৬৫৮; *সহিহ মুসলিম* : ২৫৩৩; *জামি তিরমিযি* : ৩৮৫৯; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৩৬২; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৪৩২৮, ৭২২২, ৭২২৩, ৭২২৭, ৭২২৮; *মুসনাদু আহমাদ* : ৩৫৯৪, ৩৯৬৩, ৪১৩০, ৪১৭৩, ৪২১৭; *মুসনাদু আবি দাউদ তায়ালিসি* : ২৯৭; *মুসনাদু আবি ইয়ালা* : ৫১০৩, ৫১৪০; *মুসনাদুল বাযযার* : ১৭৭৭, ১৭৮২; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩২৪০৭; *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ২৫৯১, ৩৩৩৬; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি : ১০০৫৮, ১০৩৩৭, ১০৩৩৮

ঈমান-কুফর সীমান্ত

আট-দশ হাজার বছর কিংবা তারও আগে। এশিয়া মাইনর (তুর্কি মুলুক ও আশপাশ) থেকে আর্যরা (Aryans) দেশত্যাগ করে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। কারণ নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। দুর্ভিক্ষ, অন্তর্কলহ, দুর্যোগ সবই লিস্টে আছে। পুরাণগুলোর (mythology) চরিত্রগুলোর মাঝে দারুণ মিল প্রমাণ করেন, এগুলোর উৎস কমন। নর্ডিক পুরাণে দেবরাজ থর, গ্রিক পুরাণে দেবরাজ জিউস (রোমানে জুপিটার), হিন্দু পুরাণে দেবরাজ ইন্দ্র সবাই শাস্তি দেন বজ্রনিক্ষেপ করে ইত্যাদি। সংস্কৃত-গ্রিক ভাষার মধ্যেও আছে দারুণ সব মিল। আদি আর্যরা ছিল প্যাগান, শক্তির উপাসক, প্রকৃতিপূজারি। আগুন-পানি-বাতাস-বজ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করত। ধীরে ধীরে শক্তিগুলোকেই মানবরূপে পূজা শুরু হয়। আগুনের দেবতা, পানির দেবতা, বাতাসের দেবতা।

তো আর্যদের একটা অংশ চলে এলো বর্তমান ইরানে। ভাষা নৃতত্ত্বে এসবের আলোচনাগুলো খুব ইন্টারেস্টিং, যেন চোখের সামনে ভাসে। ইরানি আর্যদের একটা অংশ চলে আসে ভারতে, সিন্ধু এলাকায়। এজন্য প্রাচীন পারসি 'যেন্দ' ভাষা আর সংস্কৃত ভাষার মধ্যেও প্রচুর মিল, ধর্মীয় টার্মগুলোতেও। যেন্দ Yasna আর সংস্কৃত Yajna (যজ্ঞ) হিন্দুদের ধর্মানুষ্ঠান, এমন আরো আছে। আর্যরা যেসময় শক্তির পূজা করত মানবরূপ ছাড়া, সেসময় ভারতে বসবাসরত ভূমিপুত্র ছিল অস্ট্রালয়েড দ্রাবিড়রা। আর্যরা ছিল ককেশীয়, ফর্সা, খাড়া নাক। আর্যরাও ভূমিপুত্র নয়। পয়েন্ট রাইখেন। তো, দ্রাবিড়ীয়রা স্থানীয় দেবদেবীর পূজা করত, মানবাকারে (রক্ষাকালী, শ্মশানকালী)। দেখাদেখি আর্যরা এসে কালে কালে তাদের উপাস্য শক্তিগুলোকে মানবরূপে পূজা আরম্ভ করে।
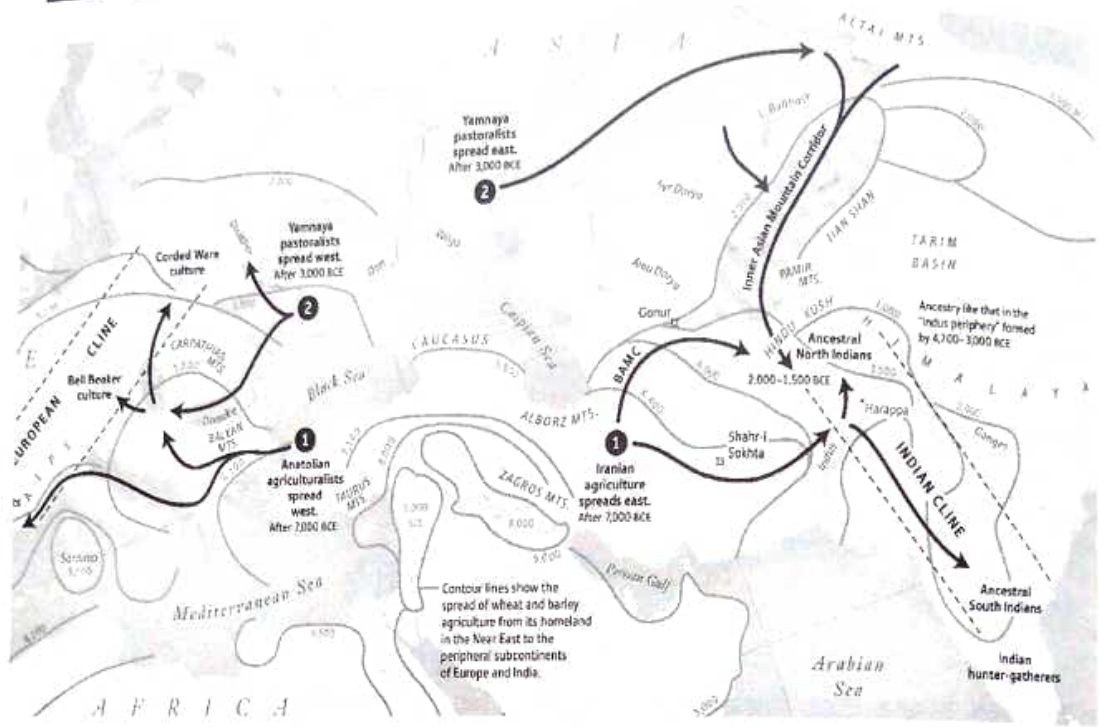
চিত্র : আর্যদের মাইগ্রেশন

প্রাচীন দুনিয়ায় এই সিন্ধুনদ ছিল ভারতের ল্যান্ডমার্ক। নদীটা দিয়েই এলাকা চিনত বাকি দুনিয়া। পারসি আর্যরা চিনত তাদের জ্ঞাতিগুষ্টি কোথায় থাকে? সিন্ধ এলাকায়। প্রাচীন ফার্সিতে সিন্ধকে বলা হতো 'হিন্দ'। সেই কানেকশনে সেমিটিক জাতিরাও বলত হিন্দ। ল্যান্ডমার্কের সুবাদে পুরো ভারতবর্ষই পরিচিত ছিল হিন্দ নামে। আরবরাও বলত হিন্দ। পুরো দুনিয়াই এই ভারতবাসীকে ডাকত হিন্দি বা হিন্দু। যদিও ধর্মবিশ্বাসে কেউ আর্য, কেউ দ্রাবিড় প্যাগান, কেউ বৌদ্ধ। একটা ভৌগোলিক পরিচয়। যেমনটা কেউ চিটাগাইঙ্গা বা সিলোটি বা বইঙ্গা, ধর্ম-নির্বিশেষে। পরবর্তী সময়ে আলেক্সান্ডার থেকে নিয়ে মুসলিমরা—যত বহিরাগত এসেছে, সবাই ভারতীয়দের হিন্দু নামেই চিনেছে এবং এইসব যবন-ম্লেচ্ছ (অপরিচিত, বিদেশি)-দের বিপরীতে ভারতবাসীরাও নিজেদের 'হিন্দু' বলে জেনেছে। তুমি ম্লেচ্ছ, আমি হিন্দু। আমি বেদ-বিশ্বাসীই হই, আর বৌদ্ধই হই, আর তামিল প্যাগানই হই, তোমার বিপরীতে আমি হিন্দু।

সুতরাং, **হিন্দু ধর্ম যতটা না ধর্মবিশ্বাস, তার চেয়ে বেশি জাতীয়তাবাদ। এটা একক ধর্ম নয়, অনেক ধর্মের সমষ্টি, একই ভূমির সূত্রে।** নির্দিষ্ট কোনো বিশ্বাসকেন্দ্রিক নয়। বিচিত্র আকিদার সমন্বয়ে এক প্রাকৃতিক জাতীয়তা। তোমার বিশ্বাস যা-ই হোক, এ অঞ্চলে তোমার জন্ম মানে তুমি হিন্দু। সে তুমি শৈব হও (শিবপূজা),

শাক্ত হও (কালীপূজা), বৈষ্ণব হও (বিষ্ণুপূজা), গাণপত্য হও (গণেশপূজা), ব্রাহ্ম হও (নিরাকার ব্রহ্মপূজা), প্রেতপূজারি তান্ত্রিক হও, আর নাস্তিক কম্যুনিস্টই হও—কিচ্ছু যায় আসে না। এক দেবতার পূজকরা আবার নিজেদের এলাকায় অন্য দেবতার পুজো হতে দেবে না। আসামে, উত্তরপ্রদেশে দুর্গাপূজা হতে দেয় না। এমনকি প্যাগান দ্রাবিড়দের বহু দেবদেবীর অর্চনাও হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে বা ছিল। শ্মশানকালী, রক্ষাকালী প্রভৃতি নামে বহু অনার্য দেবীর বেদীতে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত প্রাচীন প্যাগান অনার্য রীতি মোতাবেক নরবলিও হতো। এমনকি বুদ্ধকেও আত্মীকরণ করে নিয়েছে হিন্দুধর্ম বিষ্ণুর 'বুদ্ধাবতার' হিসেবে। সে হিসেবে বৌদ্ধরাও হিন্দু, যেহেতু বিষ্ণুরই উপাসনা করে। এতদাঞ্চলে পূজিত সব দেবদেবীকে আত্মস্থ করে নিয়েছে হিন্দুধর্ম। তোমার আকিদা যাই হোক, তুমি হিন্দু। ব্যাপারটা আরো গোছানো স্পষ্টরূপ ধারণ করে সাভারকার-এর 'হিন্দুত্ব' কনসেপ্টে, যার ভিত্তিতে ভারতে 'হিন্দুরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার কথা বলা হচ্ছে।

এবার দেখুন খ্রিস্টধর্ম। খ্রিস্টান মিশনারি Don Richardson-এর বেস্টসেলার Eternity in Their Hearts বইটা পড়ার সুযোগ হলো। বইটিতে খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের একটা হিকমাহ উঠে এসেছে প্রায় প্রতিটি সেকশনেই। যখন সেন্ট পল এথেন্সে গেলেন, ভরা মূর্তিপূজার মধ্যে মূর্তিহীন খ্রিস্টবাদের দাওয়াহর একটা হিকমাহ অবলম্বন করলেন। গ্রিকদের সব মূর্তিপূজার অতলে একজন দেবতার খোঁজ পেলেন তিনি, নাম তার 'অচিন ঈশ্বর' (Agnosto Theo)। মূর্তিবিহীন এই দেবতাকে গ্রিকরা শেষ ডেকেছিল ৬০০ বছর আগে, এক মহামারির সময়, সব পূজোআচ্চা যখন ফেইল, তখন। অন্যান্য দেবদেবীদের জন্য তারা সেসময় Theo শব্দটা ইউজ করত না। জেনোফেন, প্লেটো, এরিস্টটল তাদের লেখায় 'থিও' ব্যবহার করতেন 'সর্বোচ্চ খোদা'র পার্সোনাল নাম হিসেবে। সেন্টপল এভাবে তাদেরকে দাওয়াহ দিলো : আমরা এই Agnosto Theo'র লোক। এরপর বাইবেল প্রচার করল তাদের কাছে। বোঝালো 'মাইনষের চে দেবতার সংখ্যা বেশি' তোমাদের দেশে আমরা আরেকটা নয়া দেবতা আমদানি করছি না; বরং আমরা তোমাদের অমুক বিস্মৃত চিফ দেবতার লোক। একই হিকমাহ তারা সাঁওতালদের কাছেও করেছে, গিয়ে বলেছে আমরা ঠাকুর জিউয়ের লোক, ফিরে এসো আদি ঠাকুর জিউয়ের ইবাদতে, বিশ্বাস করো ক্রুশে, তার আত্মাহুতিতে। বিভিন্ন এলাকায় লোকাল ধর্মে সৃষ্টিকর্তার যে নাম, যীশুকে তার পুত্র হিসেবে দেখিয়ে 'ক্রুশবিদ্ধকরণ ও আদিপাপের প্রায়শ্চিত্ত' আকিদায় এনেছে তারা।

খ্রিস্টধর্মটাও এমনই। বাংলাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুসলিমদের মাঝেও একই কাজ করছে তারা। পাক্কা খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলা তাদের উদ্দেশ্য নয়, সব শামসুলকে স্যামসন বানানো জরুরি নয়। 'ঈসায়ি মুসলিম' বানানো গেলেই চলবে। এই কৌশলেই তারা মুসলিমদের সব পরিভাষা ব্যবহার করে—আল্লাহ-রাসুল-জান্নাত-শরিয়তের সব পরিভাষা। ঈসা আলাইহিস সালামের পুনরাগমনের আকিদাকে কাজে লাগায়। শুধু এটুকু বিশ্বাস করানোই তাদের উদ্দেশ্য, ঈসা ইবনুল্লাহ (আল্লাহর পুত্র) দুনিয়াতে এসে সকল মানুষের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন নিজেকে ক্রুশে আত্মাহুতি দিয়ে, আর খোদার পুত্র ঈসাই খোদা, তিন খোদা মিলে এক খোদা। এটুকু বিশ্বাস করে নেন, মেনে নেন। এরপর আপনি আর কী করলেন, সালাত পড়লেন নাকি হজ করলেন। নাকি কুরআন হিফয করলেন। নাম বদলালেন, নাকি মতিউর রহমানই থাকলেন বা আব্দুল ওয়াদুদই থাকলেন। এগুলো কোনো বিষয় নয়। আপনি ভাবছেন, আপনি 'ঈসায়ি মুসলিম', মূলত আপনি তখন কাফির।

যে কারণে কথাগুলো বললাম। ইসলাম এমন নয়। যার যা বিশ্বাস-আকিদা সবকিছুকে ইসলাম ধারণ করবে, মুসলিম বলে ছাপ্পড় মেরে দেবে, ব্যাপারটা এমন নয়। কাদিয়ানিদের কাফির ঘোষণা নিয়ে এক টকশোতে এক বুদ্ধিবিক্রেতা বলেছিলেন—'হিন্দুদের মতো মুসলিমদেরও এক বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য করা উচিত। সুন্নি, কাদিয়ানি, শিয়া, ওয়াহাবি সবাই মিলে বৃহৎ ঐক্য গড়া; হিন্দুদের মতো।' খুব দুঃখের কথা, আজ আরবি নামধারী বাদ দিন, যারা বিভিন্ন দলে-উপদলে ভাগ হয়ে ইসলাম প্র্যাকটিসিং বলে দাবি করছি, আমাদেরই ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক লেভেলেরও ধারণা নেই। শুনতে খারাপ শোনা গেলেও এটাই সত্যি। আরো কষ্টের কথা হলো সম্মানিত আলিমগণও 'ইসলামের সীমানা' আইমিন 'ঈমান-কুফরের সীমান্ত' নিয়ে আলোচনার চেয়ে আরেক গ্রুপের মুণ্ডুপাতকেই জরুরি হিসেবে নিয়েছেন। আমি আগে মনে করতাম, সবাই তো মুসলিমই। শুধু সালাফিরাই ঈমান-কুফর-শিরক-তাওহিদ এগুলা নিয়ে বেশি মাতামাতি করে, কিন্তু আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহিমাহুল্লাহর *ইকফারুল মুলহিদিন* এবং শাহ ইসমাঈল শহিদ রাহিমাহুল্লাহর *তাকবিয়াতুল ঈমান* পড়ার পর আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, বরং হানাফি মত কিছু ক্ষেত্রে ডিমার্কেশনটা আরো স্পষ্ট ও প্রবলভাবে ধারণ করে। তাহলে কেন এর চর্চা নেই, কেন এগুলোর বয়ান নেই? ওযুভঙ্গের বয়ান হচ্ছে, অমুক-তমুকের খণ্ডন হচ্ছে। ঈমানভঙ্গের কারণগুলো এত সুস্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও কেন এগুলো আম পাবলিককে জানানো হবে না? এগুলো তো আম-মুসলিমকে

মুখস্থ করিয়ে দেওয়া উচিত, যেমন ওযু-সালাত ভঙ্গের কারণ মুখস্থ করানো হয়।

'হিন্দু' ধর্ম যেমন স্থানীয় সীমারেখায় পরম্পরাগত আদি প্রথা-পার্বণ-দর্শন-আচারভিত্তিক, আকিদা যা-ই হোক। **ইসলাম হলো উলটোটা। সম্পূর্ণ আকিদাভিত্তিক, জাতি-বর্ণ-স্থান-কাল যা-ই হোক। যেকোনো জাতিসত্তা, যেকোনো বর্ণের, যেকোনো স্থানের, যেকোনো যুগের যেকেউ যদি নির্দিষ্ট কিছু আকিদা বা বিশ্বাস ধারণ করে, সেগুলোর সামনে নিজেকে সমর্পণ করে এবং মান্য করতে তৈরি হয়ে যায়, সে মুসলিম। এই আকিদা আংশিক নয়, পুরোটাই মেনে নিতে হবে।** এর একটা অংশও অস্বীকার করা আর পুরোটা অস্বীকার করা সমান। যে কেউ, যদি এই পুরো আকিদা প্যাকেজটা না নেয়, বা কিছু বাদ দেয়, কিছুতে দ্বিমত করে; ইসলাম তাকে কনটেইন করে না। স্পষ্ট শব্দে তাকে পরিত্যাগ করে। **ইসলামের ভেতরে হিন্দুধর্মের মতো বিশ্বাসগত বা ঈমানগত বৈচিত্র্যের সুযোগ নেই।** একদম প্রান্তিক ব্যাখ্যা লেভেলে গিয়ে থাকলেও মূল কাণ্ড এক হতেই হবে। নচেৎ জন্মগত মুসলিমকেও ইসলাম সশব্দে ঘোষণা দিয়ে ত্যাজ্য করে। প্রত্যেক আরবি নামধারীই মুসলিম নয়, এমনকি প্রত্যেক নামাযিও মুসলিম নয়! যেমন ধরুন, কেউ যদি মনে করে, ইসলাম সত্য না-ও হতে পারে। বা আল্লাহর দ্বীন প্রচার হবার যেমন অধিকার আছে, আল্লাহকে অস্বীকার করার ব্যাপারটাও প্রচার হওয়া উচিত। আল্লাহর দ্বীন হিসেবে ইসলাম আলাদা আবার কী? সবাই তো নিজেরটাকে সত্যই বলে থাকে। এমন আকিদাধারী যদি হাজি-নামাযিও হয়। সে আর মুসলিম নেই, কুফরের সীমা পেরিয়ে চলে গেছে। নতুন করে তাকে শাহাদাহ পাঠ করে ঈমান আনতে হবে।

মুসলিম-কাফির এগুলো শারয়ি পরিভাষা (legal terms)। বংশানুক্রম উত্তরাধিকার না। কাফির-মুনাফিক-মুলহিদ-যিন্দিক এগুলো গালাগাল নয়। এগুলো সবগুলোই শারয়ি পরিভাষা। এগুলোর সংজ্ঞা রয়েছে, শর্ত রয়েছে, এগুলোর ওপর আলাদা বিধান রয়েছে। মুসলিম না কাফির তার ওপর ভিত্তি করে বৈষয়িক সিদ্ধান্ত নিতে হয় ইসলামি আদালতকে। একজন মানুষ মুসলিম না কাফির তার ওপর নির্ভর করবে...

» সে কেমন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্ট্যাটাস পাবে
» সে মুসলিম পিতার সম্পত্তি পাবে কি না
» সে মুসলিম নারীকে বিয়ে করতে পারবে কি না বা বিয়ে বৈধ রয়েছে কি না।
» ইসলামি আইন তার ওপর কার্যকর করা হবে কি না।

এসব আইন প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন পড়ে একজন মানুষ 'মুসলিম' নাকি 'কাফির', তা নির্ধারণের। সুতরাং,, এটা কেবল অন্তরের বিষয় নয়। **'ডোন্ট জাজ মি' বা 'অনলি গড উইল জাজ মি' বা 'ডোন্ট বি জাজমেন্টাল'—এসব রোমান্টিক যুগের ছ্যাবলামির সুযোগ ইসলামে নেই। ইসলাম জাজমেন্টাল, একজন মানুষ 'মুমিন' না 'কাফির' সেটা অবশ্যই জাজ করতে হবে।** আপনার মুসলিম বোনকে একজন আরবি নামের কাফিরের সাথে আপনি বিয়ে দিতে পারেন না, আপনাকে জাজ করতে হবে। আপনি চাইলেই সুন্দরী বা প্রতিষ্ঠিত পাত্র-পাত্রীকে বিয়ে করতে পারেন না 'মুসলিম' সাব্যস্ত না করে। সে বিয়ে বাতিল এবং যিনার গুনাহ হবে, যার ভাগীদার আপনারা সবাই। বর বা কনে 'মুসলিম' কি না, আপনারা খতিয়ে দেখেননি। আপনার নাস্তিক ছেলে আপনার সম্পত্তি পাবে না। যদি আপনি দেন, বা আপনি ত্যাজ্য করে না যান আর সে পেয়ে যায়, তাহলে তাকে হিসেব থেকে বাদ দিলে আপনার আরেক ছেলে বা মেয়ের আরেকটু বেশি পাবার কথা ছিল, আপনি জালিম হিসেবে আল্লাহর কাছে জবাব দেবেন। ঈমান-কুফর কেবল মনের বিষয় নয়, মুখেরও বিষয়, কর্মে প্রমাণেরও বিষয়। আমরা সংজ্ঞাগুলো জেনে নিই, যাতে আলোচনাটা আরো সহজ লাগে।

প্রকার	অর্থ	উদাহরণ
শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের 'পাঁচ আয়াত' থেকে		
কুফর আল-ইনকার	আল্লাহকে অস্বীকার	নাস্তিক
কুফর আল-জুহুদ	আল্লাহকে স্বীকার করে, কিন্তু মানতে অস্বীকার করে	ইবলিস বা আহলে কিতাব
কুফর আল-ইনাদ	আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু আত্মসমর্পণ করতে চায় না। অহংকার বা শত্রুতাবশত এই বিশ্বাসের কাছে সমর্পণ করতে চায় না	আবু জাহল ও সমমনা
কুফর আন-নিফাক	মুখে ইসলাম স্বীকার করে, কিন্তু অন্তরে মানে না। কেবল নিফাক ছাড়া বাকি সবগুলোই ডিটেক্ট করা যায়।	

শাহ আব্দুল আযিয দেহলভি রাহিমাহুল্লাহর মতেও কুফর ৪ প্রকার		
কুফরু জাহল	নবিজি আনীত বিষয়াবলিকে মিথ্যা মনে করা, এই বিশ্বাস নিয়ে যে নবিজি মিথ্যাবাদী।	আবু জাহল ও মক্কার মুশরিকরা
কুফরু ইনাদ ও জুহুদ	নবিজি সত্য, এটা জানা সত্ত্বেও জিদ ও বিদ্বেষের দরুন অস্বীকার	ইহুদি, খ্রিস্টান
কুফরে শক	নবিজি নবি কি না, এ ব্যাপারে সন্দেহ থেকে অস্বীকার	মুনাফিকরা
কুফরু তাবিল	নবিজির কথার এমন উদ্দেশ্য নেওয়া, যা তার উদ্দেশ্য নয়	কাররামিয়ারা আল্লাহ অর্থ নিত শাসক

ইমাম তাফতাযানির সূত্রে *ইকফারুল মুলহিদিন* থেকে, কাফির ৭ প্রকার	
মুনাফিক	জবানে মুসলিম, ভেতরে কাফির
মুরতাদ	আগে মুসলিম ছিল, এখন কাফির
মুশরিক	একাধিক উপাস্য
কিতাবি	অন্য আসমানি গ্রন্থের অনুসারী
দাহরিয়া	দুনিয়াকে অনাদি ও অনন্ত মনে করে।
মুআত্তিল	নাস্তিক। স্রষ্টা থাকাকে অস্বীকার।
যিন্দিক	নিজেকে মুসলিম দাবিও করে, অকাট্য কুফরও বিশ্বাস করে। (বাতেনি বা মুলহিদও বলা হয়)

বংশগত কাফির আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা দেখব, **শারয়িভাবে একজন মুসলিম কখন কাফির হয়ে যায়; সতর্ক থাকার জন্য**। *ইকফারুল মুলহিদিন* কিতাবে মূলত মুলহিদ/যিন্দিক, যে নিজেকে বারংবার মুসলিম দাবি করছে, অথচ লিগ্যালি সে কাফির তার কোনো বিশ্বাসের দরুন, এই গ্রুপটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মানে ৭ নং। একটু প্রশ্নোত্তরের সুরতে গেলে সহজ হবে।

আচ্ছা, একজন নামাযি পরহেজগার লোক কি কাফির হতে পারে?

উত্তর : জি। যেকোনো কুফরি আকিদা পোষণ করলে, কুফরি কথা বললে, কুফরি কাজ করলে নামাযি বা বাহ্যিক দ্বীনদার লোকও কাফির হবে। চাই সে যতই দ্বীনদার হোক। (পৃষ্ঠা : ২৭৬) নিজেকে কাফির মনে না করলেও সে কাফির। তাকে কাফির সাব্যস্ত করা ওয়াজিব (পৃষ্ঠা : ৭৯)

যদি অজান্তে বলে ফেলে?

উত্তর : এক ব্যক্তি মুখে কুফরি কথা বলেছে, কিন্তু তার খবরই নেই যে এটা বললে মানুষ কাফির হয়ে যায়। সে যা বলেছে স্বেচ্ছায়ই বলেছে। প্ররোচনা বা জবরদস্তি ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মতে এই ব্যক্তি কাফির। অজ্ঞতাকে তার অজুহাত হিসেবে ধরা হবে না। তাহলে বোঝা গেল এগুলো জানার বিকল্প নেই যে, কোন কোন কথা কাজ বা বিশ্বাস কুফর। না জানাটা ওজর নয়। গুটিকয়েক আলিম বলেন, সেটা যে কুফর সেটা ওই ব্যক্তির জানা থাকতে হবে। তারা অজ্ঞতাকে অজুহাত হিসেবে নেন।

কুফরি কথা কী কী?	উদাহরণ
জরুরিয়াতে দ্বীন (দ্বীনের নিশ্চিত ও অকাট্য বিশ্বাস ও বিধান) অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান	মারেফত পেলে সালাত লাগে না
জরুরিয়াতে দ্বীনের এমন উদ্দেশ্য ও অর্থ করা, যা আজ অব্দি উম্মত যা বুঝেছে বা আজ অব্দি যে আমলি রূপ রয়েছে তার বিপরীত	সালাত ২ ওয়াক্ত, বা আহলুল কুরআনদের রুকু-সিজদা ছাড়া সালাত
আল্লাহ ও নবিকে গালি, হেয় করা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, মিথ্যাবাদী বলা। গালিদাতাকে যে কাফির মনে করবে না, সেও কাফির। (পৃষ্ঠা : ১৬০, ১৮৭)	
আল্লাহ-নবি-দ্বীন নিয়ে কটাক্ষ	
আল্লাহ-নবি-দ্বীন নিয়ে হাসি তামাশা। হাসি তামাশার ছলে বললেও কাফির হয়ে যাবে। তার নিয়ত বা আকিদা দেখা হবে না (রদ্দুল মুহতার, ফাতওয়ায়ে খানিয়া, কাযিখান, হিন্দিয়া)	

জরুরিয়াতে দ্বীন কী?

উত্তর : দ্বীনের সেই বিষয়গুলোকে জরুরিয়াতে দ্বীন বলা হয় যেগুলো—

ক) নবিজির আনীত দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত, প্রতিযুগে বহু মানুষ কর্তৃক বর্ণিত ও পালিত (তাওয়াতুর) এবং বহুল প্রসিদ্ধ (মশহুর)। বহুল প্রসিদ্ধ মানে সবাই জানে যে, এটা দ্বীনে রয়েছে। সাধারণ লোকও জানে যে, এটা ইসলামে আছে। [যেমন : আল্লাহ এক লা-শারিক, আমাদের নবি শেষ নবি, পুনরুজ্জীবন, পুরস্কার-শাস্তি, সালাত-যাকাত ফরজ, মদ-সুদ হারাম ইত্যাদি] সব শ্রেণির লোকই জানে। জরুরি না প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে হবে। দ্বীনের সাথে যারা সম্পর্ক রাখে তারা জানলেই মশহুর বলে সাব্যস্ত হবে। যারা দ্বীন নিয়েই বেখবর, তাদের না জানাটা ধর্তব্য নয়। (পৃষ্ঠা : ৩৮)

খ) আম পাবলিক ও খাস লোক যে যে বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত জানে যে, অমুক বিষয়টি নবিজির দ্বীন। ফরজ হুকুমই হতে হবে তা নয়। মুস্তাহাবকে মুস্তাহাব মনে করা ফরজ ও ঈমানের অংশ (*জাওহারুত তাওহিদ*) [যেমন : মিসওয়াক করা মুস্তাহাব, কিন্তু মিসওয়াক যে মুস্তাহাব, এটা বিশ্বাস করা ফরজ। যে ব্যক্তি মিসওয়াক মুস্তাহাব হওয়াকে অস্বীকার করে, সে কাফির] (পৃষ্ঠা : ৪০)

গ) বিষয়টা বিশ্বাস করা ফরজ, তবে ধরনটা যুক্তি-চিন্তার বিষয়। যেমন : কবরের আযাবের হাদিস। তাওয়াতুর ও শুহরতের দরুন বিশ্বাস করা ফরজ, অস্বীকার করলে কাফির, তবে কবরে শাস্তির ধরন কেমন (দেহের ওপর না রুহের ওপর ইত্যাদি) হবে, তা অজানা। ভিন্নমত গর্হিত নয়।

ঘ) **শুধু নবুওয়াত স্বীকার করে নেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। দ্বীনের প্রতিটি হুকুমের ওপর আমলের পণ-প্রতিজ্ঞা জরুরি।** (*ফাতহুল বারি, যাদুল মাআদ*) জরুরিয়াতে দ্বীনের কোনো একটি বিষয় অস্বীকার করলেও কাফির (পৃষ্ঠা : ৪৩)। বিভাজন, হ্রাসবৃদ্ধির সুযোগ নেই।

ঙ) হানাফি মতে, যেকোনো 'কাতয়ি' নিশ্চিত বিশ্বাস বা বিধান অস্বীকার করাই কুফর। জরুরিয়াতে দ্বীন না হলেও (ইবনুল হুমাম ও আল্লামা শামি সূত্রে পৃষ্ঠা : ৪৮)। কাতয়ি মানে হলো এমন স্বতঃস্পষ্ট বিষয়, যা সব শ্রেণির মানুষই বুঝতে পারে। দলিল টানাটানি করতে হয় না।

চ) হানাফি মতে, যে বিষয়ে সাহাবিদের **ইজমা (ঐকমত্য) হয়েছে, তা অস্বীকার করাও কুফর।** ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহও বলেছেন, তা মান্য করা ফরজ। পৃষ্ঠা : ৭১

ছ) হানাফি মতে, যে বিষয়টা অস্বীকার করল, সেটা যে দ্বীনের অকাট্য বিষয়, এটুকু ওই ব্যক্তির জানা থাকতে হবে। আরেকজন যদি জানিয়ে দেয়, এরপরও অস্বীকার করে, তবে কাফির বলা হবে।

জ) **অকাট্য দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হারামকে হালাল মনে করলে কাফির হবে।** যেমন : মদ ও শুকর। ইদানীং সুদের মতো অকাট্য বিষয়কে মুনাফা নাম দিয়ে হালাল করা হচ্ছে। (*রদ্দুল মুহতার* সূত্রে পৃষ্ঠা : ১৪৮)

তাওয়াতুর বা ধারাবাহিকতা

যারা হাদিস নিয়ে ঘাঁটেন বা দ্বীনি বইপত্রের সাথে সম্পর্ক রাখেন, তারা 'মুতাওয়াতির' শব্দটা চেনেন। হাদিসের একটা ক্যাটাগরি হিসেবে চিনি আমরা। **যে হাদিস প্রতি জেনারেশনে এত বেশিসংখ্যক রাবি (বর্ণনাকারী) পৃথক পৃথক সূত্রে উল্লেখ করেছেন, যাদের পক্ষে একত্রিত হয়ে বানোয়াট কিছুকে সত্য বলে চালানো অসম্ভব।** প্রতি জেনারেশনেই বহুসংখ্যক মানুষ আলাদা আলাদা করে একই হাদিস Pass করেছেন পরবর্তী প্রজন্মের বহুসংখ্যক মানুষের কাছে। এই হাদিসগুলো শক্তিশালী অকাট্য হাদিস। কারণ—ধরুন, মক্কায় ১০ জন, বাগদাদে ১০ জন, আন্দালুসে ১০ জন, বুখারায় ১০ জন ভিন্ন ভিন্ন চেইনে একটাই কথা শুনেছেন এবং বলেছেন। সে কথা মিথ্যা হবার সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি। প্রতিযুগে নির্ভরযোগ্য শ্রোতা ও বর্ণনাকারীদের এই সংখ্যাধিক্যমূলক Continuity-কে বলা হয় 'তাওয়াতুর', আর হাদিসটিকে বলা হয় 'মুতাওয়াতির'। সহিহ বুখারির ব্যাখ্যাকার আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহিমাহুল্লাহ তার *ইকফারুল মুলহিদিন* (বঙ্গানুবাদ : ওরা কাফির কেন?) কিতাবে তিন প্রকার তাওয়াতুর উল্লেখ করেছেন।

১. তাওয়াতুরে সনদ :

হাদিসের ক্ষেত্রে কেবল যেটা আলোচনা করলাম। সনদ মানে 'বর্ণনা চেইন'। যেমন ধরুন : নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস, যে আমার ব্যাপারে নিজ

থেকে মিথ্যা বলবে, তার স্থান হবে জাহান্নাম।[১] ৩০ জন সাহাবি এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মানে পয়লা যুগেই ৩০ জনা। এই তথ্যও এসেছে, ১০০ বা ২০০ জন সাহাবি প্রথম যুগে এই হাদিস বলেছেন। তাদের মুখ থেকে পরের যুগে অসংখ্য ব্যক্তি, এরপর তাদের থেকে আবার অসংখ্য এভাবে প্রতিযুগে কত মানুষ এই একটা কথা শুনেছেন ও বলেছেন? তার মানে এটা যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখেরই কথা এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকে আর? এই হাদিসটি মুতাওয়াতিরের একটা উদাহরণ।

২. তাওয়াতুরে তবকা :

কোনো যুগের লোকজন আগের যুগের লোকজন থেকে কোনো রিওয়ায়াত, আকিদা বা আমল অব্যাহতভাবে শুনতে থাকলে এবং শোনাতে থাকলে তাকে 'তাওয়াতুরে তবকা' বলে। এর উদাহরণ হলো—কুরআনে কারিম। মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া, তানজানিয়া থেকে তাতারিস্তান প্রতিযুগে লক্ষ মানুষ তার আগের জেনারেশনের লক্ষ লোক থেকে কুরআন শিখেছে, পড়েছে, পড়িয়েছে, হিফয করেছে করিয়েছে, বর্ণনা করেছে। প্রতিযুগে লক্ষ-হাজার-শত মানুষ। এভাবে যুগ ধরে চলে যান, শেষ

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ১০৬, ১০৭, ১১০, ১২৯১, ৩৪৬১, ৬১৯৭; *সহিহ মুসলিম* : ৩, ৪, ৩০০৪; *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৬৫১; *জামি তিরমিযি* : ২২৫৭, ২৬৫৯, ২৬৬০, ২৬৬১, ২৬৬৯, ২৯৫১, ৩৭১৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৭; *মুসনাদু আহমাদ* : ৩২৬, ৫৮৪, ১০৭৫, ১৪১৩, ১৪২৮, ২৬৭৫, ২৯৭৪, ৩০২৪, ৩৬৯৪, ৩৮০১, ৩৮১৪, ৩৮৪৭, ৪১৫৬, ৪৩৩৮, ৬৪৮৬, ৬৫৯২, ৬৮৮৮, ৭০০৬, ৯৩১৬, ৯৩৫০, ১০০৫৫, ১০৭২৮, ১১০৯২, ১১৩৪৪, ১১৩৫০, ১১৪০৪, ১১৪২৪, ১১৫৩৬, ১১৯৪৪, ১২১১০, ১২১৫৪, ১২৭০২, ১২৭৬৪, ১২৮০০, ১৩১০০, ১৩১৮৯, ১৩৩৩২, ১৩৯৬১, ১৩৯৭০, ১৩৯৮০, ১৪২৫৫, ১৫৪৮২, ১৬৫০৬, ১৬৯১৬, ১৭৪৩১, ১৭৭৯০, ১৮১৪০, ১৮২০২, ১৯২৬৬, ২২৫০১, ২৩৪৯৭; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ২৫৮, ৩৮০, ৫১৪১, ৫২২২, ৭৮১৯, ; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ৫৬১৯, ৬১১৩, ৭১৬৯, ৭১৭০, ২০৯৯৩; *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ৪০৮৪, ৫৮৮০, ৫৮৮১, ৫৮৮৩, ৫৮৮৪; *মুসতাখরাজু আবি আওয়ানা* : ২২, ৩৩, ৩৫, ৩৮, ৫৮, ৬১, ৬৫, ৬৬, ৬৯; *সুনানুদ দারিমি* : ২৩৭, ২৩৮, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৪, ৫৫৯, ৬১৩; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৩১,, ১০৫২, ২৫৫৫, ৪৮০৪, ৫৪৩৬, ৬২৫৬; *মুসনাদু আবি দাউদ তায়ালিসি* : ৩৪০, ৩৬০, ২১৯৭, ২৫৪৩; *মুসনাদু আবি ইয়ালা* : ৭৩, ২৫৯, ২৬০, ৪৯৬, ৫৮৮, ৬৩১, ৬৬৭, ৬৭৪, ৯৬৬, ১২০৯, ১২২৯, ১৪৩৬, ১৬৩৬, ১৭৫১, ১৮৪৭, ১৯৫২, ২৩৩৮, ২৭২১, ২৯০৯, ৩১৪৭, ৩৭১৬, ৩৯০৪, ৪০০১, ৪০২৫, ৪০৬১, ৪০৭০, ৪০৭৬, ৪০৭৭, ৫২৫১, ৫৩০৭, ৬৮৬৮; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ২৬২৩৮, ২৬২৩৯, ২৬২৪১, ২৬২৪২, ২৬২৪৩, ২৬২৪৭, ২৬২৪৮, ২৬২৫০, ২৬২৫১, ২৬২৫২, ২৬২৫৩, ২৬২৫৪, ২৬২৫৫; *মুসান্নাফু আব্দির রাযযাক* : ১০১৫৭, ১৯২১০; *জামিউ মামার ইবনু রাশিদ* : ২০৪৯৩, ২০৪৯৪, ২০৪৯৫; *মুসনাদু ইসহাক ইবনি রাহওয়াই* : ২৬৪; *মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার* : ১৪২, ১৪৩। -হাদিসটি মুতাওয়াতির

অব্দি সাহাবি হয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে গিয়ে ঠেকবে। **সাব্যস্ত করতে হাদিসের মতো স্বতন্ত্র কোনো সনদের প্রয়োজন পড়বে না, সূত্রপরম্পরায় নির্দিষ্ট কোনো রাবিদের নাম নেওয়া লাগে না।**

এক আহলে কুরআন-কে ইনবক্সে প্রশ্ন করেছিলাম, হাসিদ মানবেন না, ঠিক আছে। যে কুরআন মানবেন, সেই কুরআন যে প্রামাণ্য এবং আল্লাহর বাণী এ কথা কে বলে দিলো আপনাকে? হ্যাঁ, তার প্রমাণ এই তাওয়াতুর। অনেক ভাই বলে, কুরআন মানব, হাদিস মানব না। কেন? **যেই সূত্রে আপনি কুরআন পেয়েছেন, সেই সূত্রে তো হাদিসও পেয়েছেন।** বলে কিনা, হাদিস নবিজির জন্মের ২০০ বছর পর নাকি সংকলিত। মূর্খতার সীমা নেই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জীবদ্দশাতেই শেষ দিকে হাদিস লেখার অনুমতি দিয়েছেন। যখন কুরআনের বর্ণনাশৈলী ও হাদিসের ভাষা সুস্পষ্টভাবে সাহাবিরা বুঝে গেছেন, আর মিশে যাবার কোনো চান্স নেই, তখন। বহু সাহাবির নিজস্ব হাদিসের ডায়েরি ছিল, যারা লেখাপড়া জানতেন। সেই হাদিসগুলোই তাওয়াতুরের মাধ্যমে পরের জেনারেশনে pass হয়েছে। *সহিহ বুখারি*কেই বেচারারা প্রথম হাদিসের কিতাব ভেবে রেখেছে।

৩. তাওয়াতুরে আমল বা তাওয়াররুস :

প্রত্যেক যুগে বহুসংখ্যক মানুষ দ্বীনের যেসব বিষয় আমল করেছে নবি-সাহাবিযুগ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে, মাঝে কোথাও গিয়ে হারিয়ে যায়নি কিংবা নবিযুগ থেকে খবর নেই, হঠাৎ ৫০০ বছর পর এসে কোনো আমল চালু হয়েছে, এমন নয়। মানে নবিযুগ থেকে প্রতিযুগে বহু মানুষ আমলটি করে এসেছে। এইসব বিষয় ও তার হুকুম আহকামও মুতাওয়াতির। যেমন ধরুন : ওযু, মিসওয়াক, কুলি, নাকে পানি, জামাআতে সালাত। নবিজির জীবদ্দশায় সোয়া লক্ষ সাহাবি। লক্ষ সাহাবি তাদের সন্তানকে ওযু শিখিয়েছেন, প্রতিযুগে লক্ষ-কোটি বাবা তাদের সন্তানকে ওযু শিখিয়েছেন। এখন কেউ যদি এসে বলে, ওযু দরকার নেই, সাহাবিরা খেতখামারে কাজ করতেন তাই ওযু করতেন, এসিরুমে যারা থাকে তাদের ওযু লাগে না। নগদে এই লোক কাফির হয়ে যাবে, চাই হাজি-গাজি যা-ই হোক।

মূল আলোচনা শেষ। এখন তিনটে পয়েন্ট আলোচনা থেকে—

- দ্বীনের কিছু বিধানের মধ্যে ৩ প্রকারের তাওয়াতুরই আছে। যেমন : ওযুতে মিসওয়াক করা, কুলি করা, নাকে পানি। এর হাদিসও মুতাওয়াতির, বিষয়টাও

মুতাওয়াতির, প্র্যাকটিক্যালি কাজটাও মুতাওয়াতির।

- অনেক ভাই তাওয়াতুরের সংজ্ঞা না জানায় মনে করেন, মুতাওয়াতির হাদিস ও বিষয়ের সংখ্যা বোধ হয় খুব কম। না ভাই, বরং **আমাদের শরিয়তে মুতাওয়াতির বিধানের সংখ্যা এত বেশি যার তালিকা করতে মানুষ ব্যর্থ। অধিকাংশ বিধানই তিন প্রকার তাওয়াতুরের কোনো এক প্রকারে অবশ্যই পড়বে। সুবহানাল্লাহ।**

- বহু হাদিস ও হুকুম এমন আছে, আমরা সেটা মুতাওয়াতির হবার খবরই জানি না (যেকোনো এক প্রকার)। পরে দেখা যায় সেটা কোনো না কোনো প্রকার মুতাওয়াতির।

সুতরাং, **হুট করে কোনো সুন্নাহ বা হাদিস অস্বীকার করা যাবে না। কারণ ওই জিনিস যদি আসলেই মুতাওয়াতির হয়ে থাকে, তবে জেনে রাখুন : মুতাওয়াতির সুন্নাহ অস্বীকার করা কুফর**। নাসিহা নিই, সতর্ক হই। এখানে সুর ফাতওয়ার না, নসিহার।

» সালাত পড়া ফরজ, একে ফরজ জানাও ফরজ, শেখাও ফরজ। ফরজ বলে বিশ্বাস না করা কুফর। সালাত সম্পর্কে মূর্খ থাকাও কুফর।

» মিসওয়াক করা নবির সুন্নাত, এর ওপর আমল করাও সুন্নত, কিন্তু মিসওয়াককে সুন্নত বলে বিশ্বাস করাটা আবার ফরজ। সুন্নত বলে অস্বীকার করাটা কুফর। অর্থাৎ, মুতাওয়াতির সুন্নাতকে সুন্নাত মনে না করা কুফর।[১]

[১] *ওরা কাফির কেন?* আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রাহিমাহুল্লাহ, পৃষ্ঠা : ৪৫-৪৭ অবলম্বনে।

কুরআন-ভাবনা[১]

সেদিনের কথোপকথন

– নিশ্চয়ই আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন কাফিরদের এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং পাবে না কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী। যেদিন আগুনে উলটেপালটে দেওয়া হবে তাদের চেহারাগুলো, **সেদিন তারা বলবে : হায়! যদি আল্লাহকে মানতাম, যদি রাসুলকে মানতাম।**

– **তারা আরো বলবে : হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের (সিনিয়রদের) আনুগত্য করেছিলাম আর ওরাই আমাদেরকে ভুলপথে নিয়েছে। হে আমাদের রব, ওদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন। আর দিন মহা-অভিসম্পাত।**[২]

– জালিম (সীমালঙ্ঘনকারী) সেদিন নিজের দুহাত কামড়াতে কামড়াতে **বলতে থাকবে : ইশ, আমি যদি রাসুলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম। হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধু না বানাতাম! সে তো আমাকে ভুলপথে নিয়েছিল, আমার কাছে উপদেশ আসার পরও।** আর শয়তান তো

---

[১] এখানে আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথনের ভাষায় ভাবানুবাদ করা হয়েছে, যাতে আমরা আমাদের জীবনের সাথে মিলিয়ে বুঝতে পারি। মূল অনুবাদ দেখতে সংশ্লিষ্ট আয়াত দেখুন।

[২]সুরা আহযাব, আয়াত : ৬৪-৬৮

মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।[১]

- আল্লাহ উত্তর দেবেন : দ্বিগুণ শাস্তি তো প্রত্যেকের জন্য আছে, কিন্তু তোমরাই তো জানো না।[২]

- আর তাদের পূর্ববর্তী দল (আগের জেনারেশন) পরবর্তী দলকে (পরের জেনারেশনকে) বলবে (মানে নেতারা অনুসারীদেরকে) : আমাদের ওপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই (তোমরাও এমন কোনো সাধু নও)। কাজেই এখন তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করো।[৩]

তিন প্রকার মানুষ

সুরা বাকারা ১-১৫ আয়াতগুলো পড়তে পড়তে মনে হলো, সুবহানাল্লাহ, এখানে তো পুরো মানবজাতিকে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন আল্লাহ। আজকের সময়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কুরআনের একদম প্রথম দিকের এই কটা আয়াত।

সুরা ফাতিহা

পুরো সুরাটাই একটা দুআ। আল্লাহর কাছে আমরা প্রতি রাকআতে এই দুআটা করি। এ দুআতে গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস চাই। কিছু চাইবার আগে প্রথমে দেনেওয়ালার প্রশংসা করি। দুনিয়াতেও করি কিন্তু আমরা। মহান রব এটা পছন্দ করেন, তাই কিছু চাইবার আগে আমরা তাঁর প্রশংসা করি। এভাবে বলি—

> ১. *প্রশংসার (যত ধরন হতে পারে) সবটুকু আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের 'পালনকারী অধিকর্তা'।*
>
> ২. *অসীম দয়ালু (রহমান), পরম করুণাময় (রহিম)।*
>
> ৩. *বিচার দিবসের একচ্ছত্র কর্তৃত্বধারী*

[১] সুরা ফুরকান, আয়াত : ২৭-২৯
[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ৩৮
[৩] সুরা আরাফ, আয়াত : ৩৯

মহান রবের প্রশংসার পর তাঁর কাছে আমাদের দুটি কাজের বিবরণ দিচ্ছি। নিজেদের দাসত্ব ও মুখাপেক্ষিতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিচ্ছি; যেন তিনি খুশি হন, আমাদের দুআ কবুল করেন, আমাদের চাওয়া পূরণ করেন—

> *৪. আমরা দাসত্ব করি একমাত্র আপনারই এবং একমাত্র আপনার কাছেই সাহায্য চাই*

প্রশংসা হলো, নিজের দুর্বলতা ও নিরঙ্কুশ আনুগত্যও প্রকাশ করা হলো। এবার তাঁর কাছে চাওয়া হচ্ছে—

> *৫. আমাদেরকে হিদায়াত দিন সরল পথের*
>
> *৬. ওই পথের, যে পথে চলেছেন আপনার নিয়ামত-প্রাপ্তগণ*
>
> *৭. সেই পথ নয়, যে পথ আপনার ক্রোধে পতিতদের, আর ওই পথও নয় যা পথভ্রষ্টদের। (আমিন)*

দুআ শেষ। এবার জবাবের পালা। এই দুআর জবাবটাই বাকি কুরআন। আমরা সরল-সোজা পথের হিদায়াত (খোঁজ, দিশা) চেয়েছিলাম। আল্লাহ বলছেন—

সুরা বাকারা

> *১. আলিফ-লাম-মীম*
>
> *২. এটিই সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটিই হিদায়াত (পথের দিশা) মুত্তাকিদের জন্য।*

আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা কবুল করেছেন। হিদায়াত চেয়েছিলাম, সিরাতুল মুস্তাকিম চেয়েছিলাম, সরল পথের খোঁজ চেয়েছিলাম। আল্লাহ দিশা দিচ্ছেন। **এই কিতাবটিই সেই অবিচল সরল পথের ম্যাপ। কাঙ্ক্ষিত পথনির্দেশ, কিন্তু সবার জন্য নয়। কাদের জন্য? মুত্তাকিদের জন্য। আল্লাহ-সচেতনদের জন্য।** যাদের স্রষ্টানুভূতি আছে, তারা বুঝতে পারবে এই ম্যাপ। সবাই নয়। তারা কারা? তারা ১ম গ্রুপ—

> *৩. যারা অদৃশ্য বিষয়াবলিতে বিশ্বাস করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যে রিজিক-রসদ তাদের দিয়েছি তা থেকে খরচ (দান) করে।*

> *৪. যারা আপনার ওপর এবং আপনার পূর্ববর্তীদের ওপর যা নাযিল করা হয়েছে তা বিশ্বাস করে। আর আখিরাতের প্রতি যারা দৃঢ়বিশ্বাসী।*
>
> *৫. তারাই রবের নির্দেশিত হিদায়াতের ওপর রয়েছে এবং তারাই সফল।*

এরা হচ্ছে প্রথম প্রকার মানুষ। যারা নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনীত সকল অদৃশ্যের খবর বিশ্বাস করে। আগেও আল্লাহ বিধান পাঠিয়েছেন—এটা বিশ্বাস করে। পরকালে বিশ্বাস করে। নিজের জীবনে, পরিবারে, সমাজে ও দেশে সালাত বাস্তবায়নের চেষ্টা-মেহনত করে। যাকাত দেয় এবং সাধ্যমতো দান-খয়রাত করে। এরা প্রথম গ্রুপ, যারা সঠিক দিশাপ্রাপ্ত। এই মহাসত্য কিতাব এদেরই জন্য। সফলতা এদেরই প্রাপ্য।

এবার ২য় গ্রুপ...

> *৬. যারা (ওপরের বিষয়গুলো) অস্বীকার করেছে, আপনি তাদের সতর্ক করেন আর না করেন; তাদের জন্য সবই সমান (তাদের কিচ্ছু যায়-আসে না)। তারা বিশ্বাস করবেই না।*
>
> *৭. (যেহেতু তাদের কোনো গা নেই পরকাল, আল্লাহ ইত্যাদির ব্যাপারে) আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোয় সিলগালা করে দিয়েছেন, কানগুলোতেও। চোখগুলোর ওপর ফেলে দিয়েছেন পর্দা, আর তাদের জন্য আছে কঠোর আযাব।*

চিল্লা থেকে এসে আমি সামনাসামনি আমার এক হিন্দু রুমমেটকে দাওয়াত দিয়েছি। খুব জিগরি সম্পর্ক ছিল। সে কান খাড়া করে আমার প্রতিটি কথা শুনল। আমার দাওয়াহর শেষটা ছিল : দোস্ত, তুই মেধাবী ছেলে। সত্য চিনতে তোর সময় লাগবে না। তুই শুধু নিজের ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা কর। আর ইসলাম নিয়ে পড়। আমি তোকে সব ম্যাটেরিয়াল প্রোভাইড করছি। সে আমাকে উত্তর দিয়েছিল কী জানেন? উত্তর দিয়েছিল : দোস্ত, আমি এখন এসব নিয়ে ভাবছি না। এখন আমার প্রচুর টাকা চাই। প্রচুর টাকা। এটা ছাড়া আমি আর কিছু ভাবছি না।

আমার ছোটভাইয়ের এক হিন্দু ফ্রেন্ড একবার আমার বাসায় এসেছিল। ভাই থেকে শুনলাম, সে নিজ ধর্মে অনাগ্রহী, মুসলিমদের প্রতি ঝোঁক আছে। দাওয়াহ করলাম। একটা বই দিলাম। সে নিলো না। বলল : ভাই, আমি পাঠ্যবই-ই পড়ি অতিকষ্টে। বই পড়তে আমার ভয়ানক আলসেমি লাগে। আমাকে দিয়েন না। এছাড়া কোনটা

সত্য-মিথ্যা, এসব নিয়ে ভাবার সময়ও এই মুহূর্তে আমার নেই।

এবার ওপরের দুটো আয়াত নিয়ে ভাবুন। তারা চাচ্ছেই না এখন মৃত্যু নিয়ে ভাবতে, মৃত্যুপরবর্তী জীবন নিয়ে ভাবতে। এই জীবন যে 'এক খেলায় এক দান', তারা এটাকে পাত্তাই দিচ্ছে না। মৃত্যুর পরে কিছু আছে কি না, এগুলো নিয়ে ভাবার সময়ই নেই তাদের। কিচ্ছু আসে-যায় না। যাচাই করার ইচ্ছেটুকুও নেই। কেন?

পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে।[১]

দুনিয়ার চাকচিক্য ভোগ তাদের চোখের সামনে পর্দা হয়ে আছে। আসল বাস্তবতা কী, আদি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ইচ্ছেটুকুও নেই। বহু মুসলিমও আছে এমন। যুবক, বয়স কম। যেন কোনোদিন মরতে হবে না। ধর্ম, মৃত্যু, জীবনের উদ্দেশ্য, কে আমি, কেন এলাম, কোথায় যাব। এগুলো তাদের লিস্টেই নেই। বন্ধু-আড্ডা-গান-রেস্টুরেন্ট-প্রেম-ক্যারিয়ার ছাড়া জীবনে কিছুই ভাবার সময় নেই। যদিও এরা এই গ্রুপে নয়, তবে খাসলত-বৈশিষ্ট্য এদের মতোই।

এজন্য আল্লাহ বলছেন : তাদের অন্তরে-কানে মোহর আঁটা।[২] অন্যত্র আল্লাহ বলছেন : অন্তর থাকলেও তারা ভাবে না, ভাবার সময় নেই। কান আছে শোনে না, চোখ আছে কিন্তু মেলে দেখতে রাজি নয়।[৩] দুনিয়ার মিথ্যা স্বপ্নে বিভোর থাকতে চায়। **জোর করে চোখ এঁটে রাখে যেন এই মিথ্যা স্বপ্ন না ভাঙে।** তাদের এই অনিচ্ছা, অনীহা, পাত্তা না দেওয়ার দরুন আল্লাহ সিল করে দিয়েছেন।

এবার ৩য় গ্রুপ।
বর্তমান অস্থির সময়ে, এই প্রেক্ষাপটে এই গ্রুপটা আমাদের বুঝতে হবে, চিনতে হবে।

> *৮. মানুষজনের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা বলে আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি, আখিরাতে বিশ্বাস করি, কিন্তু তারা মোটেই 'মুমিন' নয়।*

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ৫১
[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ৭
[৩] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৭৯

অর্থাৎ আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও অনেকে কিংবা বিশ্বাসের দাবিকারী অনেকে 'বিশ্বাসী' নয়। প্রত্যেক মুমিন দাবিকারীই মুমিন নয়। তারা কী করে?

৯. তারা ধোঁকা দিতে চায় আল্লাহকে ও ঈমানদারদেরকে। কিন্তু মূলত ধোঁকা তারা নিজেকেই দেয়, অথচ তারা টের পায় না।

১০. তাদের অন্তর/বুঝশক্তি হলো অসুস্থ, আল্লাহ আরো বাড়িয়ে দেন সে রোগ। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, এই মিথ্যাচারের (এই ধোঁকাবাজির) দরুন।

১১. যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা দুনিয়াটাকে নষ্ট কোরো না (বিশৃঙ্খলা কোরো না)। তারা বলে, (আরে বলো কি!) আমরাই তো 'সংস্কারক'।

১২. কক্ষনো নয়, ওরাই সেই বিশৃঙ্খলাকারী, কিন্তু ওরা টের পায় না।

১৩. যখন ওদের বলা হয়, লোকেরা (১ম গ্রুপ) যেভাবে ঈমান এনেছে সেভাবে ঈমান আনো। তারা বলে, আমরা কী বোকাদের মতো (মূর্খ পশ্চাৎপদ মোল্লাদের মতো) ঈমান আনব? সাবধান, বরং ওরাই বোকা, কিন্তু ওরা সেটা জানেই না।

১৪. যখন ওরা ঈমানওয়ালাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে : আমরা (তোমাদের মতোই) বিশ্বাস করি। আবার তাদের শয়তানগুলোর (২য় গ্রুপ, কাফির) সাথে গোপন সাক্ষাতে বলে : আমরা তো তোমাদের সাথেই, ওদের (মুমিনদের) সাথে তো কেবল মশকরা করি।

১৫. বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন, তাদের উদ্ভ্রান্ত সীমালঙ্ঘনে ছাড় দিয়ে রেখে।

১৬. এরাই তারা, যারা (হিদায়াত পেয়েও) হিদায়াতের বদলে ভ্রষ্টতা কিনেছে। না তারা তাদের এই ব্যবসায় জিতল, আর না পেল হিদায়াত।

এবার প্রতিটি আয়াতকে আজকের যুগে সেট করুন। আল্লাহ জানাচ্ছেন মুসলিমদের মধ্যেই একদল মুসলিম আসলে মুসলিম নয়। তারা মুসলিমদের কাছে এলে বলে, আমরা মুসলিম, কুরআন পড়ি, তাহাজ্জুদও পড়ি, আরো কত কিছু পড়ি। কুরআন-বিরোধী কিচ্ছু করব না; কিন্তু যখন কাফির-মুশরিকদের সাথে মিটিং করে, তখন বলে : আরে, অমন একটু বলতে হয়। কথার কথা জনগণকে বলে

বুঝ দিতে হয়। ওদের সাথে একটু তামাশা করলাম। আসলে তো আমরা তোমাদের সাথেই, তোমরা যা বলবে তাই করব। তোমাদের সব স্বার্থ রক্ষা করব। আল্লাহ এদেরকে সহসাই ধরেন না, ছাড় দেন। প্রচুর ছাড় দেন। এদের শান-শওকত, ক্ষমতা, জুলুমের মেয়াদ, হায়াত আরো বাড়িয়ে দেন। যাতে তারা সীমালঙ্ঘনের চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যায়। এরপর ফিরআউনের মতো হঠাৎ করে ধরেন, যখন তাওবার সুযোগটাও থাকে না।

তাদেরকে যদি বলা হয় : তোমরা ১ম গ্রুপের মতো করে ঈমান আনো। পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে ফেলো। কুরআন বাস্তবায়ন করো। তখন তারা বলে : বোকা মূর্খ পশ্চাৎপদ মোল্লাদের মতো ঈমান আনব? মধ্যযুগীয় আইন-কানুন এখন চলে নাকি? যত্তসব মান্ধাতার আমলের চিন্তাভাবনা! আধুনিক হোন, বুঝলেন? অসাম্প্রদায়িক হোন।

যখন বলা হয়, তোমরা আল্লাহর দুনিয়ার শৃঙ্খলা নষ্ট কোরো না। এমন কাজ কোরো না, যাতে তাঁর ব্যবস্থাপনার ভেতর ভারসাম্য নষ্ট হয়। সৃষ্টজগতের শান্তি নষ্ট কোরো না। তারা বলে, আরে আমরাই তো শান্তি বজায় রাখি। সংস্কার করি। নারীমুক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন করি। ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে দারিদ্র্যবিমোচন করি। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করি। টীকা দিই। স্কুলে যৌনশিক্ষা দিই। সন্ত্রাস দমন করি। ভালো সব কাজ তো আমরাই করি। আমেরিকার জেনারেল বলেছিল: উই আর দ্য মুজাডিন (সন্ত্রাসী তালেবানদের আমরা দমন করছি, আমরাই মুজাহিদ)। আল্লাহ বলছেন, কক্ষনো নয়, তারাই আমার সৃষ্টিজগতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র সব শেষ করে দিচ্ছে। আল্লাহ যেখানে যে বিধান রেখে সিস্টেমটা ব্যালেন্স করেছিলেন, সেটাকে তারা নষ্ট করে দিচ্ছে। পুরুষকে বাইরে, নারীকে ঘরে দিয়ে পরিবার-প্রজন্ম ব্যালেন্স করেছিলেন। শেষ। যাকাত, গনিমতকে গরিবের হাতে ব্যাক করে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করেছিলেন, সব শেষ। ধনী হচ্ছে আরো ধনী, গরিব হচ্ছে আরো গরিব। হুদুদ আইন (শারিয়া নির্ধারিত শাস্তি) দিয়ে সমাজের অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। তাও শেষ। অপরাধী জেলে বসে খায়, বের হয়ে আবার অপরাধ করে। এভাবে সবখানে আল্লাহ ব্যালেন্স করে বানিয়ে, সেটা ঠিক রাখার বিধান দিয়ে দিয়েছিলেন। সব তছনছ করে তারা বলছে, আমরাই তো সব ঠিকঠাক করছি, আধুনিক করছি। ধোঁকা কাকে দিচ্ছ? আল্লাহকে? কঠোর আযাবের অপেক্ষায় থাকো।

সমস্যা হলো, এভাবে লিখে ভেঙে ভেঙে একদিন কেউ বলবে না। সবগুলো কণ্ঠ রোধ করে দেওয়া হবে। আপসকামী, 'আল্লাহর আয়াতকে বিসর্জন দিয়ে দুনিয়া ক্রয়কারী', 'আল্লাহর আয়াত গোপনকারী', 'কিছু মানি কিছু মানি না', 'আয়াত বিকৃতকারী', 'আল্লাহর বিধানের বেলায় কুরআন পশ্চাতে নিক্ষেপকারী'-দের একদিন আমরা আলিম হিসেবে জানব। তাদের সেইসব তাফসির ছাড়া আর কিছু থাকবে না। তাদের ছাড়া অন্যদের ওয়াজ করতে দেওয়া হবে না।

সেদিন আপনাকে একা ডুব দিতে হবে কুরআনে। আজকের মতো অনিশ্চিত এক সময়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইয়াতিম উম্মাতকে কুরআন কী করতে বলেছে, সেটা একমাত্র কুরআনই তখন আপনাকে বলবে। মেহেরবানি করে আরবি শেখাকে কম গুরুত্বপূর্ণ ভাববেন না। হক আলিমগণের লেখাজোখা এখনো পাওয়া যাচ্ছে। তারা এখনো রয়েছেন। দ্বীন শেখার এটাই শেষ সুযোগ, কুরআন শেখার। যতটুকু পারেন শিখে নেন আর ডুব দেন কুরআনে। আমরা যেন হককে হক হিসেবে, বাতিলকে বাতিল হিসেবে চিনতে পারি এবং বেশি বেশি আমল করতে পারি, আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফিক দান করুন।

আর কোনো কথা নেই। ধীরে ধীরে সব আওয়াজ থেমে যাবে। আর কোনো শব্দ, কোনো নাসিহা, কোনো লেখা থাকবে না। ভেঙে খুলে বুঝিয়ে দেওয়ার কেউ থাকবে না। তখন কুরআন আপনার সাথে কথা বলবে। সব মুখ বন্ধ করে দিলেও কুরআনের মুখ আটকে রাখার সাধ্য কারো নেই। কুরআন খুলুন। তরজমা নিন, শর্ট তাফসির নিন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতিটি আয়াতকে মেলান। এখন এই ১৪০০ বছর পর এক অস্থির সময়ে কুরআন আপনাকে কী বলতে চায় দেখেন।

সুরা ফীল অবলম্বনে

> *১. আপনি দেখেননি? আপনার রব কী অবস্থা করেছেন হাতিওয়ালা (বাহিনী)-দের?*
>
> *২. তিনি কি নস্যাৎ করে ছাড়েননি তাদের পরিকল্পনা?*
>
> *৩. আর তিনি তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়ে দিলেন।*
>
> *৪. যারা তাদের ওপর পোড়ামাটির প্রস্তর বর্ষণ করল।*

> *৫. ফলে তিনি তাদেরকে (গবাদিপশুর) চিবানো খড়ের মতো (ধ্বংস) করে দিলেন।*

আবরাহা চেয়েছিল, সবাই বাইতুল্লাহ রেখে বাইতুল আবরাহায় (আল-কালিস গির্জা) আসুক তাওয়াফ করতে, ভক্তি করতে। **আজও যদি কেউ চায় কিতাবুল্লাহ রেখে সবাই আমাদের রচিত পবিত্র কিতাবের (!) আনুগত্য করুক। যদি কেউ আল্লাহর দ্বীন, আল্লাহ-ওয়ালা, আল্লাহর কিতাব, আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত কিছুর বিরুদ্ধে লাগে। হোক সে আধুনিকতম ভয়ালদর্শন সব অস্ত্রধারী (সে যুগে হাতি)। হোক সে সুনিপুণ পরিকল্পনাকারী, তার গোয়েন্দা, তার টেকনোলজি যত উন্নত হোক, আল্লাহ তা ভন্ডুল করে দেবেন।** কী দিয়ে? **সামান্য জিনিস দিয়ে। যাকে তারা চিন্তায়ও আনেনি। তখনকার পাখি, এখনকার অন্যকিছু। হয়তো আরো ছোট, হয়তো এত ছোট, যে দেখাই যায় না।** আল্লাহ অবশ্যই তাদের ধ্বংস করবেন। এমনভাবে করবেন, নিজের অবস্থা দেখে তাদের নিজেরই করুণা হবে, এত অপমানের সাথে, যেভাবে চারাগাছকে গরু এসে চিবিয়ে মুড়িয়ে রেখে যায়।

এভাবে বর্তমানের সাথে মিলিয়ে পড়ুন। আরবি শিখুন। এত কিছু শিখেছেন এক জীবনে, আরবিটা শিখে ফেলুন। মূর্খ লোকও আরবদেশে ২ মাস থাকলে শিখে ফেলে, আপনি শিক্ষিত হয়ে কেন পারবেন না? কুরআনে না ফিরলে আর কেউ একদিন থাকবে না, যে আপনাকে আল্লাহর ফরজ হুকুমের কথা শোনাবে।

সুরা কুরাইশ অবলম্বনে

> *১. যেহেতু কুরাইশদের একটা টান রয়েছে*
>
> *২. শীত-গ্রীষ্মে (নির্বিশেষে সারাবছরই) ভ্রমণের প্রতি একটা আসক্তি আছে (যেগুলোতে আবার রয়েছে বিপদের ভয়)*
>
> *৩. সুতরাং,, তারা দাসত্ব করুক এই গৃহের (কাবা) পালনকারী অধিকর্তার*
>
> *৪. যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং বিপদের ভয়ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ রেখেছেন।*

আজকের দিনে এই সুরার অর্থ কী? ১৪০০ বছর আগে কার কী অভ্যেস, এসব গল্প আল্লাহ আমাদের কেন শোনাচ্ছেন? তাতে আমার কী? আজ এখন বসে এই

আয়াতগুলো দিয়ে কুরআন আমাকে কী বলতে চায়?

দাওয়াতের কাজে বের হলে, মানুষকে যখন বলা হয়, ভাই আসেন মসজিদে। দুটো দ্বীনের কথা হচ্ছে, সবার শোনা দরকার। কে জানে, একটা কথায় আমাদের হিদায়াত হতে পারে। কাস্টমারবিহীন দোকানে গ্যাঁট মেরে বসে থাকা অনেকের কাছেই শুনতে হয় : ভাই, খালি সালাত পড়লে কি আল্লাহ ঘরে এসে খাবার দিয়ে যাবেন?—এ জাতীয় কথা। **আমাদের সকল সমস্যার সমাধান দ্বীন মানার মধ্যে। হয়তো চোখে দেখছি না, কিন্তু আমার রিজিক বণ্টন করেন আল্লাহ।**

রিজিক মানে জীবনোপকরণ, জীবনে যা কিছু লাগে সবই রিজিক। এই সুরায় যেহেতু ক্ষুধায় খাওয়ানোর কথা এসেছে। তাই আজ রিজিকের এক ছোট্ট অংশ 'খাদ্য' নিয়ে কথা বলি। আমরা কামাই করি, টাকা হাতে করে বাজার পর্যন্ত যাই, বেছে তাজা-ভালো-টাটকা জিনিসটা কিনি, পুরোটা নিয়ে বাসা অব্দি আসি, বউ-ঝিরা সেটা রান্না করে লবণ-তৈল-জিরা, গুঁড়ামরিচ সহযোগে, ধোঁয়া-ওঠা খাদ্য সামনে আসে, চপচপ করে রুচি সহকারে সাঁটানো হয়, ভাতঘুম পায়, হজম চলে, পাচকরস তরল সরল করে। প্রয়োজনীয়টুকু গায়গতরে লাগে, অপাচ্য অংশটা মলদ্বার দিয়ে বহিষ্কৃত হয়, যাতে আপনি আরো খেতে পারেন। এই পুরো বিষয়টা 'খাদ্য'-সম্পর্কিত। **পুরো বিষয়টা ফাইন টিউনিং না হলে আপনার রিজিক থেকে খাদ্য স্থগিত হয়ে যায়। প্রতিটি স্টেজে যদি সঠিক ক্লিক না হয়, ব্যাটে-বলে না হয়, আপনার কাঙ্ক্ষিত রিজিক আপনার কপালে নেই।**

ভেঙে বলি। ধরেন সারাদিন সালাত বাদ দিয়ে দোকানে বসে খুব কামালেন। যদিও আমার পকেট থেকে আপনার পকেটে এক টাকা যাবে কি না, এটা আল্লাহ ঠিক করবেন। একই টাইম দোকান খোলা, প্রতিদিন সমান কাস্টমার আসে না।

» কতজন আমার দোকানে আসবে, আর কতজন পাশের দোকান থেকে সদাই নেবে, এটা কে ঠিক করেন? আল্লাহ।

» দিনের কামাই পকেটে পুরে বাসা পর্যন্ত আসতে পারা বা মানিব্যাগ সহিসালামতে থাকা, এটা কে ঠিক করেন?

» বেগুনের ভেতরে পোকা না থাকা, সতেজ-ভালো পণ্যটা ব্যাগে পুরতে পারা এটা কে নিশ্চিত করবেন?

» ভুলে কোনোটা দোকানেই রেখে এলেন না, এটা কে ঠিক করবেন?

» বউয়ের হাতে নুন-মরিচ-জিরা একটু বেশি-কম পড়বে না, এটা কে ঠিক করেন?

» আমার জ্বরে মুখ তেতো নেই, টনসিলে গলা ব্যথা নেই, গ্যাসে পেট ফেঁপে নেই, রুচি ঠিক যে আছে, এটা কে নিশ্চিত করেন?

» ডাক্তার সাহেব যে আমার খাদ্যের স্বাধীনতা হরণ করেননি এখনো, এই সুস্থতা কে দেবেন?

» আজ সকালে যে বাথরুম হয়ে পেটে জায়গা ফ্রি হলো, এটা কে নিশ্চিত করবেন? যদি কয়েকদিন হাগু না হতো, রুচতো মুখে পোলাও-গোশ?

আল্লাহর হুকুম নষ্ট করে কেবল কামাই করার নামই রিজিক নয়। সব রিজিক আল্লাহ থেকেই আসে। আর-রাজ্জাক ছাড়া আর কে আছেন যিনি এই 'ফাইন টিউনিং' করে বান্দাকে তৃপ্ত করবেন? আলহামদুলিল্লাহ।

কুরাইশদের আল্লাহ সম্বোধন করেছেন। হে কুরাইশ! বিরান মরুর বুকে থাকো তোমরা। মদিনার মতো ফল হয় না, সবজি হয় না। উট-ছাগলে শুকনো পাথর চাটে। কে খাওয়ায় তোমাদের? শীত নেই গরম নেই, সারাটা বছর টইটই করে মরুর বুকে ঘোরো, এ-দেশ ও-দেশ সফর করো। পানি নেই, বিপদাপদ, কত কিছু। কে নিরাপত্তা দেয় তোমাদের? আমি এই কাবা গৃহের রব। অতএব, ইট-পাথর-খেয়ালখুশি সব বাদ দিয়ে আমার ইবাদত করো।

এক আল্লাহর দাসত্বে ফিরে গেলে আল্লাহ আমাদের জীবনকেও টেনশন-ফ্রি করে দেবেন।

» ক্যারিয়ার-ট্রেন্ড-ফ্যাশন-'লোকে কী বলবে'-খেয়ালখুশি-মানবরচিত বিধিব্যবস্থা সবকিছুর বিপরীতে এক আল্লাহর গোলামিতে ফিরে গেলে মানবতা মুক্তি পাবে।

» পুঁজিবাদের লালসা মেটাতে ইয়েমেন-আফ্রিকায় লাখ লাখ আদমসন্তানের 'না-খেয়ে-মরা' ঠেকাবে অর্থনীতিতে এক আল্লাহর দাসত্ব।

» হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টে লক্ষ লক্ষ ফাইলবন্দি মামলা, ঘুরে বেড়ায় দাগি আসামি, ফাঁসির আসামি ক্ষমা পেয়ে আবার করে খুন, ধর্ষণ-ছিনতাই-চুরি। বিচারব্যবস্থায় এক আল্লাহর দাসত্বে ফিরে গেলে প্রতিষ্ঠা পাবে নিরাপত্তা।

» অফিসে অফিসে দুর্নীতি, বাজারে ধোঁকাবাজি সব শেষ হবে যদি বিচার ও শিক্ষাব্যবস্থায় ফিরে আসে এক আল্লাহর দাসত্ব।

» পরিবার ও সমাজের সব অস্থিরতা দূর হয়ে যাবে যদি পরিবার ও সমাজের কেন্দ্র হয় আল্লাহর আদেশকে কেন্দ্রে রেখে, এক আল্লাহর দাসত্বকে মূলে রেখে।

» ব্যক্তি-ব্যবস্থায় (self-management) আল্লাহর দাসত্বে ফিরে গেলে মিলবে 'চ্যান-সুকুন-রাহাত', প্রশান্তি-সুস্বাস্থ্য-সম্মান।

আবার পড়ুন সুরা কুরাইশ। দেখুন তো, কী বলছেন আল্লাহ আপনাকে?

সুরা লাহাব অবলম্বনে

> ১. *ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হাতদুটো এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও*
>
> ২. *কোনো কাজেই এলো না তার ধনদৌলত ও উপার্জন।*
>
> ৩. *শীঘ্রই সে প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে*
>
> ৪. *এবং তার স্ত্রীও, বহন করবে জ্বালানি*
>
> ৫. *গলায় খেজুর-পাতার-রশি পেঁচিয়ে*

১৪০০ বছর আগে মক্কার এক মুশরিক, যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিত, তার ব্যাপারে আল্লাহর ধমকি ও পরিণতি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ১৪০০ বছর পরে এখন এই সুরার ইউটিলিটি কী? 'ইসলামের শত্রু এই দম্পতির ব্যাপারে আল্লাহর অভিশাপ'—কেন আমি পড়ছি?

আবু লাহাব আমাদের নবিজির আপন চাচা। আপন মানে আব্দুল মুত্তালিবের আরেক স্ত্রীর ছেলে। বাপ এক হলে সেটাকে আপনই বলা হয়। এই সুরা যখন নাযিল হচ্ছে, তখনো আবু লাহাব সস্ত্রীক বেঁচে। এমনকি এই সুরা নাযিলের পর ১২ বছর সে জীবিত। এটা কুরআনের একটা মুজিযা। কুরআন আল্লাহর তরফ থেকে আসার একটি প্রমাণ। খুব সহজ একটা কাজ ছিল কুরআনকে এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভুল প্রমাণ করা। আবু লাহাব এই ১২ বছর সময় পেয়েছিল কুরআন ও নবিজিকে মিথ্যা প্রমাণের। জাস্ট ইসলাম গ্রহণ করলেই এই সুরা মিথ্যা হতো, কিন্তু ১২ বছরেও তার হিদায়াত না হওয়াটাই প্রমাণ করে এই অভিশাপ,

এই কুরআন এমন এক সত্তা থেকে এসেছে যিনি ভবিষ্যৎ জানেন, যিনি হিদায়াত কন্ট্রোল করেন। আবু লাহাবের পরিণতিই তার প্রমাণ।

আবু লাহাব সম্পর্কে একটু না জানলে সুরাটা বর্তমান সমাজের সাথে মেলানো কষ্ট হবে। নবিজির এই চাচা নবিজিকে খুব আদর করত। জন্ম হবার পর ভাতিজার জন্মের সুখবর যে দাসী দিয়েছিল (সুওয়াইবা, নবিজির একজন দুধমা), খুশির চোটে তাকে মুক্ত করে দিয়েছিল আবু লাহাব। ইয়াতিম ভাতিজাকে অত্যন্ত মহব্বত করত। কিন্তু ঠিক যে মুহূর্তে নবিজি ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, সেই মুহূর্তে সে পরিণত হলো ভয়াবহ শত্রুতে। সাফা পাহাড়ের পাদদেশে নবিজি দাঁড়ালেন। সবাইকে ডাকলেন 'ইয়া সাবাহা'—সাবধান! সকাল বেলায় বিপদ! মানে ডাকটা সাইরেন টাইপ আরকি। সবাই জড়ো হলো।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি যদি তোমাদের খবর দিই যে, পাহাড়ের পিছে এক বাহিনী তোমাদের আক্রমণ করার জন্য রেডি। তোমরা বিশ্বাস করবে? (মানে, দুনিয়াবি কোনো ক্ষতি ও বিপদের খবর দিলে মানবে?)

সকলে বলল, আমরা তো কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি। (মানে কেন বিশ্বাস করব না? ৪০ বছর আপনি আমাদের মাঝে আছেন, কখনো তো মিথ্যা বলেননি যে, এখন বিশ্বাস করব না?)

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে শোনো... তিনি তাওহিদের দাওয়াত দিলেন। সব অসাড় উপাস্য ত্যাগ করে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে ডাকলেন। দুনিয়াবি বিষয়ে যে আমাকে সত্য মানলে, সেই আমিই তোমাদের বলছি, শুধু আল্লাহর গোলামিতে না এলে মৃত্যুর পর ভয়ংকর পরিণতি অপেক্ষা করছে। না দেখে পাহাড়ের ওপাশের বাহিনীর কথা কেবল আমার মুখে শুনে বিশ্বাস করতে তোমরা প্রস্তুত, তাহলে মৃত্যুর পরের কথা আমি বলছি, সেটা কেন বিশ্বাস করছ না?

একটু আগেই যারা তাকে সত্য বলে সাক্ষ্য দিলো, এক সেকেন্ডের মাথায় তারাই নগদে পল্টি দিয়ে দিলো। আবু লাহাব একমুষ্টি মাটি ছুড়ে দিয়ে বলল : তোমার ধ্বংস হোক, এই বাজে কথা বলার জন্য আমাদেরকে ডেকেছ। বাজার-ঘাটে আমরা ব্যস্ত আছি, এখন এই ফালতু কথা পাড়ার জন্য ডাকলে তুমি? আমাদের কী কাজকাম নেই?

নবিজি অত্যন্ত কষ্ট পেলেন, কল্পনা করুন। যে চাচা আপনাকে এত ভালোবেসেছেন, তার ভালোর জন্য আপনি অত্যন্ত জরুরি একটা কথা বললেন, আর তিনি এমন রিঅ্যাক্ট করলেন, আপনার অন্তরই ভেঙে গেল। নিজের চাচারই এমন প্রতিক্রিয়া! প্রিয় হাবিবকে আল্লাহ সান্ত্বনা দিয়ে ওহি পাঠালেন : 'ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হাত দুটো এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।' (ও আপনার ধ্বংস কামনা করেছে। প্রিয় নবি আপনি কষ্ট পাবেন না। ধ্বংস তো সে-ই হবে।)[১]

বর্তমানের সাথে মেলান।

- দ্বীন পালন করতে গিয়ে কত বাধা আসে। আপনজনের কাছ থেকে কত বাধা আসে ভাবেন। যখন দাওয়াহ করতে যাবেন, বাধা যেন দশগুণ হয়ে যাবে। প্রিয় মামাটা আর দেখতে পারে না, প্রিয় কাজিনটা দূরে সরে যায়। চাচারা চাচাতো ভাইদের নিষেধ করে দেয়, ওর সাথে মিশবি না। আবু লাহাবের দুই ছেলের সাথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। আবু লাহাব সম্পর্ক ছিন্ন করল, ছেলেদেরকেও বলে দিলো বউ তালাক দিতে।[২] চিন্তা করেন। অথচ আগের জীবনে তারা ছিল সবচেয়ে আপন।

- বহু মুসলিম আছি আমরা, দ্বীনসংক্রান্ত কোনোকিছুকে অদরকারি, 'সময়নষ্ট' মনে করি। অফলাইন দাওয়াহতে গেলে এমনটাই পাবেন আপনি। চায়ের দোকান, ক্যারামের বোর্ডে দাওয়াহ করতে গেলে বহু মুসলিম রিঅ্যাক্ট করেন; যেন কী একটা জরুরি কাজের ভেতর এসে পড়লাম। এই জন্য ডেকেছ আমাদের? মসজিদে আসবেন ভাই—দাওয়াহ দিলে বহু মুসলিমের মুখে শোনা যায় : আমরা কাজের মানুষ, আমাদের অত সময় নেই। মসজিদে আসা, দ্বীনি হালাকা, কুরআন শেখা, সন্তানকে শেখানো। এসব অদরকারি। বহু মুসলিমকে বলতে শুনবেন : আমি বাংলা উচ্চারণ দেখে কুরআন পড়ি, আরবি শেখার কী দরকার? আসল কথা হলো সময় দিতে রাজি

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৪৭৭০, ৪৮০১, ৪৯৭১, ৪৯৭২; *সহিহ মুসলিম* : ২০৭, ২০৮; *জামি তিরমিযি* : ৩৩৬৩; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৬৫৫০; *মুসতাখরাজু আবি আওয়ানা* : ২৬২; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৫৪৪, ২৮০১; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ১৭৭২৫; *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ১০৭৫৩

[২] *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ৪৩৫; *মাজমাউয যাওয়ায়িদ*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৮; *জামউল জাওয়ামি*, খণ্ড : ২৪, পৃষ্ঠা : ৮২; *হায়াতুস সাহাবাহ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩২৮

নয়, দরকার মনে করছে না। এসএসসির পর এক বাবার কাছে গেলাম, ছেলেটাকে তিনদিনের জামাআতে দেন, কিছু শিখুক, বদদ্বীন ছেলে বাবারই বেইজ্জতির কারণ হয়। বাবা বললেন : ছেলেকে ইংলিশ স্পিকিং কোর্সে দেবো, এখন সময় নষ্ট করা যাবে না।

- *নাওয়াকিদুল ঈমান* কিতাবটায় ঈমানভঙ্গের ১০টি কারণ সবার মুখস্থ রাখা দরকার। ১০ নং কারণ : দ্বীন থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, দ্বীন শেখা থেকে ও আমল করা থেকে। ব্যাখ্যায় শাইখ আব্দুর রউফ শাকির বলেন : **দ্বীনের প্রধান প্রধান বিষয় (তাওহিদ, সালাত, যাকাত ইত্যাদি) শেখা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কুফর।** মুসলিম হিসেবে এসব 'লাহাবীয়' খাসলত পরিত্যাগ ও পরিত্যাগের দাওয়াহ করা উচিত।

- আবু লাহাব একটা কাজ করত। মক্কাতে মিনা, যুলমাজায ও মাজান্নাহ বাজারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াতের মেহনত করতেন। একদল লোককে জটলা করে তাওহিদের দাওয়াত দিতেন। এরপর যখন আগে বাড়তেন, তখন ওই জটলায় আবু লাহাব আসত। এসে বলত : মুহাম্মাদ পাগল, যাদুকর, জিনগ্রস্ত, নাউযুবিল্লাহ। আজকেও এমন মানুষ বা মহল আপনি পাবেন। কোনো জাতীয় ইস্যুতে আলিমগণ কুরআন-হাদিসের সিদ্ধান্ত যখন তুলে ধরেন, নাপাক সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আহ্বান করেন; তখন কিছু লোককে আপনি বলতে দেখবেন : হুজুরদের কামই তো বাগড়া দেওয়া, মূর্খ হুজুররা কী বোঝে? হুজুররা প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তি। পশ্চিমা মগজের পুঁজিবাদের গোলাম তৈরির সেক্যুলার শিক্ষার ফাঁদ থেকে মুসলিম নারীদের রক্ষার কথা বললে পরদাদার বয়সি আলিমকে 'তেঁতুল হুজুর' নাম দেওয়া লোকদের আমরা দেখেছি। রাষ্ট্রনীতিতে তাওহিদ প্রতিষ্ঠার আহ্বানকারী নেতাদের হত্যা-গ্রেপ্তার-জুলুম করতে দেখেছি। ঠিক ১৪০০ বছর আগে আবু লাহাব যে কাজটা করত, ঠিক সেটাই। **সেসময় বাজারই ছিল গণমাধ্যম, আর এখনো এদের আপনি দেখবেন গণমাধ্যমে।** ইনশাআল্লাহ তারা ঠিক আবু লাহাবের মতোই ধ্বংস হবে, আবু লাহাবের স্ত্রীর মতোই অপমানের মৃত্যু আর ভয়ংকর পরকাল অপেক্ষা করছে তাদের জন্য।

আবু লাহাব বদরের যুদ্ধে যেতে পারেনি। বদরে পরাজয়ের কঠিন মনঃকষ্ট এবং দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল তার এই দুনিয়ার শাস্তি। **দ্বীনের বিজয় দেখে হিংসায় জ্বলতে**

জ্বলতে মৃত্যু হবে আজকের আবু লাহাবদের, আর তাদের নারী সঙ্গীদের। কুরআনের এক নাম 'আয-যিকর' (রিমাইন্ডার)। কুরআনের প্রতিটি আয়াত আমাদের কিছু স্মরণ করাতে চায়। হয় অতীতের কিছু, নয়তো ভবিষ্যতের কিছু।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, উপদেশ গ্রহণকারী (শিক্ষা নেবার) কেউ আছে কি?[১]

[১] সূরা কমার, আয়াত : ১৭

অসিয়ত

একটু চিন্তা করুন। আজ আমরা তো তাও উম্মাহর বিজয়ের পরশ পাই এদিক-ওদিক থেকে। উপনিবেশ আমলে যেসব দাঈ, আলিম, আম-মুসলিম মারা গিয়েছেন, তারা কী পরিমাণ অতৃপ্তি আর কষ্ট নিয়ে দুনিয়া ছেড়ে গেছেন! আমাদের তো মার খেতে খেতে সয়ে গেছে; ১৯২৪ সালে খিলাফত ধ্বংসের ঠিক পরপর যেসব চিন্তক-আলিম-দ্বীনসচেতন মুসলিম একবুক কষ্ট আর হতাশা নিয়ে দুনিয়ার জীবন শেষ করেছেন। এখন ফিলিস্তিনে যারা আছে তাদের কথা ভাবুন। শরণার্থী শিবিরে জন্ম, সেখানেই বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যু। আমরা তো তাও নানান জায়গায় আশা খুঁজে ফিরি, এমন সময়ও উম্মাহর ওপর দিয়ে গেছে, যখন এক চিলতে আশাও নেই, পরাজয় আর লাঞ্ছনার ঘুটঘুটে অন্ধকার।

এবার এক প্রজন্মের জীবন থেকে চোখ বুজুন, তিন প্রজন্মের জীবনের দিকে একসাথে তাকান, ১০০ বছর। খিলাফত ধ্বংস... মুসলিমদের ওপর কমিউনিস্টদের সীমাহীন নিপীড়ন... কমিউনিজম ধ্বংস... মুসলিমদের ওপর পুঁজিবাদী ১ম বিশ্বের নিপীড়ন-গণহত্যা... পতনের ডাক। এরকম সময় আগেও এসেছে। মোঙ্গাল আগ্রাসনের সময় মনে হচ্ছিল, সব শেষ বুঝি। আল্লাহ মোঙ্গালদেরকে দিয়েই মোঙ্গালদের হারিয়ে দিয়েছেন। চেঙ্গিস খানের ৪-৫ প্রজন্মে গিয়ে সবাই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছে। **আমরা এক জীবন দিয়ে দেখি। আল্লাহর পরিকল্পনা কয়েক প্রজন্ম** নিয়ে। আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন : ইজ্জত ও বিজয় আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনদের।[১]

---

[১] যাবতীয় শক্তি-সম্মান তো কেবল আল্লাহরই, আর তাঁর রাসুলের ও মুমিনদের। [সুরা মুনাফিকুন, আয়াত : ৮]

সেটা আমি দেখেই যাব, এমন কোনো ওয়াদা তো নেই। এজন্য হতাশার কিচ্ছু নেই। জরুরি হলো, আমি উম্মাহর বিজয়ের জন্য কাজ করছি কি না, কিছু করে গেলাম কি না। নাকি চতুষ্পদ জন্তুর মতো খেয়ে-পরে-বাচ্চা জন্ম দিয়ে জীবন কাটিয়ে গেলাম।

বড় হওয়া, জীবিকা খোঁজা, বিয়ে করা, সন্তান পয়দা করা, সেগুলা পেলে বড় করা। এগুলা তো ছাগল-গরু-কুকুরও করে। যা প্রয়োজন, সেটাকে পূরণ করে। আমাদের জীবনের একটা মিশন থাকা উচিত। মিশন কী? দেশসেরা প্রফেসর হব, গুগলে চাকরি পেয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করব, গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রির মালিক হব, নোবেল প্রাইজ পাব—এগুলো মিশন? এ ধরনের আত্ম-স্বীকৃতির (self-appreciation) চাহিদাও চতুষ্পদ প্রাণীর থাকে। চূড়ায় ওঠা, শ্রেষ্ঠ হওয়া, বেস্ট হওয়া এগুলো আদিম চাহিদা, বেসিক নিড মিটে গেলে এরপর 'আলফা মেল' হবার জন্য লড়ে। কুকুর-বিড়াল প্রস্রাব করে করে সীমানা দেয় : হুঁশিয়ার, এটুকু আমার এলাকা। নারীর জন্য লড়ে। আমরা মানুষ এবং মুসলিম। টেস্টোস্টেরোন থেকে উৎসারিত আত্মপ্রসাদ ও প্রতিপত্তির চাহিদা আমাদের মিশন নয়। ওটা তো স্বাভাবিক জান্তব প্রক্রিয়া। **মিশন হলো এমন কিছু, যা আমার দৈনন্দিন প্রয়োজনের বাইরে। আমার নিজ দেহজ চাহিদা ছাড়া মানসিক তাড়না থেকে যা আমরা করি, সেটা আমার মিশন। মুসলিম হিসেবে 'আমি মরার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যাবো' এমন কিছুও আমার নিঃস্বার্থ অতিরিক্ত এই পার্থিব শ্রমের বিষয় হতে পারে না। হয়তো আমার কথা ধরতে পেরেছেন। প্রতিটি মুসলিমের চিরস্থায়ী মিশন থাকা উচিত, যার ফল শেষ হবে না, যেহেতু আমরাও শেষ হব না।** এমন কিছু মিশন হওয়া উচিত, যার সুফল মৃত্যুর পরেও আমাকে উপকার পৌঁছাতে থাকবে। আর সেটা হলো, ইসলামের বিজয়ের জন্য কিছু না কিছু করা।

সেটা যেকোনো কিছু হতে পারে। যে ইমাম সাহেব জুমুআর মুসল্লিদের ওয়াক্তিয়া মুসল্লি বানানোর চেষ্টা করছেন, তিনি উম্মাহর বিজয়ের জন্য কাজ করছেন। যে তাবলিগওয়ালা গ্রামেগঞ্জে দাওয়াহ করছেন, ওয়ায়েজগণ ওয়াজ করছেন, আলিমগণ দারসে আরো আলিম তৈরি করছেন, খানকাহে মাশায়িখগণ মুসলিমকে উত্তম মুসলিম বানানোর চেষ্টা করছেন, ইসলামি রাজনীতিবিদগণ সাংগঠনিক মেহনত করছেন। কৌশল ভুল না ঠিক, সেটা পাশে রেখে এটুকু দেখুন : আমরা সবাই উম্মাহর বিজয়ের জন্য কাজ করছি। মোটাদাগে প্রশস্ত অর্থে আমরা 'জিহাদ' করছি (প্রচেষ্টা চালানো)। যদিও জিহাদের মূল অর্থ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ; যেমন সালাত অর্থ দুআ হলেও আমরা বিশেষ একটা কাজই বুঝি। তো সবার আগে নিজের

মিশন ঠিক করুন। আমি এতটুকু করে যেতে চাই উম্মাহর বিজয়ের জন্য।

ইসলাম একটা দ্বীন, পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থাপনা। ইসলাম একটা worldview দাবি করে। ইসলাম দাবি করে যে, আপনি দুনিয়াকে ইসলামের চশমায় দেখবেন। **ইসলাম একটা স্বতন্ত্র weltanschauung.** বস্তুবাদকে সামনে নিয়ে আপনি সারা দুনিয়া সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ঢেলে সাজাতে পারবেন। পুঁজিবাদ সামনে নিয়ে আপনি ব্যক্তি-সমাজ-জ্ঞান-অর্থ-রাষ্ট্র সবকিছু ঢেলে সংজ্ঞা দিতে পারবেন (এখন যা হচ্ছে আরকি)। ইসলাম সেরকম স্বয়ংসম্পূর্ণ টোটালি কমপ্লিট আলাদা এক worldview. যা নির্ভর করে আধ্যাত্মিকতা ও পারলৌকিক সাফল্যের ওপর। ইসলাম সবকিছুর আলাদা সংজ্ঞা দেয়। **এই বিশ্বচরাচরের প্রতিটা জিনিসের, প্রতিটা চিন্তার। স্বাধীনতা-সমতা-সহাবস্থান-উদারতা-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-শিক্ষা-উন্নতি-প্রগতি-শিল্প-সংস্কৃতি-পুঁজি-অর্থ-সমাজ-রাষ্ট্র-ব্যক্তি-পরিবার-নৈতিকতা। আলাদা কনসেপ্ট দেয়, আলাদা উদ্দেশ্য দেয়। আলাদা চরিত্র দেয়। আলাদা পিকচার দেয়।**

মাওলানা আব্দুর রহিম রাহিমাহুল্লাহ তার *পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি* বইয়ে একটা কথা লিখেছেন : অধিকাংশ মানুষের কোনো দর্শন নাই। এইটাই সেক্যুলারিজম। কোনো দর্শন না থাকা।' **পাশ্চাত্য শিক্ষা মুসলিমদেরকে দর্শনহীন উদ্দেশ্যহীন মিশন-হীন করে দিয়েছে। ৯০% মুসলিমকে আপনি দেখবেন বেসিক নিডের জন্য ২৪ ঘণ্টা কাটাচ্ছে। যাদের বেসিক নিড পুরা হয়ে গেছে, তারা আত্ম-প্রসাদকে উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে। আয়-ভোগ-আরো ভোগ... এটাই তাদের worldview.** শাইখ আবুল হাসান আলি নদভি রাহিমাহুল্লাহ এজন্যই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বলেছেন 'নয়া ইরতিদাদ' (নব্য দ্বীনত্যাগ)। কারণ তা ইসলামের ব্যবস্থার বিপরীত ব্যবস্থা দেয়, বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। জেনারেল শিক্ষিতদের এখন একটাই কাজ। প্রত্যেক মুসলিমের ঘরে-দোকানে-দোপে-মেসে-ক্যাম্পাসে গিয়ে বোঝানো যে, তার একটা দর্শন আছে। তার একটা চশমা থাকার কথা, যার ভেতর দিয়ে তার দুনিয়া দেখার কথা। বর্তমানে সে যেভাবে চলছে, এভাবে চললে তার দুনিয়া সংকীর্ণ হয়ে আসবে। আর তার সংকীর্ণ দুনিয়া শেষে ভয়াবহ পরকাল। দুপাড়ই শেষ। পাশ্চাত্য সভ্যতা তার জালিম দর্শন দিয়ে চুষে-ছিবড়ে-নিঙড়ে শেষ করে নেয় একেকজন মানুষকে। দুনিয়াও, আখিরাতও।

বন্ধু ইমরান বলেছিল : দোস্ত, প্রতিটা মানুষের দিকে তাকা। দেখ প্রতিটা মানুষ ভেতরে ভেতরে জ্বলছে... বুকের মাঝে জ্বালা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠিক তাই।

এই বিশ্বব্যবস্থা মানুষের 'মানবত্ব' কেড়ে নিয়েছে। মানুষ তার কাছে কেবলই কিছু সংখ্যা, কিছু পার্সেন্টিজ আর ভোক্তা-বাজার। সব জিনিসের দাম বেড়েছে, শুধু কমছে মানুষের দাম। যুদ্ধে-অনাহারে লাখ লাখ মানুষ স্রেফ ৬ ডিজিটের কয়েকটা সংখ্যা। এত লাখ মানুষ আফগান যুদ্ধে মারা গেছে, ব্যস শেষ। মনে কোনো দোলা দেয় না, ক্রোধে-ক্ষোভে চোয়াল শক্ত করে না। মানুষের চেয়ে মুনাফা বেশি কাঁদায়-ভাবায়। **মানুষের কী হলো, তার চেয়ে আমার পকেটে কত এলো সেটা ইম্পর্টেন্ট এই পাশ্চাত্য সভ্যতার চশমায়। ফলে হতাশা, অস্থিরতা, নিত্যনতুন অসুখ, আরোগ্যহীন অসুখ, আত্মহত্যা, ড্রাগ, অপরাধ বৃদ্ধি, ডিভোর্স—এগুলো এই সভ্যতার অনিবার্য পরিণতি।**

মানবতার সবচেয়ে বড় সেবা এখন তাকে ইসলামের চশমার খোঁজ দেওয়া। ভাই, তোমার এই অসহনীয় জীবন থেকে বাঁচাতে পারে কেবল ইসলাম। ইসলামের ওয়ার্ল্ডভিউ দিয়ে দুনিয়া দেখো, দেখো কত সুন্দর জীবন। পালকের মতো হালকা, নদীর বাতাসের মতো ঝিরঝিরে, মেনথলের মতো সতেজ। আপনার দুনিয়াপরস্ত আত্মীয়, সেক্যুলার বন্ধু, ঘরপোড়া হিন্দু, আত্মহত্যা-সেতুর রেলিংয়ে দাঁড়ানো জাপানি, নিজের গায়ে আগুন দেওয়া ভারতীয়-মেক্সিকান কৃষক কিংবা তিউনিসিয়ার সবজি-বিক্রেতা, আমেরিকার ঝলমলে ক্যাসিনোয় বিক্রি হয়ে যাওয়া ল্যাটিনো কিশোরী, ধুঁকতে থাকা মাদকাসক্ত ছেলেটা কিংবা এইডস-আক্রান্ত বতসোয়ানার প্রসূতিটা। ইসলামের অভাবে এই প্রতিটা মানবসত্তা ভুগছে, আর হয়ে যাচ্ছে স্রেফ কয়েকটা সংখ্যা (এত জন, অত জন, ব্যস)। যারা যারা এই বই পড়ছেন, সকলের প্রতি আমার অসিয়ত : **দাওয়াহকে মিশন হিসেবে নেন। এর চেয়ে বড় কোনো উপকার নেই মানবতার জন্য। মানুষকে পণ্যের মর্যাদা থেকে, স্রেফ ভোক্তা-বাজারের মর্যাদা থেকে, কয়েকটা সংখ্যার মর্যাদা থেকে মানুষের মানবীয় সম্মানের খোঁজ দেওয়ার চেয়ে বড় আর কোনো সেবা নেই।**

জেনারেল শিক্ষিত ভাইদের জন্য অসিয়ত হলো : প্রথমে নিজে আলিমদের তত্ত্বাবধানে স্ট্রাকচারাল ইলম অর্জন করুন। এখন অনলাইনে অনেক স্বপ্নদ্রষ্টা আলিম এক-দেড়-তিন বছর মেয়াদি কোর্স পরিচালনা করছেন। সেগুলোয় ভর্তি হয়ে ভার্সিটি লাইফের মাঝেই ন্যূনতম ইলমটুকু শিখে ফেলুন। এরপর প্রতিদিন কিছু সময় দাওয়াহ মুড অন রাখুন। আর দ্বিতীয়ত, ইসলামকে একটা সভ্যতা হিসেবে, একটা বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে পাঠ করুন। সভ্যতার সংঘাত শুরু হয়ে গেছে, যা নব্বইয়ের দশক থেকে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা বলছিলেন। পশ্চিমা সভ্যতা আর

ইসলামের মাঝে সভ্যতার সংঘাত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৪০০ বছর আগে জানিয়েছিলেন : শেষ যুগে ঈমান ও কুফরের তাঁবু একেবারে আলাদা হয়ে যাবে। মানুষ দুই তাঁবুতে আশ্রয় নেবে। যারা ঈমানের তাঁবুতে যাবে, তাদের মাঝে কোনো নিফাক-কুফর থাকবে না, অনুরূপ যারা নিফাক-কুফরের তাঁবুতে যাবে, তাদের মাঝে ঈমানের লেশমাত্র থাকবে না।[১] খেয়াল করলে দেখবেন, একদিকে প্র্যাকটিসিং মুসলিমের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, আবার নাস্তিক-মুরতাদ-নারীবাদীর সংখ্যাও বাড়ছে। মানে হলো **মাঝখানের এই ৯০% উদাসীন মানুষের মাঝে চিন্তার মেরুকরণ ঘটছে। উদাসীনতা থেকে বেরিয়ে দুই তাঁবুতে ভাগ হচ্ছে মানুষ। আমাদের লক্ষ্য হলো সভ্যতার এই সংঘাতে যত বেশিসংখ্যক মানুষকে আপনি ঈমানের তাঁবুতে আনতে পারেন, ইসলামের চশমা পরিয়ে দিতে পারেন—সেই চেষ্টা করা।** নাস্তিকদের পেছনে সময় না দিয়ে এই বিশাল মধ্যবর্তী অংশের পেছনে সময় দেন।

আর আলিম ও তালিবুল ইলমদের প্রতি একটা অসিয়ত আছে। সেটা হলো, আপনাদের সাথে এই ৯০% লোকের ভাষাগত দূরত্ব আছে। ভাষা মানে বাংলা ভাষা নয়, আপনারা যে অ্যাঙ্গেলে কথা বলেন সেটা। আপনারা কথা বলেন 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'র ভাষায়। আমরা বলি লর্ড মেকলের ভাষায়। সুতরাং,, আপনার ভাষা আমি বুঝব না। ওসব তো হুজুররা বলেই, হুজুরদের কথামতো চললে দুনিয়া চলবে? আমার ভেতরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' না এলে আমি 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' বুঝব না, পাত্তা দেবো না, গুরুত্ব দেবো না। আমাদের ভেতরে থাকা এই ইলাহ 'ইউরোপ'-কে আগে হটাতে হবে। ইউরোপ শিখিয়েছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল ইনসান' (হিউম্যানিজম) এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল মাল' (পুঁজিবাদ-ভোগবাদ)। এজন্য **ইউরোপের ইতিহাস ও দর্শন সবচেয়ে বেশি চর্চা হওয়া দরকার আলিমদের মাঝে। সভ্যতার এই সংঘাতে শত্রুর সাথে লড়ার আগে শত্রুকে জানা জরুরি।** নারী নিয়ে ইসলামের বিধান জানানোর আগে নারীর ব্যাপারে ইউরোপীয় চিন্তার গলদগুলো তুলে ধরুন। এবার সামনে বসা 'মেকলের সন্তানরা' বুঝে ফেলবে। আগে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এরপর 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' বলুন। আগে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর বিধান বললে ভেতরে থাকা ইলাহ 'ইউরোপ'-এর বিধানের সাথে টক্কর খাবে যে।

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪২৪২; *মুসনাদু আহমাদ* : ৬১৬৮; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৮৪৪১; *শারহুস সুন্নাহ*, বাগাবি : ৪২২৬; *মুসনাদুশ শামিয়্যিন* : ২৫৫১; *আল-ফিতান*, নুআইম ইবনু হাম্মাদ : ৯৩; *হিলইয়াতুল আউলিয়া* : খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা :১৫৮ -হাদিসটির সনদ সহিহ

এবার শারিয়াহর হুকুমগুলো পেশ করুন। এভাবে শিক্ষিত আওয়ামের চশমা ঠিক হবে। গায়রত-ওয়ালা আওয়াম তৈরির মেহনত করার অনুরোধ রইল আপনাদের প্রতি। এজন্য নব্য ইরতিদাদ 'ইউরোপীয় দর্শন'কে বোঝার কোনো বিকল্প নেই আলিম ও ভবিষ্যৎ আলিমদের।

আমার কথা শেষ। **আমরা ইসলামি সভ্যতার সৈনিক, যে সভ্যতার শুরু হেরার আলোয়। এই সভ্যতার বিজয় দেখে যেতে পারব কি না, জানা নেই, কিন্তু এই সভ্যতার জন্য কাজ করাকে জীবনের মিশন হিসেবে নিতে হবে প্রতিটি মুসলিমকে।** বিশ্বাস করুন আপনার কোনো কাজই ছোট নয়। আল্লাহ কারিম (অল্পতেই বহু দেনেওয়ালা) এর বদলা অসীম করে ফিরিয়ে দেবেন। আসলে আল্লাহর দ্বীন তো আল্লাহ নিজেই রক্ষা করবেন, ছড়িয়ে দেবেন। আমার অনুভূতিটুকুই তিনি দেখছেন। দুই বাপ-ব্যাটা মিলে বাজার করে এনেছে। ৪ বছরের বাচ্চা ব্যাগের একপাশ ধরে বলছে : মা, বাজার করে নিয়ে এলাম। ব্যাগের ভার কার হাতে? বাবার হাতে। বাচ্চার এই আধো আধো কথা শুনে বাবা-মায়ের কলিজা ঠান্ডা হচ্ছে। তেমনি **আল্লাহ আমাদের এই দ্বীনের জন্য দৌড়ঝাঁপ, দুআ, উম্মাহর জন্য পেরেশানি দেখে খুশি হন। আমাদের কাজ ব্যাগের কোনা ধরে রাখা, ব্যাগটা ওঠানোর চেষ্টা করা, আধো আধো কাজ করে যাওয়া, আর কাঁদা।**

বাড়িয়ে দিন কাজের গতি। বিজয়ের ঘ্রাণ আসছে সিন্ধুর ওপার থেকে। এপারে আসতে কতদিন? এই তো আর ক'টা দিন। ইনশাআল্লাহ।

একুশে গ্রন্থমেলা ২০২২ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

আমাদের সেরা কিছু বই

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক
০১	এবার ভিন্ন কিছু হোক	আরিফ আজাদ
০২	অবাধ্যতার ইতিহাস	ডা. শামসুল আরেফীন শক্তি
০৩	পড়ো ৩	ওমর আল জাবির
০৪	প্রত্যাবর্তন ২	সমকালীন টীম
০৫	জবাব ২	মুশফিকুর রহমান মিনার
০৬	বিলিয়ন ডলার মুসলিম	খুরাম মালিক
০৭	আরবি রস (দ্বিতীয় খণ্ড)	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব
০৮	ইজ মিউজিক হালাল?	ড. গওহর মুশতাক
০৯	ইউ মাস্ট ডু বিজনেস	শাইখ তাওফিক চৌধুরি
১০	কুরআনের শব্দ শিক্ষা : ১	উস্তায এস. এম. নাহিদ হাসান
১১	শেষরাত্রির গল্পগুলো	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব
১২	হাদিস সংকলনের ইতিহাস	ড. মুস্তফা আল-আযমি
১৩	সিরাজুম মুনির	আরিফুল ইসলাম

আমাদের অন্যান্য সেরা গ্রন্থসমূহ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক	মূল্য
০১	জীবন যেখানে যেমন	আরিফ আজাদ	২৬০
০২	নবি-জীবনের গল্প	আরিফ আজাদ	২৪৩
০৩	বেলা ফুরাবার আগে	আরিফ আজাদ	৩১৫
০৪	প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-২	আরিফ আজাদ	৩৭০
০৫	আরজ আলী সমীপে	আরিফ আজাদ	২৫০
০৬	মা, মা, মা এবং বাবা	আরিফ আজাদ	২৫৮
০৭	প্রত্যাবর্তন	আরিফ আজাদ	৩৩০
০৮	সুখী পরিবার নির্মাণের রূপরেখা	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৭৫
০৯	সন্তান গড়ার কার্যকরী কৌশল	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৪৫
১০	পারিবারিক সম্পর্কের বুনন	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৩০
১১	সন্তানের বয়ঃসন্ধিকালের মনস্তত্ত্ব	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৬৫
১২	শিশুদের সমস্যা আমাদের করণীয়	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৭৫
১৩	সন্তানকে বইমুখী করার কৌশল	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৪৫
১৪	কে উনি?	মোহাম্মাদ তোয়াহা আকবর	১৭২
১৫	ওপারেতে সর্বসুখ	আরিফুল ইসলাম	১৯০
১৬	আরবি রস	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	১৮৬
১৭	জবাব	মুশফিকুর রহমান মিনার	৩৩০
১৮	ভ্রূণের আর্তনাদ	শাহিনা বেগম	১৬৮
১৯	আকিদাতুত তাহাবি [ব্যাখ্যাগ্রন্থ]	শাইখ আব্দির রহমান আল-খুমাইস	২৪৫
২০	প্রোডাক্টিভিটি লেসনস	শাইখ মাশআল আব্দুল আজিজ	১৫২
২১	সূরা ইউসুফ:পবিত্র এক মানবের গল্প	শাইখ আলি জাবির আল-ফাইফি	১৮৬
২২	বিষয়ভিত্তিক বিশুদ্ধ হাদিস	শাইখ ড. আওয়াদ আল-খালফ	৫১৫
২৩	শিকড়ের সন্ধানে	হামিদা মুবাশ্বেরা	৪৩০
২৪	গল্পগুলো অন্যরকম	সমকালীন টীম	৩৪৬
২৫	তারাফুল	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	২৩২

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক	মূল্য
২৬	ইমাম আবু হানিফা ﷺ	আবুল হাসানাত	২৫৫
২৭	ইমাম শাফিয়ি ﷺ	আব্দুল্লাহ মাহমুদ, আব্দুল্লাহিল মামুন	২৪৩
২৮	ইমাম মালিক ﷺ	আব্দুল্লাহ মাহমুদ	২৪৩
২৯	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ	যোবায়ের নাজাত	২৫৫
৩০	হাসান আল-বাসরি ﷺ	আব্দুল বারী	১৭৫
৩১	আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﷺ	আবুল হাসানাত	২৬৫
৩২	তিনিই আমার রব	শাইখ আলী বিন জাবির আল ফাইফি	২৭২
৩৩	তিনিই আমার রব (দ্বিতীয় খণ্ড)	শাইখ ড. রাতিব আন-নাবুলুসি	২৬০
৩৪	তিনিই আমার প্রাণের নবি	শাইখ আলী জাবির আল-ফাইফি	১৮৬
৩৫	নবীজি ﷺ	শাইখ আয়িয আল-কারনী	২৭৮
৩৬	রিক্লেইম ইয়োর হার্ট	ইয়াসমিন মুজাহিদ	২৫০
৩৭	পড়ো-১	ওমর আল জাবির	২২০
৩৮	পড়ো-২	ওমর আল জাবির	২৮০
৩৯	ফেরা	সিহিন্তা শরীফা, নাইলাহ আমাতুল্লাহ	১৭২
৪০	ফেরা-২	বিনতু আদিল	১৭২
৪১	বিশ্বাসের জয়	ড. হুসামুদ্দিন হামিদ	২৬৮
৪২	অশ্রুজলে লেখা	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম	২৭৫
৪৩	মেঘ রোদ্দুর বৃষ্টি	রৌদ্রময়ীরা	২৮৬
৪৪	কুরআনের সাথে হৃদয়ের কথা	শাইখ ইবরাহীম আস-সাকরান	২৬০
৪৫	খুশূ-খুযূ	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম	১২৫
৪৬	হাইয়া আলাস সালাহ	শাইখ আবু আব্দিল আযিয আল-জাযায়িরি	১৭৫
৪৭	ভালোবাসার রামাদান	ড. আয়িয আল-কারনী	৩০৮
৪৮	সেরা হোক এবারের রামাদান	রৌদ্রময়ী টীম	২৬০
৪৯	জিলহজের উপহার	আব্দুল্লাহিল মা'মুন	১৪০
৫০	হিফয করতে হলে	শাইখ আব্দুল কাইয়্যুম আস-সুহাইবানী	১৪১
৫১	সবর	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম	২৬০
৫২	সালাফদের জীবনকথা	শাইখ আব্দুল আযীয	৩২০

ধর্মহীন [illegible] সমাজে মুসলিমদের জন্য মুহতারাম [illegible] শামসুল আরেফিনের এই বইটি বিপ্লবী এক উপহার। মুহতারাম ভাইয়ের প্রতিটি বই-ই আমার পড়া হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ; তার মধ্যে বক্ষ্যমাণ বইটিকে এই পর্যন্ত ডাক্তার সাহেবের করা সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলে আমি মনে করি।

অন্যান্য বইগুলোতে ধরাবাঁধা কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু এই বই একসাথে পুরো একটা প্যাকেজ। জীবনঘনিষ্ঠ এই প্যাকেজটাকে বর্তমান সময়ের অধঃপতিত মুসলিম উম্মাহর সাথে প্রাসঙ্গিকভাবে লেখক তুলে এনেছেন পুরোপুরি।

তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সেক্যুলারালিজম, লিবারেলিজম, হিউম্যানিজম, ফেমিনিজম, কলোনিয়ালিজম-সহ প্রতিটি বিষয়কে বর্তমানের সাথে মিশিয়ে পাঠককে যেন গিলিয়েই দিয়েছেন।

- উস্তায ইফতিখার সিফাত
লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক

সমকালীন প্রকাশন

লেখক আরিফ আজাদের অভি[illegible]

ধর্মকে অজ্ঞতা আর পশ্চাদপদতা জ্ঞান করা [illegible] আবির্ভূত হয়েছিল নতুন এক জাগরণের দিশা হয়ে। চার্চকে সভ্যতার বিকাশে অন্তরায় মনে করা মানুষদের সামনে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম হয়ে উঠেছিল এক নতুন পৃথিবীর দীপ্ত ইশতেহার। স্বাধীনতা আর মানবতার মোড়কে সমাজে কতটা বিকৃতি যে ছড়িয়ে পড়েছিল তা ইসলাম আঙুল তুলে দেখাতে লাগল একে একে। চার্চ আর বিজ্ঞানবাদের লড়াইয়ে যখন উদ্ভাবিত হচ্ছিলো মানববাদ, নারীবাদ এবং বিস্তৃতি পাচ্ছিল সমকামের মতো অ-প্রাকৃতিক আচরণ, মানুষকে আলো দেখাতে তখন ইসলাম হাজির হলো তার সমাধানের সমাহার নিয়ে।

বিনি সুতোর মালা কেটে গেলে যেভাবে মুক্তোদানা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়, ধর্মীয় বিধানের বিকৃতিও তেমনি মানবসভ্যতাকে করে তোলে অস্থিতিশীল, অসহনীয়। ভুল জিনিস আর ভুল বিশ্বাসে অভ্যস্ত মানুষের জন্য ইসলাম কীভাবে সমাধান বাতলায়, ধর্মকে আস্তাকুঁড়ে পাঠানোর দুনিয়ায় ইসলাম কেন সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক, সেই আলোচনায় ভরপুর 'অবাধ্যতার ইতিহাস' বইটি।

ডা. শামসুল আরেফীন তার চমৎকার সব কাজ দিয়ে এই উম্মাহকে উপকৃত করছেন, আলহামদুলিল্লাহ। বরাবরের মতো তার এই কাজটিও বাংলাভাষী মানুষের চিন্তার জগতে বৃহৎ পরিবর্তন আনবে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা।

বিক্রয়কেন্দ্র :
১১/১, ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬